কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ২/১
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ২

প্রথম খণ্ড

তিন গোয়েন্দা

৭, ৮, ৯

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
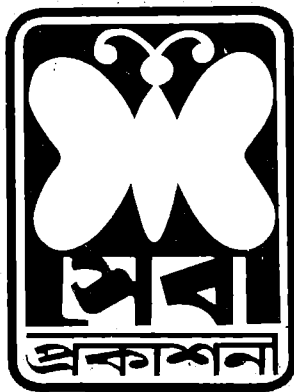
ঊনপঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-16-1274-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-2
Part-I
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-

তি. গো. ভ. ৩৬	(ঢক্কর, দাক্ষণ যাত্রা, গ্রেট রার্বিনিয়োসো)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৩	(পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি)	৩৯/-

প্রেতসাধনা

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ১৯৮৭

'ওই দেখো!' কিশোরকে দেখেই বলে উঠলেন মেরিচাচী, 'সাঁতারের পোশাক পরেই চলে এসেছে! তোমাকে না কতবার বলেছি এসব পরে নাস্তা খেতে আসবে না কখনও।'

স্পোর্টস শার্টের হাতা কনুইয়ের কাছে গুটিয়ে তুলে দিয়ে কমলার রসের দিকে হাত বাড়াল কিশোর পাশা। 'সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'মুসা আর রবিন এই এল বলে।'

'তাই বলে এসব পরে? খেয়ে গিয়ে পরলে চলত না?'

কালো মস্ত গোঁফে লেগে থাকা রুটির কণা মুছলেন টেবিলের ওপাশে বসা রাশেদ চাচা। 'হালকা কিছু খাও। ভরাপেটে সাঁতরাতে অসুবিধে হয়।'

'আরে না না, সবই খাক,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মেরিচাচী। 'না খেলে পরিশ্রম করবে কি করে?' কফির কাপ, সেই সঙ্গে টেবিলে পড়ে থাকা দৈনিকটা টেনে নিলেন।

পাঁউরুটির টুকরোতে পুরো করে মাখন মাখতে শুরু করল কিশোর।

'আরে!' বিস্মিত কণ্ঠ মেরিচাচীর।

কৌতূহলী চোখে তাকাল কিশোর। সহজে কোন ব্যাপারে তো অবাক হয় না চাচী!

'অনেক আগে অডিয়নে দেখেছিলাম ছবিটা!' আপন মনেই বললেন চাচী। 'এই ষোলো-সতেরো বছর বয়েস তখন আমার।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন রাশেদ চাচা।

'দেখার পর পুরো এক হপ্তা ঘুমোতে পারিনি,' বলতে বলতে কাগজটা স্বামীর দিকে ঠেলে দিলেন চাচী।

ঘুরে এসে চাচার কাঁধের ওপর দিয়ে কাগজটার দিকে তাকাল কিশোর। হালকা-পাতলা একজন মানুষের ছবি, ঠেলে বেরিয়ে আছে চোয়াল, তোতাপাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক, কালো চোখের তারা। উজ্জ্বল একটা কাঁচের গোলকের ওপর দৃষ্টি স্থির।

'র‍্যামন ক্যাসটিলো,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'দা ভ্যাম্পায়ারস লেয়ার ছবিতে। অভিনয় তো বটেই, মেকাপেও মাস্টার ছিল লোকটা।'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেরিচাচীর। 'উফফ্! ক্রাই অভ দা ওয়্যারউলফ ছবিতে যদি দেখতে ওকে!'

'দেখেছি,' বলল কিশোর। 'গত মাসে টেলিভিশনে দেখিয়েছে।'

লেখাটা পড়া শেষ করে মৃত অভিনেতার ছবির দিকে চেয়ে রইলেন রাশেদ চাচা কয়েক মুহূর্ত। মুখ তুললেন। 'ক্যাসটিলোর প্রাসাদে নিলাম হবে, একুশ

তারিখ। যাওয়া দরকার।'

ভ্রূকুটি করলেন মেরিচাচী। জানেন, বাধা দিয়ে লাভ হবে না, যাবেনই রাশেদ পাশা। আশেপাশে যেখানে যখন পুরানো জিনিসপত্র নিলাম হয়, তাঁর যাওয়া চাইই। যা পান, কিনে এনে স্তূপ দেন পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। দেখে মনে হয়, অদরকারী জিনিস, কিন্তু এসব জিনিসেরও দরকার পড়ে লোকের, কিনতে আসে তারা। বেশ ভালই লাভ পুরানো জিনিসে। তবে এমন সব জিনিসও নিয়ে আসেন রাশেদ চাচা, যেগুলো একেবারেই বাতিল। হয়তো কোনদিনই বিক্রি হবে না, সেসব নিয়েই মেরিচাচীর আপত্তি। কিন্তু চাচীর কথায় থোড়াই কেয়ার করেন চাচা।

'ক্যাসটিলোর জিনিসপত্র সব বেচে দেবে ওরা,' আবার বললেন চাচা। 'এমনকি এই ক্রিস্টাল বলটাও,' ছবিতে আঙুল রাখলেন। 'দা ভ্যাম্পায়ারস লেয়ারে ব্যবহার করা হয়েছিল এটা।'

'ওসব অ্যানটিক জিনিস কেনার মানুষ আলাদা, তাদের আলাদা ব্যবসা,' প্রতিবাদ করলেন চাচী। 'তাছাড়া দামও নিশ্চয় অনেক উঠবে।'

'তা উঠবে,' কাগজটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন চাচা। 'অ্যানটিক যারা জোগাড় করে, তারা তো পাগল হয়ে ছুটে আসবে।'

'তাহলে আর গিয়ে কি করবে?' উঠে টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করলেন চাচী। কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে গিয়ে সিংকে চুবিয়ে রাখলেন। একটা একটা করে তুলে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন তাকে। পথে ঘোড়ার খুরের শব্দ হতেই কান পাতলেন। 'ওই যে, পারকারদের মেয়েটা যাচ্ছে।'

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। হ্যাঁ, পারকারদের মেয়েটাই। অন্য দিনের মতই ঘোড়ায় চেপে চলেছে। চমৎকার একটা সাদা আপালুসা, বাদামী লোম থেকে যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে। লেজের কাছে খানিকটা শাদা ছোপ আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ঘোড়াটাকে। 'খুব সুন্দর!' আপন মনেই বলল কিশোর। 'আপালুসা আরও দেখেছি, কিন্তু এমনটি দেখিনি!'

ঘোড়ার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করল কিশোর, কিন্তু আরোহিণীর ব্যাপারে কোন মন্তব্যই করল না। মাথা উঁচু করে বসে আছে মেয়েটা, নজর সামনে, ডানে-বাঁয়ে কোন দিকেই ফিরছে না।

'সৈকতে যাচ্ছে বোধহয়,' কাজ করতে করতেই বললেন মেরিচাচী, 'দৌড় করাতে। মেয়েটা বড় বেশি একা। রুজের কাছে শুনলাম, বাবা-মা ইউরোপে থাকে।'

'জানি,' বলল কিশোর। সে আরও জানে, পারকারদের বাড়ি দেখাশোনা করে রুজ, মেয়েটাকেও। বিকেলে প্রায়ই ইয়ার্ডে আসে রুজ, মেরিচাচীর সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করে। আশেপাশে ঘুরঘুর করে তখন কিশোর, কথা শোনে।

মাস কয়েক আগে মোড়ের কাছের পুরানো প্রাসাদটা কিনেছেন মিস্টার পারকার। আগে যা ছিল তা-ই রয়েছে বাড়িটা, সরানো দরকার মনে করেননি তিনি। কিশোর জানে, বাড়িটার খাবার ঘরে পুরানো আমলের মস্ত এক ঝাড়বাতি ঝোলানো আছে। বাতিটা আগে ছিল ভিয়েনার এক জমিদারের প্রাসাদে। জানে, মিসেস পারকারের একটা হীরের হার আছে, ওটার আগের মালিক ছিল ইউজেনি-র

এক সম্রাজ্ঞী। পারকারদের মেয়েটার নাম জিনা, ঘোড়াটা তার খুব প্রিয়। কিশোর এটাও জানে, বর্তমানে জিনার এক খালা আছে তাদের বাড়িতে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে দিন কয়েক আগে এসেছে মহিলা। রুজের মন্তব্যঃ বুড়িটার কাণ্ডকারখানা ভারি অদ্ভুত!

মোড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল আপালুসা।

'কিশোর,' মেরিচাচী বললেন, 'মেয়েটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিস না। তোর তো যতসব উদ্ভট কাণ্ড! রাস্তার ওপারে বাড়ি, হাজার হোক আমাদের প্রতিবেশী।'

'কিন্তু প্রতিবেশী সুলভ ব্যবহার তো করে না,' সাফ জবাব দিল কিশোর। 'ঘোড়াটা ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলে বলেও মনে হয় না।'

'বেশি লাজুক আরকি।'

জবাব দিল না কিশোর, পথের মাথায় মুসা আর রবিনকে দেখা যাচ্ছে। সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে যেন দুজনে। ওরাও তার মতই স্পোর্টস শার্ট গায়ে চড়িয়েছে, নিচে সাঁতারের পোশাক, পায়ে স্নীকার।

'আমি যাই,' চাচীকে বলেই আর দাঁড়াল না কিশোর, বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সাইকেল নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিল কিশোর। এবারে সত্যিই প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সাঁই সাঁই প্যাডাল ঘুরিয়ে অন্য দুজনের আগে চলে এল সে। এমনিতে মুসার সঙ্গে পারার কথা নয় কিশোরের, কিন্তু মুসা আর রবিন অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে, আর সে সবে শুরু করেছে চালানো।

দেখতে দেখতে পথের মোড়ে পৌঁছে গেল ওরা। ছোট্ট পাহাড়ের জন্যে ওপাশের কিছু দেখা যায় না, সৈকতের দিকে চলে গেছে যে সড়কটা, ওটাও চোখে পড়ে না।

হঠাৎ, 'হেইই, কিশোর!' বলে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

কিশোরও দেখেছে, কিন্তু সামলে নেয়ার সময় পেল না। সামনে আচমকা বিশাল মূর্তিটা উদয় হতেই সাইকেলের কথা ভুলে গিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত মাথার ওপর তুলে ফেলল সে, ভারসাম্য হারিয়ে হুড়াম করে কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে। উরুর ফাঁক থেকে ঝনঝন শব্দ তুলে পিছলে সরে গেল সাইকেল।

উঁচু পর্দায় চিৎকার শোনা গেল, ঘোড়ার ডাক নয়, মেয়ে কণ্ঠ।

মুহূর্ত পরেই আলকাতরা মেশানো পথের নুড়িতে নাল লাগানো ঘোড়ার খুরের বিচিত্র শব্দ উঠল, ব্রেক কষে নিজেকে থামানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে জানোয়ারটা। ঠিক চোখের সামনে খুর-দুটো দেখতে পেল কিশোর। দ্রুত এক গড়ান দিয়ে পাশে সরে গেল সে, তারপর উঠে বসল।

পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে আপালুসা, নামিয়ে আনছে সামনের পা। দু'কান লেপ্টে আছে মাথার সঙ্গে। পথের ওপর চিৎপাত হয়ে আছে পারকারদের মেয়ে।

মাটিতে সাইকেল শুইয়ে রেখে সাহায্য করতে ছুটে গেল মুসা আর রবিন। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে কিশোরও ছুটল।

নিচু হয়ে জিনার কাঁধে হাত রাখল মুসা।

হাঁপাচ্ছে মেয়েটা, হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল, 'হা-হাত সরাও!'
ইলেকট্রিক শক খেল যেন মুসা, হাত সরিয়ে আনল।
'খুব বেশি লেগেছে?' মেয়েটার দিকে ঝুঁকে মোলায়েম গলায় প্রশ্ন করল রবিন।
কোনমতে উঠে বসল জিনা। হাঁটু চেপে ধরে রেখেছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত, জিনসের প্যান্টের এক হাঁটুর কাছে ছোঁড়া, জায়গাটার চারপাশ ভিজে গেছে রক্তে। কান্নার মত ফোঁপানি বেরোচ্ছে তার গলা থেকে, কিন্তু চোখ শুকনো, কাঁদছে না। হাঁপাচ্ছে এখনও।
'নাহ্, সত্যিই খুব চোট পেয়েছ!' গলায় সহানুভূতি ঢালল মুসা।
মুসার কথায় কানই দিল না জিনা, কড়া চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। 'হঠাৎ সামনে কিছু দেখলে চমকে উঠে ঘোড়া, জানো না!'
'সরি!' বলল কিশোর। 'আমি দেখিনি।'
আস্তে করে উঠে দাঁড়াল জিনা। ঘোড়াটাকে এক নজর দেখে আবার কিশোরের দিকে ফিরল। মেয়েটার চুলের রঙের মতই চোখের মণিও তামাটে, জ্বলছে। 'যদি আমার ঘোড়ার কোন কিছু হয়...' দাঁতে দাঁত চাপল মেয়েটা।
'মনে হচ্ছে হয়নি,' ভোঁতা গলায় বলল কিশোর।
খোঁড়াতে খোঁড়াতে আপালুসার পাশে গিয়ে দাঁড়াল জিনা। গায়ে হাত রাখল। 'লক্ষ্মী মেয়ে! শান্ত হও!'
বিশাল থুঁতনি জিনার কাঁধে রাখল আপালুসা।
'খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছে তোমাকে, না?' আস্তে করে ঘোড়ার মাথায় চাপড় দিল জিনা।
পথের মাথায় মেরিচাচীকে দেখা গেল, চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছেন। 'এই কিশোর! কি হয়েছে রে?'
রাশ ধরে ঘোড়ার পাশে চলে এল জিনা, পিঠে চড়ার ইচ্ছে। কিন্তু আরোহী নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল ঘোড়া, পিছিয়ে গেল এক পা।
'মুসা,' কিশোর বলল, 'রাশটা সামনের দিকে টেনে ধরো তো। আমি ওকে তুলে দিচ্ছি।'
'হয়েছে হয়েছে, কারও সাহায্য লাগবে না আমার!' খেঁকিয়ে উঠল জিনা।
কাছে এসে দাঁড়ালেন মেরিচাচী। জিনার উসকো খুসকো চুল, ধূলি-ধূসরিত মুখ, ছেঁড়া প্যান্ট, রক্তাক্ত হাঁটু দেখলেন। 'কি হয়েছে?'
'ও আমার ঘোড়াকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে,' কিশোরকে দেখিয়ে গোমড়া মুখে বলল জিনা।
'জিনা পড়ে গিয়েছিল,' যোগ করল মুসা।
'ইচ্ছে করে করিনি,' বলল কিশোর। 'এত বড় একটা জানোয়ার যে এমন ভীতুর ডিম, তাই বা কে জানত!'
'এই, চুপ কর!' কিশোরকে ধমক দিলেন মেরিচাচী। 'যা জলদি গিয়ে তোর চাচাকে বল পিকআপটা নিয়ে আসতে। মেয়েটার হাঁটুর যা অবস্থা, ঘোড়ায় উঠতে পারবে না।'
'না না, পারব,' প্রতিবাদ করল জিনা।

কানেই তুললেন না চাচী। কিশোরকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' মুসার দিকে ফিরলেন। 'তুমি লাগামটা ধরো তো শক্ত করে। জিনার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, দেখছ না।'

ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল মুসা। 'যদি কামড়ায়?'

'আরে নাহ্, কামড়াবে না!' ঘোড়ার ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান কতখানি, ভুলে প্রকাশ করে দিলেন মেরিচাচী। 'ঘোড়া কামড়ায় না। তবে লাথি মারে।'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

দুই

ঘোড়াটাকে পারকার হাউসে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। গাড়ি-বারান্দায় স্যালভিজ ইয়ার্ডের পিকআপটা দাঁড়িয়ে আছে, মেরিচাচী কিংবা জিনাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

বারান্দার ছাতকে ঠেকিয়ে রেখেছে যেন বড় বড় থাম, সেদিকে চেয়ে বলল মুসা, 'মেরিচাচী তার দাদীর স্কার্টটা পরে এলে মানাত এখানে।'

হাসল কিশোর। 'কোন্ আমলের বাড়ি এটা!'

'মধ্যযুগের হলেও অবাক হব না!' রবিন বলল। 'কিন্তু ঘোড়াশালটা কোথায়?'

বাড়ির পেছনের সীমানা দেখাল মুসা। 'ওই যে একটা মাঠ, কাঁটাতারে ঘেরা।'

'চলো, ওখানেই নিয়ে যাই,' প্রস্তাব দিল কিশোর।

প্রাসাদের এক পাশে পাথরে বাঁধানো চত্বর প্রায় ঢেকে গেছে ওইসটেরিয়া লতাঝাড়ে। তার এক পাশে কংক্রিটের সরু পথ ধরে পেছনের মাঠে ঘোড়াটাকে নিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।

বাড়ির পেছনে বিশাল আঙ্গিনা। তার পরে তারে ঘেরা মাঠ, মাঠের পরে পাশাপাশি তিনটে গ্যারেজ। একটা গ্যারেজের মস্ত দরজা হাঁ হয়ে খোলা, ভেতরে ঘোড়া বাঁধার জায়গা দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে গাঁথা বড় বড় পেরেকে ঝুলছে দড়ি।

বাড়ির পেছনের দরজা খুলে উঁকি দিল রুজ। 'এই যে ছেলেরা, কমেটকে নিয়ে এসেছ? মাঠে ছেড়ে দিয়ে ভেতরে এসো। মিস মারভেল তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

আবার দরজা বন্ধ করে দিল রুজ।

ঘোড়াটার দিকে চেয়ে আপনমনেই বলল মুসা 'কমেট!'

'হ্যাঁ, বাংলায় বলে ধূমকেতু,' বলল কিশোর। 'চাচীকে রুজ বলেছে, ঘোড়াটাকে নাকি শুধু মেট বলে ডাকে জিনা।'

'তারমানে বাংলায় কেতু?'

'আরে না,' হেসে উঠল কিশোর। 'মেটের বাংলা, বন্ধু।'

'এই মিস মারভেলটা কে, জানো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জিনার খালা। এখানেই থাকবে,' কিশোর জানাল। 'রুজ বলে, এই খালাটা নাকি অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত?'

'জানি না কেন বলে, মহিলার আচার-আচরণ নাকি ভাল লাগে না রুজের। আমরা তো যাচ্ছিই, দেখব, কেন ভাল লাগেনি।'

ঘোড়ার জিন আর লাগাম খুলে নিল কিশোর। রবিন গেট খুলে দিতেই মাঠে ঢুকে পড়ল কমেট।

গ্যারেজে জিন রাখার জায়গায় জিন রাখল কিশোর, লাগাম ঝুলিয়ে রাখল একটা পেরেকে। তারপর প্রাসাদের পেছনের একটা দরজা খুলে দুই সঙ্গীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। রান্নাঘর। জানালা দিয়ে এসে পড়া রোদের আলোয় ঝলমল করছে মস্ত ঘরটা।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা চওড়া বিরাট এক হলঘরে। বাঁয়ে খাবার ঘর। হলের ছাতে ঝুলছে সেই বহুল আলোচিত ঝাড়বাতি। ওপাশের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে ওইসটেরিয়া ঝাড়ে ঢাকা চত্বর। ডানে একটা শোবার ঘর, খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে হালকা সবুজ দেয়াল, ওপরের দিকে সোনালি রঙের কারুকাজ। শোবার ঘরের ওপাশে আরেকটা দরজা, ওই দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরেকটা ঘর, দেয়াল আলমারির তাকে তাকে ঠাসাঠাসি করে রাখা বই।

হলঘরের সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে জিনা, আহত হাঁটুর নিচে একটা তোয়ালে। ওর পাশে বসে আছে এক বয়স্কা মহিলা। পরনে নীলচে লাল মখমলের গলাবন্ধ লম্বা গাউন, গলায় রূপার একটা চেপ্টা আঙটা। লালচে-ধূসর চুল। বাতাসে ল্যাভিনডারের গন্ধ, পুরানো গির্জার শব-রাখা ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'খালা, সোফায় রক্ত লাগালে মা মেরে ফেলবে আমাকে,' জিনা বলল। 'আমি ওপরতলায়…'

'চুপ করে বসো এখানে,' শান্তকণ্ঠে বলল মিস মারভেল। 'এতবড় একটা আঘাত।' ছেলেদের দিকে একবারও তাকাল না মহিলা। কাঁচি দিয়ে জিনার প্যান্ট হাঁটুর কাছ থেকে কেটে নামিয়ে দিল। 'ইস্স্, অনেকখানি কেটেছে!'

'ও কিছু না,' অভয় দিলেন মেরিচাচী। ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা চেয়ারে বসেছেন। ওষুধ লাগালেই সেরে যাবে।'

'মাকড়সার জাল দরকার,' আনমনে বলল মিস মারভেল।

'মাকড়সার জাল!' মেরিচাচীর ভুরু কুঁচকে গেছে।

'মাকড়সার জাল!' চমকে উঠল জিনার কাছে দাঁড়ানো রুজ, হাতের গরম পানির পাত্র থেকে ছলকে পড়ল পানি।

নড়েচড়ে উঠল সহকারী দুই গোয়েন্দা, অস্বস্তি বোধ করছে। গোয়েন্দা প্রধানের দিকে তাকাল মুসা, চোখে জিজ্ঞাসা।

হেসে রুজকে বলল কিশোর, 'খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে? মাকড়সার জাল নেই নাকি এ-বাড়িতে?'

রেগে উঠল রুজ। 'জাল কি করে থাকবে? এক কণা ধুলো রাখি না আমি, ঝেঁটিয়ে দূর করি, আর জাল থাকবে!' লাল হয়ে গেছে তার মুখ।

'হায়রে কপাল!' আক্ষেপ করল মিস মারভেল। 'সাধারণ মাকড়সার জাল, তা-ও মেলে না এখানে! কি আর করা। যাও, আমার ওষুধের বাক্স থেকে সোনার ছোট

বয়মটা নিয়ে এসো।'

রুজ চলে গেল। ছেলেদের দিকে মুখ তুলে তাকাল মিস মারভেল জিনাকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিল। তারপর বলল, 'আমার কথা তো শোনে না। কতবার বলেছি, আর কিছু না হোক, গলায় অন্তত লাল একটা রুমাল বেঁধে নাও, সব রকম অঘটন থেকে রেহাই পাবে। লাল রঙ দুর্ঘটনা ঠেকায়, জানো তো?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল কিশোর।

ছোট একটা সোনার বয়ম এনে মিস মারভেলের হাতে তুলে দিল রুজ।

'এতেও চলবে,' বলল জিনার খালা। 'মাকড়সার জালের মত তত কাজের নয়, তবে ভাল। আমি নিজে বানিয়েছি।' ছিপি খুলে মলম বের করে বোনঝির আহত জায়গায় ডলে লাগিয়ে দিল।

'মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশনের অনুমোদন আছে?' জানতে চাইল জিনা।

'কি যে বলো না তুমি, মেয়ে, অনুমোদন দিয়ে কি হবে? কাজ হলেই হলো,' বলল মিস মারভেল। 'অমাবস্যার রাতে নিজে শেকড়-পাতা জোগাড় করেছি আমি। ওই দেখো, লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।'

'অনেক আগেই রক্ত বন্ধ হয়েছে, তোমার ওই আজেবাজে জিনিস না লাগালেও চলত, খালা। এবার কি? হুইলচেয়ার আনতে বলবে?'

'একটা ব্যাণ্ডেজ হলে, তাতে মাছির ডিম ভেঙে মাখিয়ে...'

খালার কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়াল জিনা। 'লাগিয়ে পচে মরি। ওসব কিচ্ছু লাগবে না আমার!' সিঁড়ির দিকে রওনা হলো সে। ছেলেদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থামল, 'থ্যাঙ্কস! শুনলাম, মেটকে জায়গামতই এনে রেখেছ।'

'না না, এর জন্যে ধন্যবাদ আবার কেন? এত আমাদের কর্তব্য ছিল,' হাসিতে ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। আড়চোখে একবার তাকাল বন্ধুদের দিকে। ঘোড়া আনার কাজে সে কোন সহায়তাই করেনি, ভয়ে দূরে দূরে ছিল, সেটা না আবার বলে দেয় ওরা।

ওপর তলায় উঠে গেল জিনা।

'শিগগিরই মত বদলাবে ও,' বলল মিস মারভেল। 'যখন ব্যথা কমে যাবে, কালকের মধ্যেই ক্ষত শুকিয়ে যাবে, তখন বুঝবে মলমের গুণ আছে কি-না। বাচ্চা মেয়ে তো, এতবড় একটা ব্যথা পেয়েছে...ও হ্যাঁ,' মেরিচাচীর দিকে চেয়ে বলল মহিলা, 'আপনারা কে, তাই তো জানা হয়নি।'

মেরিচাচী উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি মিসেস রাশেদ পাশা, ও আমার ছেলে, কিশোর।' বাইরের লোকের কাছে কিশোরকে নিজের ছেলে বলেই পরিচয় দেন তিনি। 'ও হলো মুসা আমান, আর ও রবিন মিলফোর্ড।'

কিশোরকে দেখতে দেখতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মিস মারভেলের দৃষ্টি, বেগুনী চোখের তারায় বিস্ময়। 'আরে, কিশোর পাশা! মানে, কমিক পাশা?'

'ঠিকই চিনেছেন,' বন্ধুগর্বে আধহাত ফুলে গেল মুসার বুক। 'ও কমিক পাশা। টেলিভিশনে কমিক দেখিয়ে এই বয়সে এত সুনাম আর কেউ কমাতে পারেনি।'

'তা খোকা, সিনেমায় ঢুকছ না কেন? বাচ্চাদের ছবি বানান হলিউডের বিখ্যাত ফিলম ডিরেকটর মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার, তাঁকে গিয়ে ধরো...,' জানালার

বাইরে চোখ পড়তেই থেমে গেল মিস মারভেল। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! মিস্টার ভ্যারাড়।'

ফিরে তাকাল ঘরের আর সবাই। আগাগোড়া কালো পোশাক পরা একজন মানুষ নামছে ট্যাকসি থেকে। অবাক হলো কিশোর। মানুষের মুখ এত ফেকাসে! সারাজীবন অন্ধকার গুহায় কাটিয়ে মাত্র যেন বেরোল!'

হাতে একটা সুটকেস নিয়ে সরু পথ ধরে সদর দরজার দিকে এগোল লোকটা।

'শেষ পর্যন্ত তাহলে এলেন উনি!' খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছে মিস মারভেল। 'আশা পুরো হলো আমার।

'আমরা তাহলে আসি,' ছেলেদের ঠেলে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলেন মেরিচাচী। চওড়া বারান্দা পেরিয়ে এল ওরা। সরু পথে পাশ কাটাল আগন্তুককে।

পিকআপে ওঠার আগে থমকে দাঁড়ালেন মেরিচাচী। 'তোমরা তো সাঁতার কাটতে যাবে। এগিয়ে দিয়ে আসব?'

'না না, লাগবে না,' হাত তুলল কিশোর। 'হেঁটেই যেতে পারব।'

'যাও, এখানে আর থেকো না!' মাথা নাড়লেন তিনি। 'কাণ্ড! কাটা ক্ষতে মাকড়সার জাল, মাছির ডিম! মেরে ফেলার জোগাড়!' গাড়িতে চড়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'মাছির ডিমের কথা শুনিনি, তবে মাকড়সার জালের কথা শুনেছি,' বলল কিশোর। বইপত্র প্রচুর ঘাঁটাঘাঁটি করে সে, উদ্ভট লেখা দেখলেই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। 'রক্ত বন্ধ করতে নাকি খুব কাজ দেয়। পুরানো আমলে লোকে ব্যবহার করত।'

'পুরানো আমলে তো ছাইপাঁশ কত কি-ই ব্যবহার করত লোকে, মরতও! যত্তসব!' গজগজ করতে করতেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন মেরিচাচী। গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে চললেন গেটের দিকে।

'অদ্ভুত!' বলল মুসা। 'রুজ ঠিকই বলেছে। জিনার খালা জানি কেমন!'

'কুসংস্কার ছাড়তে পারেনি,' কিশোর বলল।

সে রাতে ঘুমানোর আগে অনেক ভাবল কিশোর। জিনার খালার বানানো মলমের কথা মনে করে হাসি পেল। অমাবস্যার রাতে শেকড়-বাকড় জোগাড় করে…হাহ্! হেসে কম্বলটা গলার কাছে টেনে দিল সে।'চোখ লেগে এসেছে, এই সময় দরজায় দমাদ্দম কিল পড়তেই তন্দ্রা টুটে গেল।

'মিসেস প্যাশাআ! মিসেস প্যাশাআ! দরজা খুলুন!'

লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল কিশোর, এক টানে ড্রেসিং গাউনটা নিয়ে গায়ে চড়িয়েই দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে ছুটল। মাঝামাঝি নেমে গেছেন মেরিচাচী, তাঁর পিছনে রাশেদ চাচা। একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপকে চাচা-চাচীর পেছনে চলে এল সে।

দরজা খুলে দিলেন চাচী।

প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে ঘরের ভেতরে পড়ল রুজ। 'আউহ্হ্… মিসেস প্যাশা!' হাঁপাচ্ছে। পরনে শুধু ড্রেসিং গাউন, পায়ে চপ্পল।

'কি হয়েছে, রুজ?' মেরিচাচী অবাক।

'আজ রাতটা থাকতে দেবেন?' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রুজ। মেরিচাচী 'না' বললেই কেঁদে ফেলবে যেন।

'রুজ, হয়েছে কি?'

'গান!'

'কী!'

'গান!' কেঁপে উঠল রুজ। 'কিছু একটা এসে ঢুকেছে ওবাড়িতে, গান জুড়েছে!' মেরিচাচীর হাত আঁকড়ে ধরল সে। 'ভয়ঙ্কর! জিন্দেগীতে ও-রকম গান শুনিনি! আমি আর ওখানে ফিরে যাব না!'

তিন

আস্তে করে রুজের হাত সরিয়ে দিলেন মেরিচাচী। 'ঠিক আছে, ফোন করছি আমি।'

নাক কুঁচকাল রুজ। 'তা করুন। কিন্তু আমি আর ওখানে ফিরে যাচ্ছি না।'

পারকারদের বাড়ির নাম্বারে রিঙ করলেন মেরিচাচী। ফোন ধরল মিস মারভেল। সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার পর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন চাচী। 'মিস মারভেল নাকি তেমন কিছু শোনেনি।'

'ওই বুড়ি তো বলবেই!' চেঁচিয়ে উঠল রুজ।

'কেন? বলবে কেন?'

'মানে···ইয়ে···ও, ও নিজেই তো অদ্ভুত! যে সব কাণ্ড ঘটছে ও-বাড়িতে, লাখ টাকা দিলেও আর ফিরে যাচ্ছ না।'

ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু বলতে চাইল না রুজ, পারকারদের বাড়িতে আর ফিরেও গেল না। রাতটা কিশোরদের বাড়িতে শোবার ঘরে কাটাল। সকালে গিয়ে রুজের জিনিসপত্র নিয়ে এলেন রাশেদ চাচা, স্যুটকেস গুছিয়ে দিয়েছে জিনা। তারপর লস অ্যাঞ্জেলেসে রুজের মায়ের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে চললেন।

'কি এমন শুনল!' রুজ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বলল কিশোর।

'কি জানি!' হাত নাড়লেন চাচী। নিজের কাজে চলে গেলেন।

পরের ক'দিন ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবল কিশোর। সেদিন সকালেও একই কথা ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরোল, স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভেতরের খোয়া বিছানো পথ ধরে এগোল তার নিজস্ব ওয়ার্কশপের দিকে। কাজে ব্যস্ত দুই ব্যাভারিয়ান ভাই, বোরিস আর রোভার, মারবেলের তৈরি একটা চুলা ঘষেমেজে পরিষ্কার করছে। হলিউড পাহাড়ের ধারে এক পুড়ে যাওয়া বাড়ির নষ্ট জিনিসপত্র কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা, চুলাটা ওসবের ভেতর থেকেই বেরিয়েছে।

'মুসা এসেছে,' মুখ তুলে বলল বোরিস। 'ওয়ার্কশপে।'

'ছাপার মেশিন চালু করেছে,' রোভার যোগ করল।

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। মেশিন যে চালু হয়েছে, এটা না বললেও চলত। মেরামত করা পুরানো মেশিনের ঘটাং-ঘট ঘটরাং-ঘট এখান থেকেই কানে আসছে। ইস্‌স্, ভাঙা একটা আধুনিক মেশিন যদি কোন জায়গা থেকে জোগাড় করতে পারত চাচা!—ভাবল কিশোর, এই বিশ্রী আওয়াজ থেকে রেহাই পাওয়া

যেত।

এক জায়গায় স্তূপ করা আছে বড় বড় গাছের কাণ্ড, ইস্পাতের কড়িবরগা আর কিছু লোহার জাল। ওঘুলো ঘুরে অন্য পাশে চলে এল কিশোর, স্যালভিজ ইয়ার্ডের মূল আঙ্গিনা দেখা যায় না এখান থেকে, মেরিচাচীর কাচে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর ছিমছাম অফিসটাও চোখে পড়ে না। উঁচু কাঠের তক্তার বেড়া দিয়ে ঘেরা পুরো ইয়ার্ড, এক দিকের বোড়ার ওপাশেই রাস্তা। কিছুটা জায়গায় বেড়ার মাথায় ছয় ফুট চওড়া চাল, চালের ভার রেখেছে লোহার খুঁটি। রোদবৃষ্টিতে পুড়ে-ভিজে নষ্ট হয়ে যায় যে-ব জিনিস, ওগুলো রাখা হয়েছে এই চালার নিচে।

ওয়ার্কশপে ঢুকল কিশোর। ছাপার মেশিনের ওপর ঝুঁকে আছে মুসা, কার্ড ছাপছে। কিছু দিন পর পরই কার্ডের ডিজাইন পাল্টায় কিশোর। কারণ আছে। তিন গোয়েন্দার দেখাদেখি অনেক ছেলেই গোয়েন্দা সাজতে শুরু করেছে, দুই গোয়েন্দা, চার, পাঁচ, ছয়, সাত গোয়েন্দাও গজিয়ে উঠেছে, আগের ছুটিতে টেরিয়ার ডয়েল তো এগারো গোয়েন্দা বানিয়ে বসেছিল। যদিও কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। একবার তো গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ডাকাতের ধোলাই খেয়ে এসে পুরো পনেরো দিন বিছানায় পড়েছিল 'শুঁটকি টেরি' আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

ছাপানো কার্ডের স্তূপ থেকে একটা কার্ড তুলে নিল কিশোর।

মেশিন থামিয়ে ফিরে তাকাল মুসা। 'কেমন হয়েছে?'

'খুব ভাল,' প্রশংসা করল কিশোর। 'ভাবতেই পারিনি, এত উন্নতি করব আমরা, আমাদেরকে নকল করবে লোকে!'

চুপ করে রইল মুসা। 'তিন গোয়েন্দা'র গোড়াপত্তনের সময় ভাবতে পারেনি সে-ও, সংস্থাটা এভাবে টিকে যাবে, কিশোর যখন প্রস্তাব দিয়েদিল, বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি তাকে মুসা। আরও একটা ব্যাপারে ক্ষীণ আপত্তি ছিল তার, কিশোর কেন গোয়েন্দাপ্রধান হবে, মুসা কেন নয়? তার গায়ে কিশোরের চেয়ে জোর অনেক বেশি, তার বয়েসী যে কোন ছেলেকে পিটিয়ে তক্তা করে দিতে পারে অনায়াসে। কিন্তু কিশোর প্রমাণ করে দিয়েছে, গোয়েন্দা হতে হলে গায়ের জোরের চেয়ে মগজের জোর অনেক বেশি দরকার। রবিনও প্রমাণ করে দিয়েছে, সে একটা চলন্ত বিশ্বকোষ।

তিরিশ ফুট লম্বা একটা মোবাইল হোমের ভেতর তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার। জঞ্জালের স্তূপের ভেতরে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে ট্রেলারটা, বাইরে থেকে এর কিছুই দেখা যায় না। ওটা এত বেশি পুরানো আর নষ্ট হয়ে গেছে, মেরামত করেও বিক্রি করা যাবে না, তাই ছেলেদেরকে দান করে দিয়েছেন রাশেদ চাচা। অনেক সময় লাগিয়ে অনেক পরিশ্রম করে ট্রেলারটাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে তিন গোয়েন্দা।

ট্রেলারের ভেতর সুন্দর একটা ল্যাবরেটরি করেছে ছেলেরা। ছবি প্রসেস করার জন্যে ছোট্ট একটা ডার্করুমও আছে। টেলিফোন আছে—তার খরচা ছেলেরাই জোগাড় করে অবসর সময়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজ করে; চাচা-চাচীর কাছে কিশোর চাইলেই টাকা পায়, কিন্তু হাত পাততে রাজি নয় সে। ছোট্ট র‍্যাকে চমৎকার করে সাজানো রয়েছে কিছু প্রয়োজনীয় বই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে

কয়েকটা ফাইল—রবিনের দপ্তর। এ-যাবৎ যতগুলো রহস্যের সমাধান করেছে তিন গোয়েন্দা, সবগুলোর বিস্তারিত রিপোর্ট লেখা রয়েছে ওসব ফাইলে।

'আগের কার্ডটার চেয়ে ভাল হয়েছে, কি বলো?' মুসা বলল।

'হ্যাঁ,' হাতের কার্ডটা দেখছে কিশোর। প্রশ্নবোধকগুলো উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, কার্ডের কোণে এখন বড়সড় একটা আশ্চর্যবোধক। 'এই চিহ্নটাই বরং ভাল। রহস্যময়, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য বোঝাতে এটাই ব্যবহার হয়, প্রশ্নবোধক দেয়াটা ভুলই হয়েছিল।'

'হুঁ।' একটু চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আচ্ছা, জিনাদের বাড়ির কোন খবর আছে?'

'না,' মাথা দোলাল কিশোর। 'রুজ যাওয়ার পর আর কোন খবর পাইনি। কি শুনে যে এত ভয় পেল সে! সত্যিই শুনেছে, না কল্পনা তাই বা কে জানে! প্রায় বলত, মিস মারভেল অদ্ভুত, কিন্তু কেন এটা মনে হয়েছে তার, বলেনি কখনও।'

'বলবে আবার কি? সে তো আমরা নিজেরাই দেখেছি। অদ্ভুত না হলে কাটা ক্ষতে মাকড়সার জাল দিতে চায়…'

'শ্ শ্ শ্ শ্!' হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল রাখল কিশোর। জঞ্জালের ওপাশে মৃদু একটা শব্দ শুনেছে।

ঝট করে সোজা হলো মুসা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল জঞ্জালের ওপাশে। পরক্ষণেই তার উত্তেজিত চিৎকার কিশোরের কানে এল ঃ 'তাই তো বলি! ঘোড়ার গন্ধ আসে কোত্থেকে! অনেকক্ষণ থেকেই পাচ্ছিলাম।'

গটমট করে এসে ওয়ার্কশপে ঢুকল জিনা, পেছনে এল মুসা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'বাহ্, বেশ জমিয়ে নিয়েছ!'

'কতক্ষণ আড়ি পাতা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অনেকক্ষণ,' কারও বলার অপেক্ষায় থাকল না জিনা, একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল, মেশিনটার কাছাকাছি।

'কেন?' গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর।

কার্ডের স্তূপ থেকে একটা কার্ড তুলে দেখছে জিনা। 'হুম্‌ম্! হাতখরচ যা পাই, তা দিয়ে প্রফেশনাল ডিটেকটিভ ভাড়া করতে পারব না,' মুখ তুলল। 'তোমার রেট কত?'

'তিন গোয়েন্দাকে ভাড়া করতে চাও?'

'যদি সম্ভব হয়।'

'তা কাজটা কি? না শুনে কিছু বলতে পারছি না। আমরা আগ্রহী না-ও হতে পারি।'

'হবে না মানে? হয়ে বসে আছ,' বলল জিনা। তোমাদের আলাপ-আলোচনা সব শুনেছি। আমাদের বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানার জন্যে মাথা কুটে মরছ তোমরা। তাছাড়া, রাজি না হয়ে উপাও নেই তোমাদের।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

'মানে, তেমন সাবধান নও তোমরা। পেছনের বেড়ার এক জায়গায় একটা ছবি আঁকা আছে না, অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য, ওই যে উনিশশো পাঁচ সালে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

ঘটেছিল স্যান ফ্র্যানসিসকোতে?'

'উনিশশো ছয় সালে,' শুধরে দিল কিশোর।

'উনিশশো বত্রিশ হলেই বা কি এসে যায়। আসল কথা হলো, দৃশ্যটাতে ছোট্ট একটা কুকুরের ছবি আছে। ওটার চোখ টিপলেই বেড়ার এক জায়গায় একটা ছোট দরজা খুলে যায়, খুলতে দেখেছি তোমাদেরকে। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার গোপন পথ নিশ্চয়? টেরিয়ার ডয়েল জানে?'

'ব্ল্যাকমেইল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'যা খুশি মনে করতে পারো,' জিনা বলল। 'টাকা দেব না বলে করছি, ভেব না। টাকা দেব ঠিকই। আসলে, সাহায্য চাই আমি। তিন গোয়েন্দার খুব নাম শুনলাম, তাই তোমাদের কাছেই এসেছি।'

'খুব ভাল করেছ!' হাসল মুসা।

'বেশ। এখন বলো, আমাকে সাহায্য করবে, না শুঁটকির কাছে যাব?'

'ও এখন শহরে নেই,' হাসি মুছে গেল মুসার মুখ থেকে।

'ওর চেলারা আছে। এগারো গোয়েন্দা বানিয়েছে ওরা। শুনলাম, তোমাদের সঙ্গে ওদের আদায়-কাঁচকলায় বন্ধুত্ব। যাব?'

একটা খালি বাক্সের ওপর বসে পড়ল কিশোর। 'সাহায্য? কি সাহায্য চাও?'

'ওই ভ্যারাডের বাচ্চাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চাই,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জিনা।

'ভ্যারাড? কালো পোশাক পরে যে লোকটা এসেছে, ফেকাসেমুখো?'

'হ্যাঁ। ফেকাসে হবে না তো কি হবে, সারাদিন থাকে ঘরে বসে! রাতে বেরোয়। শিওর, ওর বাপ একটা ছুঁচো ছিল।'

'ও যেদিন এল, তুমি ঘোড়া থেকে পড়ে পা কাটলে। সেরাতেই রুজ পালাল,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর, তারমানে জোর ভাবনা চলেছে মাথায়। 'অদ্ভুত কিছু একটা শুনেছে। না, কল্পনা করেনি, ঠিকই শুনেছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে,' কিন্তু গলায় জোর নেই জিনার। অস্বস্তি বোধ করছে। হাতের কার্ডটা একবার ভাঁজ করছে, আবার খুলছে। 'এর জন্যে ভ্যারাডই দায়ী,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'কোন উপায়ে সে-ই সৃষ্টি করেছে শব্দটা। ও আসার আগে আর ও-রকম শব্দ শোনা যায়নি।'

'ও-কি এখনও তোমাদের বাড়িতেই থাকছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'নাহলে তাড়াতে চাইছি কেন? খালার ধারণা, হিউগ ভ্যারাডের মত মহাপুরুষ আর হয় না। খালার মাথায় আগে থেকেই গণ্ডগোল ছিল। রোজ রাতে বিছানায় ছুরির ডগা দিয়ে অদৃশ্য চক্র আঁকত, ভূত-প্রেত যাতে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। ভ্যারাড আসার পর আরেকটা নতুন কাণ্ড যোগ হয়েছে। মোমবাতি। ডজনে ডজনে জ্বালিয়ে রাখে সারারাত। যে-সে মোম হলে চলবে না, হলিউডের এক বিশেষ দোকান থেকে বিশেষ মোম আনায়। বিভিন্ন রঙের। নীলচে-লাল মোম নাকি বিপদ ঠেকায়, শুধু নীল দিয়ে আরেকটা কি উপকার হয়, কমলা রঙ শুভ, এমনি একেক রঙের একেক গুণ। রোজ রাতে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢোকে খালা আর ভ্যারাড, মোম জ্বালে, দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়।'

'কি করে?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল কিশোর।

'কি করে কে জানে! মাঝে মাঝে বিচিত্র শব্দ শোনা যায়,' নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল জিনা। 'দোতলা থেকেও শুনেছি। তবে হল রুম থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। লাইব্রেরি থেকে আসে।'

'রুজ বলেছে, গান নাকি গায়?'

'গান?' নিজের হাতের দিকে তাকাল জিনা। 'তা···হ্যাঁ, গান বলতে পারো!···তবে এমন গান জন্মেও শুনিনি! শুনলেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়।'

দুই ভুরু সামান্য কাছাকাছি হয়ে গেছে কিশোরের। 'রুজ বলেছে, ''কিছু একটা'' গান গায়। মানুষের কথা বলেনি।'

সোজা হয়ে বসল জিনা, সরাসরি তাকাল কিশোরের দিকে। 'কে কি বলেছে না বলেছে, ওসব শোনার দরকার নেই। আমি বলছি, কাজটা ভ্যারাডের। আমি চাই, ওর শয়তানী বন্ধ হোক।'

'এতই খারাপ শব্দ?'

'তাহলে আর বলছি কি? কাজের লোক থাকছে না। এজেন্সীতে ফোন করে দু'দুজন লোক আনিয়েছি, রুজের মতই ওরাও পালিয়েছে এক রাত থেকেই। এতবড় বাড়ি, কে পরিষ্কার করে, কে কি করে? হাঁটু-সমান ধুলো জমেছে, না খেয়ে মরার জোগাড় হয়েছে আমার। রাঁধে কে? আমি পারি না, খালা তো আমার চেয়ে আনাড়ি। দিনের বেলা টুঁ শব্দটি করতে পারি না আমি আমার নিজের বাড়িতে। কেন? না, ভ্যারাড ছুঁচোটা সারারাত কেঁচো ধরে খাওয়ার জন্যে সজাগ থেকেছে, দিনে তো ঘুমোতে হবে তাকে! শয়তান কোথাকার! ওকে ঝাড়ু মেরে বিদেয় করতে চাই আমি।'

'কিন্তু, অবাঞ্ছিত মেহমান তাড়ানোর কাজ তো আমাদের নয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'তোমার খালাকে সব খুলে বলে দেখো···'

'বলে বলে মুখ ব্যথা করে ফেলেছি,' নিমের তেতো ঝরল যেন জিনার কণ্ঠে। 'খালি হাসে। বেশি বললে অন্য কথায় চলে যায়। ফিলমের রদ্দিপচা যেসব জিনিসপত্র জোগাড় করে এনেছে, ওগুলোর কথা তোলে।'

'ফিলমের জিনিসপত্র?' মুসার প্রশ্ন।

'আরে, বুড়িটার কি এক দোষ? কোথায় কোথায় গিয়ে রাজ্যের সব পচা মাল কিনে আনে! স্প্রিঙ ফিভার ছবিতে ডেলা লাফনতি যে আলগা চোখের পাতা ব্যবহার করেছে, সেগুলো এনেছে। মারকোস রিভেঞ্জ-এ জন মেব্যাংক-এর ব্যবহার করা তলোয়ারটা জোগাড় করেছে চড়া দাম দিয়ে। ফিলম স্টারদের ফেলে দেয়া বাতিল জিনিসের নীলাম হবে শুনলেই ছোটে খালা। ওসবের পেছনেই যায় তার টাকা।'

'এতে দোষের কিছু দেখছি না,' বলল কিশোর।

'আমিও দেখতাম না, যদি ওসব চক্র আঁকা আর মোমবাতি জ্বালানো বাদ দিত। তা-ও না হয় সওয়া গেল, কিন্তু ওই ভ্যারাড ব্যাটাকে আমি একদম সইতে পারছি না। ও আর ওর বিচ্ছিরি গান!'

ছাপার মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মসা। 'কিশোর, আমার মনে হয়,

ব্যাটাকে তাড়ানো কঠিন কিছু না। ওর বিছানায় শুঁয়োপোকা ছেড়ে দিতে পারি আমরা, বাথটাবে ব্যাঙ ছেড়ে দিতে পারি, জুতোর ভেতরে সাপ ভরে রাখতে পারি...'

'না না, ওসবে কাজ হবে না!' বাধা দিয়ে বলল জিনা। 'বরং খুশিই হবে। সাপ ভীষণ পছন্দ ওর! ছুঁচোটার দুর্বলতা কোথায় জানা দরকার।'

'ওকেও ব্ল্যাকমেইল?' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'অনুচিত কিছু হবে না। আমার বাড়িতে ঢুকে বসে অত্যাচার করছে সে এমনই চশমখোর, আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না, পাত্তাই দিতে চায় না। যেন বাড়িটা তার বাপের, আমিই অন্যায় ভাবে ঢুকে পড়েছি। ওর ব্যাপারে জানা খুব কঠিন হবে, খালাও মুখ খুলতে চায় না।'

'হয়তো তোমার খালাও জানেন না,' মুসা বলল।

'হতে পারে,' মাথা ঝোঁকাল জিনা। 'নিশ্চয় ভাল জানে। খারাপ কিছু জানলে ব্যাটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। খালাটা ভীষণ বোকা, তবে মানুষ খারাপ না। ওসব কথা থাক। আসলে, ভ্যারাডের ব্যাপারে ইনফরমেশন চাই আমি। ও কে, কোথা থেকে এসেছে, কি করে, জানতে চাই। সে-জন্যে তোমাদের সাহায্য দরকার।' একটু চুপ থেকে বলল, 'শোনো, আজ রাতে পার্টি দিচ্ছে খালা। টেলিফোনে দাওয়াত করছে, শুনে এসেছি। অতিথিদের খাওয়ানোর জন্যে কি জানি রাঁধছে ভ্যারাড ব্যাটা। বেশি লোক মানেই বেশি কথা। কিছু না কিছু জেনে যাবই আমরা। পার্টিতে তোমাদেরও দাওয়াত, আমার তরফ থেকে।'

'ভ্যারাডের রান্না খাওয়ার জন্যে?' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার।

'না, দূর থেকে দেখার জন্যে। ইচ্ছে হলে গন্ধ শুঁকতে পারো যত খুশি। পার্টি শেষে অতিথিদের অনুসরণ করবে তোমরা, দেখবে, কে কোন গুহায় গিয়ে ঢুকছে। তারপর ভাব, কি করা যায়। হ্যাঁ, গ্যারেজের কাছে হাজির থেকো রাত আটটায়। পেছন দিয়ে ঢুকো, তাহলে কারও চোখে পড়বে না।' উঠে দাঁড়াল জিনা। 'ঠিক আটটা, মনে থাকে যেন। নইলে শুঁটকির সঙ্গে দেখা করব গিয়ে, হ্যাঁ।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডের আঙ্গিনার দিকে চলে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ।

'নতুন মক্কেল পাওয়া গেল,' কিশোর বলল।

'কিন্তু ও যে ব্ল্যাকমেইল...'

'আরে দূর, ব্ল্যাকমেইল,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'এভাবে এমন একটা সুযোগ এসে যাবে ভাবতেই পারিনি। রুজ পালিয়ে আসার পর থেকেই ভাবছি, কি করে ঢোকা যায় ও বাড়িতে।'

ছাপার মেশিনের পেছনে একটা জায়গায় হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা লোহার পাত, উঠে গিয়ে ওটা এক পাশে সরিয়ে রাখল কিশোর। বেড়িয়ে পড়ল ইয়া মোটা এক পাইপের মুখ। ভেতরে, নিচের দিকে পুরানো কার্পেট ফালি করে কেটে বিছানো, হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় হাতে-হাঁটুতে ঘষা লেগে চামড়া ছিলে না যায় সে-জন্যে। এটা হেডকোয়ার্টারে ঢোকার আরেকটা গোপন প্রবেশ-পথ, 'দুই সুড়ঙ্গ'। জঞ্জালের স্তূপের নিচ দিয়ে চলে গেছে পাইপটা, আরেক মাথা শেষ হয়েছে গিয়ে একেবারে ট্রেলারের মেঝের তলায়। মেঝেতে গোল গর্ত কেটে

তার মুখে গোল দরজা বসিয়ে দেয়া হয়েছে, ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।

'ভেতরে যাচ্ছ?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ। রবিনের বোধহয় আজ সকালে কাজ নেই লাইব্রেরিতে। ওকে খবরটা দিতে হবে। বলব, আজ রাতে এক পার্টিতে দাওয়াত পেয়েছি আমরা।'

'আমিও আসি,' বলল মুসা। 'পেরেক আর হাতুড়ি নেব। লাল কুকুর চার বন্ধই করে দিতে হচ্ছে। জিনাকে বিশ্বাস নেই। পান থেকে চুন খসলেই হয়তো গিয়ে বলে দেবে শুঁটকির দলকে, হেডকোয়ার্টারে ঢুকে সব তছনছ করে দিয়ে যাবে ওরা। তার চেয়ে পথ বন্ধই করে দিই আপাতত।'

চার

সাঁঝের বেলা পারকার হাউসকে পাশ কাটিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

'পার্টি খুব বড় না,' বলল কিশোর। গাড়ি বারান্দায় মাত্র তিনটে গাড়ি দেখেছে। একটা কমলা স্পোর্টস কার, একটা সবুজ সরকারী গাড়ি, আরেকটা ধূলিধূসরিত ছাই রঙের স্যালুন।

বাড়ির পেছনের খানিকটা খোলা জায়গা পেরিয়ে গ্যারেজের পেছনে এসে দাঁড়াল ওরা। ওদের অপেক্ষায় রয়েছে জিনা। নিচু গলায় বলল, 'সবাই এসে গেছে। ডাইনিং রুমে। চত্বরের দিকের দরজা খুলে রেখেছি, এসো। আস্তে, শব্দ করো না।'

পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল ওরা চত্বরের ধারে, ওইসটেরিয়া ঝাড়ের ছায়ায়। চোখের সামনে একটা লতা সরিয়ে জিনার কাঁধের ওপর দিয়ে ডাইনিং রুমে উঁকি দিল কিশোর।

এমন পার্টি জীবনে দেখেনি সে। পাঁচ জন লোক, একটা গোল টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়েছে নীরবে। লালচে-লাল নতুন একটা পোশাক পরেছে মিস মারভেল, আস্তিনের প্রান্ত অস্বাভাবিক ছড়ানো, গলা পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে উঁচু কলার। তার উল্টো দিকের লোকটা হিউড ভ্যারাড, আগাগোড়া কালো পোশাক পরনে, রুপার ভারি মোমদানিতে জ্বলছে দুটো লাল মোমবাতি, ম্লান আলোয় চকচক করছে লোকটার ফেকাসে চেহারা। ছোট করে ছাঁটা কালো চুল আঁচড়ে কপালের ওপর এনে ছড়িয়ে ফেলেছে, ঘন ভুরু ছুঁই ছুঁই করছে চুলের ডগা।

ভ্যারাডের বাঁ পাশে ছিপছিপে এক মহিলা, পরনে কমলা রঙের গাউন। মিস মারভেলের মতই চুলে কলপ লাগিয়েছে সে, কিন্তু রঙ পছন্দ ঠিক হয়নি তার। কমলা পোশাকের সঙ্গে হালকা লাল হাস্যকর রকম বেমানান লাগছে।

লাল-চুলো মহিলার পাশে সোনালি-চুলো আরেক মহিলা। আটসাট হালকা সবুজ পোশাক ছিঁড়ে-ফেটে বেরিয়ে যাবে যেন থলথলে মাংসল শরীর। তার পাশেই দাঁড়িয়েছে পঞ্চম লোকটা, পার্টিতে বেমানান। অন্য সবাই দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে, সে দাঁড়িয়েছে সামান্য কুঁজো হয়ে, সুযোগ পেলেই বসে পড়তে ইচ্ছুক যেন। অন্যেরা পার্টির জন্যে বিশেষ পোশাক পরে এসেছে খুব সাবধানে বাছাই করে, কিন্তু ওই লোকটা অতসবের ধার ধারেনি, হাতের কাছে যা পেয়েছে, তা-ই তাড়াহুড়ো করে পরে চলে এসেছে বোধহয়। পুরানো মলিন জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে

ময়লা স্পোর্টস শার্ট, তার নিচ থেকে বিচ্ছিরিভাবে বেরিয়ে আছে টি-শার্টের খানিকটা। উসকো-খুসকো ধূসর চুলে কতদিন চিরুনি আর নাপিতের কাঁচি পড়েনি কে জানে!

এখান থেকে কথা শোনা যাবে না, আরও সামনে এগোনোর ইশারা করল জিনা। ফিসফিস করে বলল, 'সব কটার মাথায় ছিট আছে!'

'ওরা ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানি না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'মেহমানদের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিলাম, ভ্যারাডের বাচ্চা এমন একখান চাউনি দিল না আমাকে! মরা মাছের চোখের মত ঠাণ্ডা ব্যাটার চোখ, গা শিরশির করে তাকালে! ময়লা জ্যাকেট পরে আছে যে লোকটা ওর নাম রাসলার, খাবারের দোকানের মালিক। কমলা গাউন পরা কঙ্কালটার নাম জেরি গ্যানারিল, নাপতানী, খালার চুল ও-ই ড্রেসিং করে। কমলা রঙের কাপড় পরলে নাকি সে জ্যান্ত হয়ে ওঠে। সে জন্যেই বোধহয় খালি ঝাঁকি খেতে থাকে তার শরীর। আর ওই যে সোনালি-চুলোটা, ওর একটা বড়সড় দোকান আছে, স্বামী হেলথ ডিপার্টমেন্টের বড় অফিসার।'

মৃদু একটা শব্দ হলো, কোন দিকে ঠিক বোঝা গেল না। কিশোরের মনে হলো, গ্যারেজে। কি জানি, ঘোড়াটা খুর ঠোকার শব্দ হবে হয়তো।

'কিছু একটা ঘটবে,' ফিসফিস করে বলল জিনা। 'চলো, এগিয়ে দেখি।'

আরও এগিয়ে আরেকটা ওইসটেরিয়া ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াল ওরা।

একটা কাঁচের বাটিতে পানির মত কি একটা তরল পদার্থ ঢেলে ভ্যারাডের দিকে এগিয়ে দিল মিস মারভেল। দু'হাতে ধরে বাটিটা তুলল ভ্যারাড, মোমের শিকার দিকে দৃষ্টি স্থির, কোন রকম ভাবান্তর নেই রক্তশূন্য চেহারায়। সাপের চোখের মত ঠাণ্ডা চোখের তারা চকচক করছে মোমের আলোয়।

'শুরু করা যায়,' বলল ভ্যারাড।

টেবিলে আরও কাছাকাছি হলো অতিথিরা। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনল বলে মনে হলো কিশোরের।

'সবাই আসেনি আজ,' গম্ভীর গলায় বলল ভ্যারাড। 'ডাক্তার শয়তান আজ দেখা না-ও দিতে পারেন। যোজন যোজন দূরে রয়েছেন মহাসর্প, তিনি কথা বলবেন কিনা, তাই বা কে জানে! তবু চেষ্টা করে দেখা যাক।'

বাটিটা একবার ঠোঁটে ছুঁইয়েই কমলা পোশাক পরা মহিলার হাতে তুলে দিল ভ্যারাড।

'আমাদের বৈঠক সার্থক হোক!' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল জেরি গ্যানারিলের গলা থেকে। বাটিতে চুমুক দিল। 'হবে, হবে! কেন, সেই যে, বাড়িওলীর সঙ্গে যখন আমার লাগল...'

'চুপ!' ধমক দিল ভ্যারাড। 'আবেশই নষ্ট করে দেবেন!'

কুঁকড়ে গেল গ্যানারিল, বাটিটা তুলে দিল মিস মারভেলের হাতে। চুমুক দিয়ে খানিকটা তরল খেয়ে সে আবার তুলে দিল রাসলারের হাতে। সে খেয়ে দিল সবুজ পোশাক পরা মহিলার হাতে। তার হাত থেকে আবার বাটি ফিরে এল ভ্যারাডের কাছে।

'এবার বসতে পারি আমরা,' ভ্যারাড বলল।
যার যার চেয়ার টেনে বসে পড়ল বৈঠকের সদস্যরা।
'মিস মারভেল, আপনার ইচ্ছে কি, বলুন,' আদেশের সুর ভ্যারাডের গলায়।
মাথা নুইয়ে অদৃশ্য কারও উদ্দেশ্যে সালাম জানাল মিস মারভেল। 'আমি ক্রিস্টাল বলটা চাই। অ্যানি পলকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হোক, কিছুতেই যেন সে ওটা কিনতে না পারে।'
'বীলিয়ালকে অনুরোধ করব?'
'করুন। মোট কথা আমি বলটা চাই।'
অন্য সদস্যদের দিকে তাকাল ভ্যারাড। 'আপনাদের কি মত?'
'আমার নিজের সমস্যা নিয়েই বাঁচি না!' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল হাসলার।
'এখানে এক "ভাইয়ের" সমস্যা সবারই সমস্যা,' মনে করিয়ে দিল ভ্যারাড।
'অ্যানিকে দূরে কোথাও বেড়াতে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?' শরীর ঝাঁকি খেল গ্যানারিলের। 'এই দিন পনেরোর জন্যে···কবে পাঠালে সুবিধে, আপা?'
'একুশ তারিখের আগে,' বলল মিস মারভেল।
মিস মারভেলের ওপর থেকে সবুজ পোশাক, তারপর হাসলারের ওপর এসে থামল ভ্যারাডের কালো চোখ। 'তাহলে আমরা সবাই একমত,' চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল সে।
থিরথির করে কাঁপছে মোমের শিখা। কয়েক মিনিট কিছুই ঘটল না। পাথরের মূর্তির মত নিথর হয়ে আছে ঘরের সব ক'জন লোক।
শোনা গেল শব্দটা, ঘন কালো রাতের অন্ধকারে ভর করে যেন ভেসে এল। প্রথমে অস্পষ্ট, মোলায়েম একটা কাঁপা কাঁপা আওয়াজ, স্থির বাতাসকে ঘুঁটছে যেন ধীরে ধীরে। গানের মত, কিন্তু, গান বলা চলবে না কিছুতেই, শরীর হিম-করা বেসুরো সুর আছে, কথা নেই, তাল লয় ছন্দ, কিচ্ছু নেই। একবার চড়া পর্দায় উঠছে সুর, পরক্ষণেই নেমে যাচ্ছে, একবার তীক্ষ্ণ, একবার মোলায়েম। কমছে, বাড়ছে, থামছে, গোঙাচ্ছে, বিড়বিড় করছে, ফোঁপাচ্ছে, তারপর হঠাৎ করেই হাঁসফাঁস করে উঠছে, যেন গায়কের গলা টিপে ধরেছে কেউ!
আতঙ্কে রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দার। এমন বিচ্ছিরি গান জীবনে শোনেনি ওরা। ভয়ঙ্কর এক কালো জগৎ থেকে উঠে আসছে যেন দুরন্ত শয়তান, মানুষকে টেনে নিয়ে যাবে শব-গন্ধে ভরা নরকে! ঢোক গিলল রবিন, কাঁপা কাঁপা শ্বাস পড়ছে মুসার।
শান্ত রয়েছে কিশোর, গভীর মনোযোগে দেখছে অতিথিদের কাণ্ড। নতুন কেউ ঢোকেনি ঘরে। ছাতের দিকে চেয়ে আছে ভ্যারাড, স্থির।
অবশেষে পিছিয়ে যেতে শুরু করল জিনা। ছেলেরা অনুসরণ করল তাকে। নিঃশব্দে চলে এল খোয়া বিছানো পথে। গান চলছেই, জ্যান্ত অশরীরী কিছু একটার মত তাদের সঙ্গে চলেছে যেন কুৎসিত শব্দ।
পেছনের চত্বরে চলে এল চারজনে। প্রাসাদের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জিনা। আস্তে আস্তে ভয় কেটে যাচ্ছে রবিন আর মুসার।
'এই গান শুনেই পালিয়েছিল রুজ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল শুধু জিনা, মুখে কিছু বলল না।

'আমিও পালাতে চাই,' চুলে আঙুল চালাচ্ছে মুসা।

গভীর শ্বাস টানল জিনা। 'আমি চাই না,' কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা। 'এটা আমার বাড়ি। খালা থাকতে চাইলে থাকবে, কিন্তু ভ্যারাডকে যেতে হবে এখান থেকে!'

'কিন্তু অকাজটা ভ্যারাডের নয়,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'ওর মুখের একটা পেশীও নড়েনি, দেখেছি। ও শব্দ করেনি।'

'ও করেনি, কিন্তু এতে ওর হাত আছেই,' ভোঁতা গলায় বলল জিনা।

গ্যারেজে অস্থিরভাবে পা ঠুকল কমেট, মৃদু চিঁহিঁহিঁ করে উঠল।

'মে-ট!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'গ্যারেজে ঢুকেছে কেউ!'

প্রায় লাফিয়ে উঠে ছুটল কিশোর। গিয়ে এক টান মেরে খুলে ফেলল গ্যারেজের দরজা, পরক্ষণেই জোরে এক ধাক্কা খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। দুপদাপ পা ফেলে খোলা জায়গাটার দিকে ছুটে গেল কালো একটা মূর্তি।

'কিশোর?' চেঁচিয়ে উঠে গোয়েন্দা প্রধানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মুসা।

'আমি ঠিকই আছি,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'লোকটা কে, দেখেছ?'

'মোটকা!' জবাবটা দিল রবিন। 'বেশি লম্বা না। গোঁফ আছে মনে হলো, ঝাঁটার মত গোঁফ।'

'নজর তো খুব কড়া!' জিনার কণ্ঠে শ্রদ্ধা। 'অন্ধকারে দেখলে কি করে এত কিছু?'

'অন্ধকার কোথায় দেখছ?' কিশোর বলল। 'তারার আবছা আলো আছে না? নজর কড়া না হলে গোয়েন্দা হবে কি করে? গান যে থেমে গেছে খেয়াল করেছ?'

রান্নাঘরে আলো জ্বলল, গ্যারেজের ছায়ায় লুকিয়ে পড়ল ছেলেরা।

দরজা খুলে গেল রান্নাঘরের। 'কে?' মিস মারভেলের গলা।

'আমি, খালা,' জবাব দিল জিনা। 'মেটকে দেখতে এসেছি।'

'বড় বেশি বেশি করো তুমি ঘোড়াটাকে নিয়ে!' বিরক্তি ঝরল মিস মারভেলের কণ্ঠে। 'এসো, জলদি এসো।' বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

গাড়ি বারান্দায় ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

'পার্টি বোধহয় ভাঙল,' চাপা গলায় বলল রবিন।

'সকালে এসো আবার,' জিনা অনুরোধ করল।

'আসব,' বলল কিশোর।

খোয়া বিছানো পথে জিনার হালকা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

'চলো, আমরাও কেটে পড়ি,' এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মুসা। 'আবার কখন শুরু হয়ে যায় গান, কে জানে!'

পাঁচ

পরদিন সকালে, বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। তারের বেড়া দেয়া মাঠে ঘাস খাচ্ছে আপালুসাটা, তা-ই দেখছে।

'চমৎকার স্বাস্থ্য!' মুসা বলল এক সময়। 'অনেক মানুষেরই থাকে না।'

'এবং কোন মানুষই ঘাস খায় না,' পেছন থেকে শোনা গেল জিনার গলা। 'তোমার যে কথা! ঘোড়া আর মানুষ এক হলো নাকি?'

ঘুরে তাকাল ছেলেরা। জিনার পরনে জিনসের প্যান্ট, কড়া ইস্ত্রী করা শার্ট। 'তারপর? কিছু ভেবেছ! কিসে গান গায়, বুঝেছ কিছু?'

'গতরাতে আর কিছু ঘটেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর, পারকার হাউসের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

'না,' গলা সমান উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে এপাশে চলে এল জিনা। 'আচ্ছা, লোকটা গ্যারেজে লুকিয়ে ছিল কেন, বলো তো?'

'জানি না,' হেসে মাথা নাড়ল রবিন। 'ওর সঙ্গে তো আর আমাদের কথা হয়নি। তবে অনুমান করতে পারি। হয়তো চোর, বাড়িতে ঢোকার পথ খুঁজছিল। কিংবা ভবঘুরে, রাত কাটানোর জন্যে ঢুকেছিল গ্যারেজে।'

'ওই বিচ্ছিরি গান গাওয়ার জন্যেও ঢুকে থাকতে পারে,' কিশোর বলল। 'মনে আছে, ভ্যারাড বলেছিল, অনেক দূর থেকে আসতে পারে মহাসর্পের গান?'

'কিন্তু সাপ তো গান গায় না,' প্রতিবাদ করল জিনা। 'সেটা মহাই হোক, আর সাধারণ সাপই হোক। কেবল হিসহিস করতে পারে।'

'একটা কথা ভুলে যাচ্ছ,' যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'হিউগ ভ্যারাড আসার আগে ওই গান কখনও শোনোনি। তারমানে ওসবের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত লোকটা। তবে এ-ও ঠিক, গতরাতে গান যখন চলছিল, ডাইনিং রুমে চেয়ারে চুপচাপ বসেছিল সে, স্পষ্ট দেখেছি, যেন ঘোরের মধ্যে ছিল।'

'টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করে না তো?' মুসা প্রশ্ন রাখল। 'হয়তো গোঁফওয়ালা লোকটার সঙ্গে আগেই পরামর্শ করে নিয়েছিল ভ্যারাড। ঠিক সময় এসে ডাইনিংরুমের কাছাকাছি কোথাও যন্ত্রটা বসিয়ে চালু করে দিয়ে, গ্যারেজে গিয়ে লুকিয়ে বসেছিল লোকটা। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়াতক অপেক্ষা করত ওখানে, কমেটের জন্যে পারেনি।'

'তা হতে পারে,' সায় দিল কিশোর। 'কিন্তু চট করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। এমনও হতে পারে, গোঁফের সঙ্গে ভ্যারাডের কোন সম্পর্কই নেই।'

ঠোঁট বাঁকাল জিনা। 'তারমানে, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই রয়ে গেছি! ভ্যারাড ব্যাটাও যাচ্ছে না আমার বাড়ি থেকে, ওই ন্যাট-ঢিলা লোকগুলোও আসতেই থাকবে!'

'গতরাতের অতিথিরা তো?' কিশোর বলল। 'ঠিকই বলেছ, সত্যিই নাট-ঢিলা! ওই রাসলারটা তো একটা খাটাস, স্বভাব-চরিত্রও বিশেষ সুবিধের মনে হলো না।'

'ব্যাটা খাবারের দোকান চালায় কি করে! স্বাস্থ্য দপ্তর যে ওর লাইসেন্স এখনও ক্যানসেল করেনি, সেটাই আশ্চর্য!'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার,' কিশোর বলল, 'ওরা কোন একটা সাধনার জন্যে জমায়েত হয়, শয়তানকে ডাকে তো, সম্ভবত প্রেতসাধনা করে। গতরাতে তোমার খালার সমস্যা সমাধানের জন্যে এসেছিল। শুনলে না, কোন এক অ্যানি পলকে শহর থেকে তাড়াতে চাইছে ওরা।'

'পাগলামি!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'স্রেফ পাগলামি!'

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। 'কোন বলের কথা বলেছে ওরা, আমি জানি।'

'জানো?'

'একুশ তারিখে একটা নীলাম হবে, বিখ্যাত অভিনেতা মরহুম র‍্যামন ক্যাসটিলোর বাড়িতে। অন্যান্য অনেক জিনিসের মাঝে কাচের বলটাও রয়েছে, এটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন দা ভ্যামপায়ারস লেয়ার ছবিতে। সেদিন খবরের কাগজ পড়ে আলোচনা করছিল চাচা-চাচী ব্যাপারটা নিয়ে। অভিনেতাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র কেনার জন্যে পাগল তোমার খালা, কাচের বলটা কিনতে আগ্রহী তো হবেই।'

'এখন বুঝতে পারছি, ভ্যারাডকে কেন এত খাতিরযত্ন করছে খালা।'

'শয়তান-সাধকের ক্ষমতা ব্যবহার করে অ্যানি পলকে তাড়াতে চায় শহর থেকে, নীলামের সময়।'

'খালার সঙ্গে অ্যানি পলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক, আমি জানি।'

'ওই মহিলাও তোমার খালার মত জিনিস কালেকশন করে নাকি?'

'করে। খালার চেয়ে বড় পাগল। বিধবা, মস্ত ধনী। ওই মহিলা নীলামে হাজির থাকলে কাচের বল আর খালার ভাগ্যে জুটছে না। অত টাকা নেই খালার।'

'সেজন্যেই শয়তানের বৈঠক বসিয়েছে ভ্যারাডকে দিয়ে, যাতে মহিলা নীলামেই হাজির হতে না পারে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল জিনা। 'কিন্তু ভ্যারাডের এতে কি লাভ? টাকার জন্যে করছে না। নগদ টাকা প্রায় নেই খালার। সামান্য যা আছে, খাটিয়ে রেখেছে শেয়ারের ব্যবসায়, লাভ যা আসে, খাওয়া-পরা আর বাতিল জিনিস কিনতেই শেষ। তারমানে টাকার লোভে কাজটা করছে না ভ্যারাড!'

'হুঁম!' মাথা দোলাল রবিন। 'উদ্দেশ্য জানা যাচ্ছে না তাহলে!'

'তবে,' কিশোর বলল, 'খুঁজলে বাড়িতেই যন্ত্রটা পেয়ে যেতে পারি। জিনা, তোমার খালাকে বললে কি তখন বিশ্বাস হারাবে ভ্যারাডের ওপর থেকে?'

হাসল জিনা। 'কানটা ধরে বের করে দেবে সোজা। আজই খুঁজতে পারবে। সকালে ফোন এসেছিল ভ্যারাডের কাছে।'

'নতুন কোন ব্যাপার?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'হ্যাঁ। এখানে এই প্রথম ফোন এসেছে তার কাছে। আমিই ফোন ধরেছিলাম। একটা লোক ভ্যারাডকে চাইল। ঘুমিয়েছিল ছুঁচোটা, দরজা ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙাতে হলো।'

'একসটেনশন আছে নিশ্চয়,' মুসা বলল। 'শুনেছ?'

'সময় পাইনি,' জিনা বলল। 'ফোন ধরল আর ছাড়ল। শুধু শুনলাম "ভেরি গুড", তারপরেই লাইন কেটে দিল। খালাকে ডেকে বলল, আজ রাতে আবার বৈঠক বসবে, "সব ভাইয়েরা"ই আসবে।'

'ওই বৈঠকের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করোনি তোমার খালাকে?' জানতে চাইল রবিন।

'করেছি। খালা ভারি খুশি, তার কাজের ব্যাপারে আমার আগ্রহ দেখে। অবশ্য কায়দা করে বলে তাকে ফুলিয়ে দিয়েছিলাম, নইলে কি আর মুখ খুলত? আজ রাতে ভ্যারাডের সঙ্গে যাচ্ছে খালা, বৈঠকে। বাড়িতে কেউ থাকবে না, আজই আমাদের সুযোগ। যন্ত্র লুকানো থাকলে, আজই খুঁজে বের করতে হবে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'যন্ত্রটা যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায়?'

'তাই বলে চেষ্টা করেও দেখবে না একবার?' জিনা বলল। 'ঘরের কোণে, কার্পেটের তলায়, কিংবা পর্দার আড়ালে...'

'তা থাকতে পারে,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কি করে খুঁজতে হয়, জানো?'

'এসব কাজ করিনি তো কখনও,' সত্যি কথাটাই বলল জিনা। 'তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'ফাইন। তাহলে আজ রাতে তুমিই খোঁজ। গ্যারেজেও বাদ দেবে না।'

'বাহ্, কি চমৎকার!' মুখ বাঁকাল জিনা। 'আমিই যদি এসব কাজ করব, তোমাদেরকে ডেকেছি কেন?'

'কোন জায়গা বাদ দেবে না, বুঝেছ?' জিনার কথা কানেই নিল না কিশোর। 'টেবিলের নিচে, সাইনবোর্ডের আড়ালে...'

'... কিংবা ওইসটেরিয়া ঝাড়ের আড়ালে,' মনে করিয়ে দিল জিনা।

'তা-ও দেখতে পারো। তবে সাবধানে জাফরিতে উঠবে। পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙো না আবার।'

'ভাঙব না। তা আমি যখন হাত-পা ভাঙার ঝুঁকি নেব তোমরা তখন কি করবে?'

'তোমার খালা আর ভ্যারাডকে অনুসরণ করব। দেখব, আজ রাতে কোথায় বৈঠক বসায়।'

ছয়

'সানসেট বুলভারের দিকে যাচ্ছে,' বোরিস বলল।

'জোরে।' চেঁচিয়ে উঠল পাশে বসা কিশোর। 'আরও জোরে! ট্রাফিক লাইটে আটকা পড়বেন না!'

'পড়ব না,' গ্যাস প্যাডালে পায়ের চাপ হঠাৎ বাড়িয়ে দিল বোরিস। প্রচণ্ড গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাল পুরানো ইঞ্জিন, কিন্তু নিমেষে গতি বেড়ে গেল গাড়ির, সিগন্যাল পোস্ট পেরিয়ে এল চোখের পলকে, আর মুহূর্ত দেরি হলেই লাল আলোয় আটকা পড়ে যেত।

বেগুনি-লাল ছোট্ট করভেটকে অনুসরণ করে চলেছে ইয়ার্ডের হাফট্রাক। সাগর পেছনে ফেলে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে উঠে যাচ্ছে দুটো গাড়ি। পথের দু'ধারে বেশ দূরে দূরে ছিমছাম বাড়িঘর, সুন্দর বাগানে উজ্জ্বল রঙের জিরেনিয়াম ফুটে আছে। মাঝে মাঝে বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। করভেট, কিন্তু ট্রাকটা মোড় পেরিয়ে এলেই আবার দেখা যাচ্ছে। অবশেষে গতি কমাল গাড়ি।

'টেরেনটি ক্যানিয়ন,' বিড়বিড় করল বোরিস। 'সামনে পথ শেষ, করভেটকে হারানোর ভয় নেই আর।'

হাফট্রাককে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল আরেকটা কমলা রঙের গাড়ি।

'জিনার খালার হেয়ারড্রেসার,' কিশোর বলল। 'মিস গ্যানারিল।'

'নাপতানী,' হাসল মুসা। 'বোরিস, আর কোন অসুবিধে হবে না আপনার। অন্ধকারেও দেখা যাবে ওই লাল চুল, অনুসরণ করতে পারবেন সহজেই।'

বোরিসও হাসল। কমলা গাড়িটাকে অনুসরণ করল। করভেটটাকে দেখা যাচ্ছে না, গিরিপথে মোড়ের ওপাশে হারিয়ে গেছে আবার। মোড় পেরোতেই ইঁটের উঁচু একটা দেয়াল চোখে পড়ল, পথের ওপর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো গাড়ি। ওগুলোর পাশে থেমেছে করভেট, মিস মারভেল আর হিউগ ভ্যারাড নামছে গাড়ি থেকে।

ঘাসে ঢাকা ঢালের গা ঘেঁষে গাড়িগুলোর দিকে পেছন করে ট্রাক রাখল বরিস। জিনার খালা কিংবা ভ্যারাডের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে মাথা নিচু করে রেখেছিল তিন গোয়েন্দা, আবার সোজা হয়ে বসল।

রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে আছে বোরিস। 'মিস মারভেলের দিকে হাত নাড়ছে গ্যানারিল।'

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল রবিন আর মুসা।

'আরে! ছাই রঙের স্যালুন!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রবিন। 'জিনাদের বাড়িতে যেটাকে দেখেছিলাম!'

'নিশ্চয় ওই নোংরা রাসলার,' অনুমান করল মুসা। 'মেলা লোক এসেছে তো আজ রাতে!' গাড়িগুলোর দিকে চেয়ে আছে সে।

'এগারোটা,' গুণে বলল বোরিস।

জেরি গ্যানারিল আর মিস মারভেলকে নিয়ে বিরাট লোহার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ভ্যারাড। গেটের মাথায় লোহার চোখা শিক বসানো। দুই মহিলাকে কিছু বলে গেটের পাশের দেয়ালের কাছে সরে গেল ভ্যারাড। একটা খোপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কি যেন বের করে আনল।

'টেলিফোন?' আপন মনেই বলল রবিন।

টেলিফোনই। রিসিভার কানে ঠেকাল ভ্যারাড, বোধহয় কিছু বলল, তারপর আবার রেখে দিল আগের জায়গায়। খানিক পরেই ঝনঝন করে খুলে গেল গেট। মহিলাদেরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল ভ্যারাড বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা।

নীরবে অপেক্ষা করছে গোয়েন্দারা। আর কোন গাড়ি এল না। মিনিট পনেরো পর কেবিনের দরজা খুলল কিশোর। অতিথিরা সব এসে গেছে আর কেউ আসবে না। কিসের বৈঠক, দেখা দরকার।

নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। কিশোরকে অনুসরণ করে এগোল অন্য দুজন।

কারুকাজ করা পাল্লার একটা সর্পিল তামার পাতে হাত বুলিয়ে বলল রবিন, 'ইস, রাশেদচাচা এ-জিনিস পেলে পয়সার দিকে চাইত না।'

চকচকে পালিশ করা পিতলের হাতল ধরে জোরে টান দিল কিশোর, নড়ল না পাল্লা। 'তালা লাগানো। এটাই আশা করেছিলাম।'

দেয়ালের খোপটা দেখছে মুসা। 'করে দেখব নাকি? ডায়াল নেই। বাড়ির ভেতরে সরাসরি কানেকশন।'

পায়ে পায়ে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বোরিস। 'দেখো না করে।'

হুকে ঝোলানো রিসিভারটা বের করে আনল মুসা। কানে ঠেকাতেই ক্লিক একটা শব্দ শুনল, তারপরই ভেসে এল ভারি কণ্ঠ, 'অন্ধকার রাত।'

'অ্যাঁ!' থতমত খেয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দা। 'রাত হয়নি এখনও, শিগগিরই হবে! ইয়ে, স্যার, একটা বিস্কুট কোম্পানি থেকে এসেছি…'

আবার ক্লিক শব্দ করে নীরব হয়ে গেল ফোন, কানেকশন কেটে দিয়েছে।

'বিস্কুট পছন্দ না ওদের,' হাসল কিশোর, মুসার মুখ দেখেই বুঝেছে কি ঘটেছে।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' রিসিভার আগের জায়গায় রেখে দিল মুসা। 'তুলেই কি বলেছে জানো? অন্ধকার রাত!'

'কোন ধরনের কোড ওয়ার্ড। সদস্যরা জানে জবাবটা কি হবে।'

পাল্লার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রবিন। 'একটা আলোও নেই, এ কি-রকম বাড়ি!'

'এগারোটা গাড়ি,' বিড়বিড় করল কিশোর! 'মিস মারভেলের গাড়িতে এসেছে দু'জন, তারমানে অন্তত বারো জন অতিথি এসেছে আজ রাতে।'

'করছে কি ব্যাটারা?' বোরিসের কণ্ঠে বিস্ময়। 'কিছু আলো তো অন্তত থাকবে!'

'মোটা পর্দা লাগিয়েছে হয়তো,' কিশোর বলল।

'তাছাড়া মোম জ্বালায় ওরা,' রবিন যোগ করল। 'ওদের কাছে মোম খুব প্রিয়। এত কম আলো পর্দা ভেদ করে আসতে পারছে না।'

আবছা অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে আগের রাতের কথা ভাবছে তিন গোয়েন্দা, পারকার হাউসের ডাইনিং রুমের দৃশ্য ভেসে উঠেছে মনের পর্দায় ঃ 'কাচের বাটিতে তরল পদার্থ, মেহমানদের হাতে হাতে ঘুরছে, মোমের আলোয় ঘরের দেয়ালে ছায়ার নাচন…তারপর, তারপর সেই অপার্থিব রক্তহিম করা বেসুরো গান…

'আজ রাতেও শোনা যাবে না তো!' হঠাৎ নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মুসা।

'কি শোনা যাবে?' বুঝতে পারছে না বোরিস।

'জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ভ্যারাড বলেছে মহাসর্পের কণ্ঠস্বর। কিন্তু এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুই জানতে পারব না।'

'আরও গেট থাকতে পারে,' সম্ভাবনার কথা বলল রবিন।

'তা পারে,' সায় দিল কিশোর। 'হয়তো ওটাতে তালাও নেই। অনেকেই সামনের গেটে তালা লাগায়, পেছনের গেট একেবারে খোলা থাকে। কতরকম মানুষ যে আছে! খামখেয়ালীপনা করে পুলিশের কাজ বাড়ায়।'

'চলো, দেখি,' মুসা বলল।

'বোরিস, গাড়িতে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসে থাকুন। আর হ্যাঁ, গাড়িটা গেটের আরও কাছে নিয়ে এলেই বোধহয় ভাল হয়। কিসের বৈঠক বসিয়েছে

ব্যাটারা, কে জানে! ছুটে পালানোর দরকার পড়তে পারে আমাদের।'

দ্বিধা করল বোরিস। কি ভাবল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে।' ট্রাকের দিকে রওনা হলো সে।

ইঞ্জিন স্টার্ট হলো, জ্বলে উঠল হেডলাইট। ট্রাকটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এল বোরিস, গেটের সামনে দিয়ে গিয়ে ফুট পঞ্চাশেক দূরে পথের পাশে দাঁড় করাল। নিভে গেল আলো। উজ্জ্বল আলো হঠাৎ নিভে যাওয়ায় অন্ধকার অনেক বেশি মনে হচ্ছে এখন।

'টর্চ আনা উচিত ছিল,' আফসোস করল মুসা।

'আনিনি যখন, বলে আর কি হবে?' বলল কিশোর। 'তবে আনলেও জ্বালাতাম না, ওদের চোখে পড়ত। চলো।'

সাবধানে দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল তিন গোয়েন্দা, মাঝে মাঝেই থেমে কান পাতছে। কোন রকম আওয়াজ আসছে না দেয়ালের ওপার থেকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, লাফিয়ে সরে গেল একপাশে, পায়ের ওপর এসে পড়েছে একটা ছোট্ট জানোয়ার, ভয় পেয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতরে ছুটে পালাল ওটা।

'শেয়াল,' বলে উঠল মুসা।

'দেখেছ?' জানতে চাইল রবিন।

'না। কিন্তু শেয়ালই তো হওয়া উচিত!'

'চুপ!' চাপা গলায় হুঁশিয়ার করল কিশোর।

দেয়ালের ধার ধরে বাড়ির পুরো সীমানায় চক্কর দিয়ে এল ওরা, কিন্তু আর কোন গেট পাওয়া গেল না। যেখান থেকে শুরু করেছিল, আবার সেখানে এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতর ঢোকার কোন পথ খুঁজে পেল না গোয়েন্দারা, শুধু জানল, বিরাট সীমানা, আশপাশ নির্জন, কাছে পিঠে আর কোন বাড়ি-ঘর নেই। অন্ধকার ঘন হয়েছে আরও, আলোর কোন চিহ্ন নেই এখন ও বাড়িটাতে।

'দেয়াল ডিঙাতে হবে, মুসা,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর। 'আমার আর রবিনের কাঁধে চড়ে উঠে যাও।'

'ইয়াল্লা! বলে কি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'মাথা খারাপ!'

'আর কোন উপায় নেই,' মুসার কথা কানেই নিল না কিশোর। 'তুমি না উঠলে আমি চেষ্টা করব। কিন্তু, কাজটা তোমারই করা উচিত। তুমি উঠলে আমাকে আর রবিনকে টেনে তুলতে পারবে। আমি বা রবিন, কেউই তোমাকে তুলতে পারব না। বাড়িটাতে ঢোকার এই একটাই উপায়।'

অনেকবারের মত আরেকবার নিজেকে মনে মনে গাল দিল মুসা ঃ কেন মরতে তিন গোয়েন্দায় যোগ দিয়েছিল! 'কিন্তু সত্যিই কি ঢুকতে চাই আমরা?' বলেই বুঝল, অহেতুক মুখ নষ্ট। রবিনকে টেনে নিয়ে দেয়ালের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিশোর, দু'জনের কাঁধে দু'জনে হাত রেখে চমৎকার একটা মাচা তৈরি করে ফেলেছে।

কি আর করবে? বিড়বিড় করে নিজের ভাগ্যকেই বোধহয় একটা গাল দিয়ে এসে মাচায় উঠল মুসা। দেয়ালের মাথা দু'হাতে ধরে মুখ বাড়িয়ে দিল সামনে। অন্ধকার বাড়িটার দিকে চোখ রেখে দু'হাতে ভর দিয়ে এক ঝাঁকুনিতে উঠে বসল

দেয়ালের ওপরে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল ঘটনা। কানফাটা তীক্ষ্ণ আওয়াজে বেজে উঠল অ্যালার্মবেল।

'জলদি নামো!' মুসার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট, এক সঙ্গে আটটা, দেয়ালের একেক কোণে দুটো করে। দেয়ালের মাথা আঁকড়ে ধরে বসে আছে মুসা, তীব্র নীলচে শাদা আলোয় ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ, পাতা মেলে রাখতে পারছে না।

'লাফ মারো!' আবার চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

তাড়াহুড়ো করে ঘুরে বসতে গিয়ে হাত পিছলাল মুসার, সামলানোর চেষ্টা করল, পারল না, পড়ে গেল ধুপ্‌প্‌ করে। এপাশে নয়, দেয়ালের ওপাশে!

সাত

নরম ঘাসের ওপর চিত হয়ে পড়েছে মুসা, তাই ব্যথা পেল না। পড়েই এক গড়ান দিয়ে হাঁটুতে ভর করে উঠে বসল। থেমে গেছে বেল। চোখ পিটপিট করল সে, আশেপাশে কি আছে দেখার চেষ্টা করল।

গাঁট্টাগোঁট্টা একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

'চোর কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল গার্ড, কণ্ঠস্বরে কিছু একটা রয়েছে, শিরশির করে উঠল মুসার মেরুদণ্ডের ভেতর। 'মতলব কি?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু শব্দ বেরোল না, গলার ভেতরটা খসখসে শুকনো—সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে যেন কেউ। উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু এক হাঁটুতে ভর রেখে থেমে গেল মাঝপথেই, শাসানোর ভঙ্গিতে এক পা সামনে বেড়েছে লোকটা।

'মুসাআ?' ওপার থেকে শোনা গেল কিশোরের ডাক। 'পেয়েছ ওকে?' ভুরু কুঁচকে তাকাল গার্ড। 'কে?' দ্রুত গেটের দিকে এগোল।

গেটের সামনে দেখা গেল কিশোরকে। 'এই যে, মিস্টার, ওকে দেখেছেন?'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন মুসার। অভিনয় শুরু করেছে শক্তিমান অভিনেতা।

'কাকে?' কিছুই বুঝতে পারছে না গার্ড।

'হুগো।'

মুসার দিকে তাকাল গার্ড।

'আরে না না, ও না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'বেড়াল। একটা হুলো, সিয়ামিজ ক্যাট। আমার মা এখনও জানে না ওটা হারিয়েছে। আপনাদের দেয়ালের ওপাশে যেতে দেখেছি।'

'ভাল গপ্পো!' লোকটা ভয়ানক গম্ভীর।

'সত্যি বলছি,' গার্ডকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে কিশোর। 'হয়তো, কোন গাছে উঠে বসে আছে।'

এমন ভাবে বলছে কিশোর, মুসারই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। ঘাড়ে নেমে আসা ধূসর চুলের বোঝায় আঙুল চালাল লোকটা, মুসার দিকে ফিরল। 'ওঠো!'

হাতের নির্দেশে গেট দেখাল। 'বেরোও!'

উঠে দাঁড়াল মুসা।

'প্লীজ!' অনুনয় ঝরল কিশোরের কণ্ঠে। 'একটু সাহায্য করুন। বেড়ালটাকে একবার খুঁজেই বেরিয়ে আসবে আমার বন্ধু।'

'বেড়াল নেই!' মুসার কনুই ধরে টেনে গেটের কাছে নিয়ে এল গার্ড।

'মা আমাকে মেরে ফেলবে।' কেঁদেই ফেলবে যেন কিশোর।

'আমাকে মারারও লোক আছে,' বলল গার্ড। ধমকে উঠল, 'জলদি যাও এখান থেকে! নইলে পুলিশ ডাকব!'

নিরাশ ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে এল কিশোর। কড়া নজর লোকটার দিকে।

গেটের পাশে দেয়ালের ভেতরের দিকে আইভি লতার ঝাড়, তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল গার্ড। কিছু একটা করল, মৃদু ক্লিক শব্দ হলো। খুলে যেতে শুরু করল পাল্লা।

এক ধাক্কায় মুসাকে বাইরে বের করে দিল গার্ড। 'আর যেন ভেতরে না দেখি! তাহলে কপালে ভীষণ দুঃখ আছে বলে দিলাম।' আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গেট।

'যদি বেড়ালটা দেখেন...,' শুরু করেই থেমে যেতে হলো কিশোরকে।

'ভাগো!' চেঁচিয়ে উঠল গার্ড।

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল মুসা আর কিশোর। চলে এল রবিনের কাছে, তাকে দেখেনি গার্ড। ফ্লাডলাইট নিবে গেল, কালিগোলা অন্ধকার যেন গ্রাস করে নিল তিন কিশোরকে।

'উফ্ফ্!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'আল্লাহ বাঁচিয়েছে।'

ফিক করে হাসল রবিন। 'কান মলেনি তো!'

'এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!' হাত তুলল মুসা।

'আহ্ থাম তো!' চাপা গলায় ধমক দিল কিশোর। কান পেতে শুনছে।

খোয়া বিচানো পথে গার্ডের বুটের শব্দ হচ্ছে। কয়েক কদম চলেই থেমে গেল।

'আমরা গেছি কিনা, বোঝার চেষ্টা করছে,' কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামাল কিশোর। 'চলো হাঁটি। এমনিতেই সন্দেহ করেছে গার্ড। গাড়িতে করে এসেছি দেখলে শিওর হয়ে যাবে, বেড়াল খুঁজতে আসিনি আমরা।'

'চলো তাহলে,' তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচে মুসা, গার্ডের হাতে পড়তে চায় না আর।

জোরে কথা বলতে বলতে চলল ওরা পথ ধরে, খালি বেড়ালটার আলোচনা করছে। সিয়ামিজ ক্যাটের দাম কত, ওটা না পেলে মা কি পরিমাণ বকবে কিংবা পেটাবে, আরেকটা বেড়াল জোগাড় করা যায় কিনা, এসব। হাফট্রাকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচু গলায় বলল কিশোর, 'বোরিস, কয়েক মিনিট পর আমাদের পেছনে আসবেন।'

হাঁটতে হাঁটতে একটা মোড় পেরিয়ে এল ছেলেরা, পেছনে চেয়ে দেখল, গেট দেখা যায় না, তারমানে গার্ডের চোখের আড়ালে চলে এসেছে। থামল ওরা।

'অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার!' কিশোর বলল। 'পার্টি চলছে, কিন্তু একটা আলোও জ্বালেনি। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছে, তার ওপর গার্ড। এত কড়া পাহারা

কেন? চুরি করে ঢোকার উপায় নেই, অ্যালার্ম বেল বেজে ওঠে, সার্চলাইট জ্বলে ওঠে! সাঙ্কেতিক কথার জবাব যে জানে না, তাকে ঢুকতে দেয়া হয় না। কি কাণ্ড চলছে ভেতরে?'

পেছন থেকে ট্রাকটা এসে দাঁড়াল পাশে, উঠে বসল ছেলেরা। রবিন দরজা বন্ধ করে দিল।

'পাক্কা হারামি লোক!' পেছন দিকে হাত নাড়ল বোরিস।

'সব কথা শুনেছেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'শুনেছি। একবার ভাবলাম, যাই! আরেকটু বাড়াবাড়ি করলেই যেতাম। মুসা, ব্যথা পেয়েছ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীটে হেলান দিল মুসা আমান। 'এখন আর পাচ্ছি না! তবে পড়ার পরে মনে হয়েছিল, মেরুদণ্ড দু'টুকরো!'

একটা দুই রাস্তার মোড়ে এসে গতি কমাল বোরিস। বাঁদিকে টরেনটি ক্যানিয়ন রোড ধরে তীব্র বেগে ছুটে আসছে আরেকটা ট্রাক, ওটাকে পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে থেমেই দাঁড়াতে হলো। পেছন থেকে এসে ঘ্যাচ করে হাফট্রাকের পাশে থামল একটা কমলা রঙের স্পোর্টস কার।

'আরে!' চাপা গলায় বলল রবিন। 'মিস গ্যানারিল, হেয়ারড্রেসার!'

'বাড়ি ফিরছে!' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কিশোর। 'জলদি জিনার কাছে ফোন করতে হবে! নিশ্চয় খোঁজাখুঁজি করছে। ভ্যারাড কিংবা মিস মারভেল দেখে ফেললে কি ভাববে কে জানে!'

'সামনে আধ মাইল দূরে একটা পেট্রল স্টেশন আছে,' বোরিস জানাল।

'তাড়াতাড়ি চলুন,' বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে কিশোর, মিস মারভেলের গাড়ি আসছে কিনা দেখছে।

পেট্রল স্টেশন থেকে পারকার হাউসে ফোন করল কিশোর। দ্বিতীয় বার রিঙ হওয়ার আগেই ওপাশে রিসিভার তুলল জিনা।

'বৈঠক শেষ,' কোন রকম ভূমিকা করল না কিশোর। 'আমরা কিছুই করতে পারিনি। তোমার কদ্দূর? পেয়েছ?'

'না।'

'সব জায়গায় দেখেছ?'

'কিচ্ছু বাদ দেইনি। চুম্বকও ব্যবহার করেছি। খালি ধুলো, রুজ যাওয়ার পর আর ঝাড়া হয়নি।'

'তারমানে, যন্ত্রটা সঙ্গে নিয়ে গেছে ভ্যারাড। কিংবা তার সহকারীর কাছে রয়েছে ওটা।'

'সহকারী? তাই হবে। নতুন একজন লোক আসছে বাড়িতে।'

'কে?'

'রুজের জায়গায়। খানিক আগে এসে বলল, কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'তারপর?'

'জানালাম, মা বাড়িতে নেই। যা বলার আমাকে বলতে পারে...'

'অপরিচিত একজনের সঙ্গে এভাবে কথা বলা উচিত হয়নি তোমার, জিনা!'

'শুধু তাই না,' জিনার হাসি শোনা গেল। 'চাকরিটাও দিয়ে ফেলেছি তাকে।'

চুপ করে রইল কিশোর। বুঝতে পারছে, আরও কথা বলার আছে জিনার।

'এভাবে হুট করে কেন রাজি হয়ে গেছি, জিজ্ঞেস করলে না?'

'কেন?'

'কারণ, চোখা গোঁফ আছে লোকটার। গতরাতে গ্যারেজে লুকেয়েছিল যে লোকটা, তারও গোঁফ ছিল। একই লোক কিনা, জানি না, কিন্তু যদি হয়, কোন বিশেষ কারণ আছে এভাবে যেচে এসে চাকরি চাওয়ার। হয়তো ও-ই ভ্যারাড ইবলিশের সহকারী তাহলে কি বলো, ওকে আসতে বলে ভালই করেছি, না? চোখে চোখে রাখা যাবে। কাল সকাল আটটায় কাজে যোগ দেবে সে। এসেই ভ্যারাডের কফিতে মাকড়সার ডিম মেশাতে শুরু করবে কিনা কে জানে।'

'তোমার খালা জিজ্ঞেস করলে কি বলবে?'

'গল্প একখানা বানিয়ে রেখেছি মনে মনে। হ্যাঁ, কাল সকালে দেখা করো আমাদের বাড়িতে।'

লাইন কেটে দিল জিনা। ট্রাকে ফিরে এল কিশোর।

'কি ব্যাপার?' কিশোরের চিন্তিত ভঙ্গি লক্ষ্য করল মুসা।

'ঠিক বুঝতে পারছি না! হয় মেয়েটা অতি চালাক, নইলে একেবারে বোকা, কিংবা দুটোই!'

'কি বলছ?' একই সঙ্গে চালাক আর বোকা হয় কি করে একজন!'

'তা-ও জানি না! তবে জিনার ক্ষেত্রে হয়তো তা-ই ঘটেছে!'

আট

পরদিন সকালে পারকার হাউসে এল তিন গোয়েন্দা। বারান্দায় সিঁড়িতে বসে আছে জিনা, হাসিতে উজ্জ্বল মুখ চোখ।

'শুনছ?' বলল জিনা।

শুনছে তিন গোয়েন্দা। বাড়ির ভেতর থেকে আসছে ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের গুঞ্জন।

'কিছুই বলে দিতে হয়নি ওকে,' জিনা বলল, 'স্যুটকেসটা রুজের ঘরে রেখে এসেই কাজে লেগে গেছে। ঝাড়ুটা নিয়ে আগে ঝুল-ময়লা পরিষ্কার করেছে। খালার মাকড়সার জালের আশা একেবারেই খতম। হি হি!'

'তারমানে রাতেও এখানে থাকছে সে?' রবিন জানতে চাইল।

'সেটাই ভাল হবে, না?' পাল্টা প্রশ্ন করল জিনা। 'দিনে রাতে সব সময় নজর রাখতে পারব ওর ওপর।'

'লোক ভাল হলে হয়,' কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ। 'তোমার খালা কি বলেন? তাঁকে বলেছ?'

'বলেছি। খুব ভাল বলে সোজা গিয়ে বিছানায় উঠেছে।'

'এর আগে কোথায় কাজ করত লোকটা?'

'বলেনি, আমিও চাপাচাপি করিনি।'

'খুব ভাল করেছ! নইলে হয়তো...,' বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা।
'ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও?' জিনা বলল। 'দেখলে চিনতে পারবে?'
'সন্দেহ আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'রবিন চিনলে চিনতে পারে।'
মাথা ঝোঁকাল রবিন।
'চিনতে পারলেও এমন ভাব দেখাবে, যেন নুতন দেখছ,' রবিনকে সাবধান করে দিল কিশোর।
তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল জিনা।
বসার ঘরে কাজে ব্যস্ত লোকটা। সবুজ-সোনালি কার্পেট থেকে ধুলো ঝাড়ছে। সারা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেদের দিকে। এগিয়ে গিয়ে ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের সুইচ অফ করে দিল জিনা।
'কিছু লাগবে, মিস পারকার?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।
'না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'আমিই নিতে পারব। লেমোনেড।'
'নিন,' যন্ত্রের সুইচ অন করে দিয়ে আবার কাজে লেগে গেল লোকটা।
বন্ধুদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে এল জিনা। ফ্রিজ খুলে চারটে লেমোনেডের বোতল বের করল। চাপা গলায় বলল, 'ওই লোকই?'
'শিইর না,' অনিশ্চিত রবিন। 'আকার-আয়তন এক রকম, গোঁফেরও মিল রয়েছে, তবে ও কিনা কে জানে! মাত্র এক পলক দেখেছিলাম তো।
'দেখে তো খারাপ লোক মনে হলো না,' মন্তব্য করল মুসা। 'ওই লোক কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালাবে...নাহ, বিশ্বাস হচ্ছে না।'
'বর্ণচোরা!' জোর গলায় বলল জিনা। 'আস্ত এক বর্ণচোরা। লম্বাও না খাটোও না, পাতলাও না মোটাও না। ধূসর চুল, আর দশজনের মতই স্বাভাবিক। রাস্তায় বেরোলে ওরকম লোক অনেক দেখা যায়। মস্ত গোঁফ বাদ দিলে লোকের ভিড়ে অতি সহজেই মিশে যেতে পারে, আলাদা করে চেনা মুশকিল,' একটা বটল ওপেনার নিয়ে বোতলের ছিপি খুলতে লাগল সে। 'তা গতরাতে কি কি ঘটেছে বললে না তো।'
সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর।
'এখনও তোমাদের চেয়ে এগিয়ে আছি আমি,' হাসল জিনা। 'তোমরা শুধু দেয়াল থেকে পড়ার কেরামতি দেখিয়েছ, আর আমি? হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট রহস্যময় একটা লোককে আবিষ্কার করে তাকে কাজে লাগিয়েছি।'
'রহস্যময় আরেকটা লোককে তাড়ানোর জন্যেই আমাদের সাহায্য চেয়েছিলে, মনে আছে?' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের আওয়াজেও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে না কেন নিশাচরদের?'
'ড্যারাড বাইরে,' লেমোনেডের বোতলে চুমুক দিল জিনা।
'দিনের বেলা কক্ষণও গুহা থেকে বেরোয় না বলেই তো জানতাম!'
'আজ সকালে বেরিয়েছে। কোন গোরস্থানে মড়ার হাড্ডি চুষতে গেছে কে জানে! খালার গাড়িটা নিয়ে গেছে।'
দরজায় দেখা দিল মিস মারভেল। 'জিনা, লোকটা কে-রে? সারা বাড়ি মাথায় তুলেছে!' খালার পরনে ফিকে নীল হাউসকোর্ট, বেগুনি-নীল বেল্ট এঁটেছে

কোমরে। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলে নতুন করে রঙ লাগিয়েছে।

'নতুন কাজের লোক, খালা,' জিনা বলল। 'তোমাকে না বললাম গতরাতেই?'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ! খুব ভাল। কি নাম যেন বলেছিলে?'

'নাম বলিনি। ওর নাম ফোর্ড।'

'ফোর্ড! ফোর্ড! ভেরি গুড, গাড়ির নামে নাম। মনে রাখতে পারব।' ছেলেদের দিকে চেয়ে আনমনে হাসল খালা। ছেলেরা 'গুড-মর্নিং' জানাল, মহিলা খেয়াল করল কিনা বোঝা গেল না। 'রাঁধতে পারে তো?' জিনাকে জিজ্ঞেস করল।

'বলল তো পারে।'

'তাহলে যাই, ডিনারের জন্যে কি কি রাঁধতে হবে, বলি গিয়ে।' চলে গেল মিস মারভেল।

সিংকে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জিনা। 'বহুদিন পরে খাওয়া জুটবে মনে হচ্ছে।' জানালার দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল। 'জনাব এসে গেছেন! দেখ দেখ, গর্ত থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছে যেন ছুঁচোটা!'

হেসে ফেলল ছেলেরা। ছোট্ট করভেট থেকে বেরোতে গিয়ে প্রাণান্তকর অবস্থা ভ্যারাডের। দুমড়ে মুচড়ে বাঁকা হয়ে স্টিয়ারিঙের তলা থেকে বেরোনোর চেষ্টায় অস্থির, আটকে গেছে লম্বা লম্বা পা। কাত হয়ে অনেক কষ্টে শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে বেরিয়ে এল অবশেষে, প্যান্টের ভেতর থেকে খুলে এসেছে শার্টের নিচের দিক টানের চোটে, প্রায় বুকের কাছাকাছি উঠে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে রোমশ পেট।

'ব্যাটা কোথায় গিয়েছিল জানতে পারলে হত,' জিনা বলল।

পেছনের দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল ভ্যারাড। ছেলেমেয়েদেরকে দেখে থমকে গেল, দৃষ্টি এক মুহূর্ত স্থির রইল জিনার ওপর, তারপর তাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে গেল। নীরবে।

পথরোধ করে দাঁড়াল জিনা। 'মিস্টার ভ্যারাড, আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করবেন না?'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিচয় করার জন্যে দাঁড়াল ভ্যারাড। খুশি খুশি ভাব করে হাত বাড়িয়ে দিল রবিন, নিষ্প্রাণ একটা রবারের হাত ধরে যেন ঝাঁকি দিল বার কয়েক।

নীরবে সব 'অত্যাচার' সহ্য করল ভ্যারাড। পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল, জিনা যেন একটা খুঁটি, এমনভাবে তাকে পাশ কাটিয়ে এগোল। বেড়িয়ে গিয়েই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজার পাল্লা।

'কেমন বুঝলে?' হাসিতে উদ্ভাসিত জিনার মুখ। 'সুযোগ পেলেই খোঁচাই লোকটাকে। ও ভাব করে যেন আমি জ্যান্ত কিছু নই। তাই আমিও ছাড়ি না। কবে যে যাবে ইতরটা!'

'মিস্টার ভ্যারাড?' মিস মারভেলের উঁচু কণ্ঠ শোনা গেল রান্নাঘর থেকেও। 'কাজ হয়েছে?'

দুই লাফে দরজার কাছে চলে গেল জিনা, ফাঁকে কান পেতে দাঁড়াল।

'কোন ভাবনা নেই,' হলঘর থেকে জবাব এল ভ্যারাডের। 'আপনার ইচ্ছে

পেশ করা হয়েছে। পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মহাসর্পকে। বীলিয়াল দায়িত্ব নিয়েছেন। চুপচাপ বসে বসে শুধু দেখুন এখন কি ঘটে।'

'কিন্তু একুশের আর দেরি নেই,' নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না মিস মারভেল, 'এর মধ্যে হবে তো? তেমন কিছুই না, তবু, জিনিসটা আমার চাই। আগেই যদি অ্যানি পল...'

'ঈমান নষ্ট করছেন!' গম্ভীর কণ্ঠ ভ্যারাডের।

'না না!' আঁতকে উঠল যেন খালা। 'আমি সে-কথা বলিনি! ঈমান ঠিকই আছে...'

'তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুন গে। আমি যাই, রেস্ট নেয়া দরকার। বড় কঠিন কাজ করতে হয়, মাঝে মাঝে একেবারে কাহিল হয়ে যাই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যান!'

সিঁড়িতে ভ্যারাডের জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল।

'ব্যস, গিয়ে ঢুকল আবার গর্তে,' সরে আসতে আসতে বলল জিনা। 'ছুঁচোও লজ্জা পাবে!'

'মহাসর্পকে পাঠানো হয়েছে!' নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন কিশোর, 'মানেটা কি?'

'ডাকে সাপ-টাপ পাঠায়নি তো খালার কাছে?' মুসা বলল।

মাথা নাড়ল জিনা। 'না। সাপ দেখলেই মূর্ছা যায় খালা। ভ্যারাড আর তার ভক্তরা ওভাবেই কথা বলে। ওদের কথার মানে ওরাই শুধু বোঝে! মনে আছে, সেদিন রাতে বলেছিল, 'যোজন যোজন দূরে রয়েছেন মহাসর্প, তিনি কথা বলবেন কিনা, তাই বা কে জানে!'

'কথা অবশ্য বলেছিলেন মহাসর্প!' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'এমন বেসুরো সুরে, শুনলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চায়! কি যে করছে ওরা, ওরাই জানে! বৈঠক বসাচ্ছে, একবার এখানে, একবার ওখানে!...তোমাদের নতুন কাজের লোকটাও এসবে জড়িত কিনা কে বলবে! যাই হোক, এখন আর এখানে কিছু করার নেই আমাদের। আবার কিছু ঘটলে খবর দিও। যাই, চাচী বলেছিল কি নাকি জরুরী কাজ আছে।'

'আমারও লাইব্রেরিতে যেতে হবে,' রবিন বলল। 'ডিউটির সময় হয়েছে।'

'আমিই বা আর থাকি কেন?' বলল মুসা। 'ক'দিন ধরেই মা তাগাদা দিচ্ছে লনটা পরিষ্কার করার জন্যে।'

'দারুণ ছেলে তো হে তোমরা!' প্রশংসায় উজ্জ্বল হলো জিনার মুখ। 'গোয়েন্দাগিরি, লেখাপড়া, তার ওপর আবার বাড়তি কাজ! নাহ্, তোমাদের ওপর ভক্তি আমার বাড়ছে! তা যাও, নতুন কিছু ঘটলে ফোন করব।' মুসার দিকে ফিরে বলল, 'তোমার বোতল তো খালি। দেব আরেকটা?'

'তা দিতে পারো,' হাসল সে।

'বাড়তি আরেকটা অবশ্য ওর প্রাপ্য,' টিপ্পনি কাটল রবিন। 'বেচারা গতরাতে যেভাবে দেয়াল থেকে পড়ল, যদি দেখতে! হাহ্ হা!'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা, আরেকটা বোতল তার হাতে

ধরিয়ে দিচ্ছে জিনা।

লেমোনেড শেষ করে জিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে-যার পথে চলে গেল তিন গোয়েন্দা।

ইয়ার্ডে ফিরে দেখল কিশোর, সাংঘাতিক ব্যস্ত বোরিস আর রোভার, দুটো ট্রাকে উঁচু হয়ে আছে মালপত্র, ওগুলো নামাচ্ছে।

'এত দেরি করলি?' মেরিচাচী বলে উঠলেন কিশোরকে দেখে।

'হ্যাঁ, চাচী, একটু দেরিই হয়ে গেল।'

'তোর চাচার কাণ্ড দেখেছিস? দেখ, কি-সব নিয়ে এসেছে!'

দেখল কিশোর। ঢালাই লোহার তৈরি পুরানো আমলের এক গাদা চুলো।

'লাকড়ির চুলো!' চাচীর গলায় প্রচণ্ড ক্ষোভ। 'বল, এসব জিনিস আর আজকাল রাখে কেউ? ব্যবহার করে? শহরের পূবে কোন এক পুরানো গুদামে পড়ে ছিল অনেক বছর। নতুন শহর হচ্ছে ওদিকে, গুদাম ভেঙে ফেলা হচ্ছে, তাই বাতিল মাল সব নীলামে বেচে দিচ্ছে। কি জানি, মরতে কেন ওদিকে গিয়েছিল তোর চাচা! চোখে পড়েছে, আর কি রেখে আসেন! আরও পেয়েছেন কমদামে!' কিশোরের দিকে তাকালেন। 'তোর কি মনে হয়? বিক্রি হবে এগুলো?'

'হবে, হবে,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল কিশোর। 'আজকাল অনেকেরই তো পুরানো আমলের জিনিস ব্যবহারের শখ চাপে। দেখ, একটাও থাকবে না, সব বিক্রি হয়ে যাবে।'

'কি জানি, বাপু! আমার তো মনে হয়, শ'খানেক বছরেও ওগুলো পার করা যাবে না,' বোরিস আর রোভারের দিকে ফিরলেন। 'ওই ওদিকে জঞ্জালের ধারে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখো। আমার চোখে যেন না পড়ে!'

রাগে গটমট করে অফিসে চলে গেলেন মেরিচাচী।

চুলা নামাতে বোরিস আর রোভারকে সাহায্য করল কিশোর। ইয়ার্ডের এক ধারে নিয়ে গিয়ে স্তূপ করে ফেলতে লাগল। ভীষণ ভারি জিনিস, তার ওপর লাকড়ি ঢোকানোর ফোকরের দরজা আলগা, বয়ে নেয়ার সময় যখন-তখন খুলে পড়ে, সে আরেক ঝামেলা। ফলে কাজে দেরি হতে লাগল।

লাঞ্চের সময় হয়ে গেল, একটা ট্রাক খালি হয়েছে, আরেকটা তখনও পুরো বোঝাই।

খেয়েদেয়ে এসে আবার কাজে লাগল তিনজনে।

তিনটের দিকে বোরিস আর রোভারের ওপর বাকি কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে গোসল করতে চলল কিশোর। হলঘরে ঢুকে দেখল, চাচা বসে বসে টেলিভিশন দেখছেন।

কিশোরকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন রাশেদ পাশা, 'ভয়ানক!'

'কি ভয়ানক?' দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর।

'আরে, লোকের কাণ্ড জ্ঞান নেই! এত অসাবধানে গাড়ি চালায়! হাইওয়েতে উঠলে যেন আর দুনিয়ার খেয়াল থাকে না! দেখ!' টেলিভিশনের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

কিশোর তাকাল। পরিচিত দৃশ্য। প্রায়ই দেখে টেলিভিশনে, খবরের কাগজে

হলিউড ফ্রীওয়ে-তে একটা পুলের রেলিঙে বাড়ি খেয়ে বেঁকেচুরে পড়ে আছে একটা স্যালুন গাড়ি। পথ প্রায় বন্ধ। ট্রাফিক জ্যাম ছাড়াতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ।

স্পীকারে ভেসে আসছে ঘোষকের কণ্ঠঃ মিস অ্যানি পল নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁকে অ্যানজেল অভ মারসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তারা বলছেন, তাঁর অবস্থা তেমন আশঙ্কাজনক নয়...

'মিস অ্যানি পল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'চিনিস নাকি?' ভুরু কোঁচকাল চাচা।

'নামটা পরিচিত,' বলেই আর দাঁড়াল না কিশোর, টেলিফোনের দিকে ছুটল।

নয়

'কাজ আছে, ফিরতে দেরি হবে,' সে-সন্ধ্যায় চাচীকে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। ওয়ার্কশপে পৌঁছে দেখল সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে রবিন আর মুসা।

'সোয়ানসন কোভ-এ যাব,' কিশোর বলল। 'ওখানে থাকবে জিনা।'

'সবুজ ফটক এক দিয়ে বেরোব?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'ও-পথেই সুবিধে। চাচীর ঘর থেকে দেখা যাবে না।'

বেড়ার কাছে গিয়ে ছোট্ট একটা ফোকরে দুই আঙুল ঢুকিয়ে গোপন সুইচে চাপ দিল মুসা। নিঃশব্দে খুলে গেল দুটো পাল্লা। মাথা বের করে উঁকি দিল সে, রাস্তার এ-মাথা ও-মাথা দেখল, নির্জন। জানাল বন্ধুদেরকে। ছাপার মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা সাইকেলটা নিয়ে আগে বেরোল কিশোর, তার পেছনে অন্য দুজন।

পাল্লা দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেল। চিন্তিত দৃষ্টিতে বেড়ার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। বেশ বড়সড় একটা ছবিতে সাগর আঁকা রয়েছে, ঝড় উঠেছে, ডুবতে বসেছে একটা জাহাজ, মুখ তুলে তা দেখছে একটা বড় মাছ। ওই মাছের চোখ টিপে ধরলেই খুলে যাবে আবার সবুজ পাল্লাদুটো। তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনোর অনেকগুলো গোপন পথের একটা এটা।

'লাল কুকুর চার গেল!' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল রবিন। 'বড় বেশি ছোঁক ছোঁক করে মেয়েটা! কি করে যে দেখে ফেলল! কবে আবার সবুজ ফটকটাও দেখে ফেলে, কে জানে!'

'দেখলে দেখবে,' কিশোর বলল। 'আরেকটা পথ বানিয়ে নেব। ওসব নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার কিছু নেই। চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' মুসা বলল, 'চল।'

সাইকেলে চাপল তিন গোয়েন্দা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে কোস্ট হাইওয়ে ধরে সোয়ানসন কোভ মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।

বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে আছে জিনা, কাছেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আপালুসাটা, লাগামের মাথা ঝুলছে সামনের হাঁটুর কাছে।

'বেশ ভালই ব্যথা পেয়েছে মিস অ্যানিপল,' পাথরের ওপর বসে পড়ল জিনা।

জিনার মুখোমুখি আরেকটা পাথরে বসল কিশোর। 'তোমার খালা কি বলেন? আমি ফোন করার পর কিছু ঘটেছে?'

'খালার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। কাঁদছে। খবরটা শোনার পর থেকেই খালি কাঁদছে।'

পাথরের গায়ে হেলান দিল রবিন। 'ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে!'

'এবং খুব তাড়াতাড়ি,' যোগ করল কিশোর। 'মাত্র আজ সকালে ভ্যারাড বলল, মহাসর্পকে পাঠানো হয়েছে, ব্যস, দুপুর পেরোতে না পেরোতেই কর্ম সারা! মিস মারভেলের ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেল। ক্যাসটিলোর বাড়িতে নীলামে আর যেতে পারছেন না মিস পল। ক্রিস্টাল বল গেল তাঁর হাতছাড়া হয়ে।'

'কিন্তু এ-রকম কিছু ঘটুক এটা চায়নি খালা,' একটু যেন লজ্জিতই মনে হলো জিনাকে। 'খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে ঃ হায় হায়, এ-কি করলাম! মহিলা মারা যেতে পারত! সব দোষ আমার, সব আমার দোষ! তাকে ঘর থেকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়েছে ভ্যারাডকে।'

'স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল মুসা।

তার কথায় কান দিল না জিনা। 'খালার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল ভ্যারাড। হলে থেকে ওদের কথাবার্তা শুনেছি। সব শুনিনি, তবে এটুকু বুঝেছি, কোন একটা ব্যাপারে খালাকে চাপাচাপি করছে ভ্যারাড। বলল, অপেক্ষা করতে রাজি আছে সে, তবে বেশি দিন নয়। খালাকে কান্নাকাটি করতে বারণ করে নিচে চলে গেল সে। খালার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই ধমকে উঠল খালা। বেরিয়ে এলাম, তবে রইলাম কাছাকাছিই, লুকিয়ে।'

'নিশ্চয় হলে?' মুসা বলল।

'হ্যাঁ। ফোন করল খালা, মিস্টার ফন হেনরিখকে চাইল।'

'বাড়তি রিসিভারটা তুলতে কত দেরি করেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অনেক,' জিনার কণ্ঠে বিরক্তি। 'নিচে নেমে রিসিভার তুলে শুনলাম, খালা বলছেঃ...একটা চিঠি সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে। জবাব এলঃ হ্যাঁ, দিন। তারপরই কেটে গেল লাইন।'

'তারপর?' প্রশ্ন করল রবিন।

'ওপরতলায় খালার পায়ের আওয়াজ শুনলাম। ফোর্ডকে ডাকল। একটা ছোট্ট বাদামী কাগজের মোড়ক হাতে নিয়ে নেমে এল ফোর্ড, খালার গাড়ি নিয়ে চলে গেল।'

'ভ্যারাডের আগ্রহ কেমন দেখলে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কামানের গোলার মত ছুটে গেল সে ওপরতলায়। খালা তৈরিই হয়ে ছিল। চেঁচাতে শুরু করল ভ্যারাড, পাল্টা জবাব পেল। খালা বলল, ফোর্ডকে বেভারলি হিল-এ পাঠিয়েছে একটা ফেসক্রীম কিনে আনতে।'

'বিশ্বাস করেছ?'

'না। ভ্যারাডও করেনি। এক কৌটা ক্রীম নিয়ে ফিরতে দেখল ফোর্ডকে, তাই আর কিছু বলারও থাকল না ওর। কিন্তু আমি জানি, মিথ্যে কথা। গোলাপের পাপড়ি, গ্লিসারিন আর আরও কি কি দিয়ে নিজের ক্রীম নিজেই বানিয়ে নেয় খালা, বাজারের জিনিস কক্ষণো কেনে না।'

'খালাকে জিজ্ঞেস করেছ কিছু? নাকি ফোর্ডকে?'

'কাউকেই করিনি। আমি জানতাম, কোথায় গেছে ফোর্ড। মিস্টার ফন হেনরিখ বেভারলি হিলের অনেক বড় একটা জুয়েলারি শপের মালিক। আমাদের বাড়ির সেফের কম্বিনেশনও আমার জানা। মা-র ঘরে গিয়ে সোজা সেফটা খুললাম। নেকলেসটা গায়েব।'

স্তব্ধ হয়ে গেল ছেলেরা। খবরটা হজম করতে সময় নিল।

অবশেষে বলল কিশোর, 'কোন্ নেকলেস? ইউজেনির সম্রাজ্ঞীরটা? এত দামী জিনিস প্রায় অপরিচিত একটা লোকের হাতে পাঠাতে সাহস করলেন তোমার খালা?'

'খালার বুদ্ধি শুদ্ধি এমনিতেই কম,' জিনা বলল। 'মা-ই কম্বিনেশনটা বলেছে খালাকে। কত রকমের অঘটনই তো আছে, বাড়িতে আগুন লাগতে পারে, ভূমিকম্পে ধসে যেতে পারে, তা-ই বলে রেখেছে, যাতে দরকার পড়লে নেকলেসটা সরিয়ে ফেলতে পারে খালা।'

'নেকলেস নেই, এটা যে জানো, জানেন তোমার খালা?'

'জানে। নেই দেখেই তো গিয়ে ধরেছি। বলল, মা নাকি বলেছে, নেকলেসটা পরিষ্কার করার জন্যে পাঠিয়ে দিতে।'

'নিশ্চয় বানানো গল্প?'

'তা-তো বটেই,' মুখ বিকৃত করল জিনা। 'মা বাড়িতে নেই, তবু নেকলেসটা পরিষ্কার করাতেই হবে, এতই তাড়াহুড়ো! আর যদি করতেই হয়, দোকানে পাঠাতে হবে কেন? ফন হেনরিখকে ফোন করলেই সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দিত, বাড়িতে বসে কাজ সেরে দিয়ে যেত।'

'তারমানে কোন ধরনের গোলমালে জড়িয়েছেন তোমার খালা,' কিশোর বলল। 'কয়েকটা ব্যাপারে উপসংহার টানতে পারি আমরা।'

'যেমন?'

'এক, অ্যানি পলের দুর্ঘটনার জন্যে নিজেকে দায়ী করছেন মিস মারভেল। ভাবছেন, শয়তানের সাহায্য নিয়ে কাজটা ভাল করেননি তিনি। পস্তাচ্ছেন এখন।'

'দুই, তাঁর ওপর কোন ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে ভ্যারাড। সম্মানিত অতিথির অভিনয় বাদ দিয়ে, খোলস ছেড়ে আসল রূপ ধরেছে। ফোর্ডকে প্যাকেট হাতে দেখেছে ভ্যারাড?'

'না। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে শুধু।'

'ও জানে, নেকলেসটা সেফে রাখা ছিল?'

'কি জানি! মনে হয় না। সেফের কাছে যেতে দেখিনি তাকে কখনও। ও শুধু জানতে চেয়েছে, কেন ফোর্ডকে তাড়াহুড়ো করে বাইরে পাঠাল খালা।'

'সেই রহস্যময় ফোর্ড! আবার সেই সব প্রশ্ন ঃ সে-রাতে গ্যারেজে সে-ই কি লুকিয়েছিল? নাকি তোমাদের কাজের লোক দরকার শুনে কাজ করতেই এসেছে? সে-রাতের সেই রহস্যময় লোকটা যদি সে হয়, তাহলে এ-বাড়িতে কি করছে? একটা ব্যাপার অবশ্য শিওর হয়ে গেলাম, ভ্যারাডের সহকারী সে নয়,' চুপ করে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে। 'কয়েকটা ব্যাপার খুব তাড়াতাড়ি জানা দরকার। প্রথমেই জানতে হবে, নেকলেসটা জুয়েলারের দোকানে

সত্যিই দিয়ে আসা হয়েছে কিনা।'

'তাই তো!' জিনা বিস্মিত। 'আগে ভাবিনি কেন? যাচ্ছি, এখুনি ফোন করব।'

'সকালে,' বাধা দিল কিশোর। 'আমাদের অফিস থেকে ফোন করবে, তাহলে তোমাদের বাড়ির কেউ জানবে না। সকালে জানার চেষ্টা করব, মিস পলের অ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে শয়তান-সাধকদের কোন যোগাযোগ আছে কিনা।' আনমনে বলল, 'কিন্তু ভ্যারাড কি সত্যিই সাপ পাঠিয়েছিল?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'সাপ পাঠানো হয়েছে বলছে বটে, কিন্তু তার অর্থ অন্য কিছু।'

'সেই অন্য কিছুটা কি? কি পাঠানো হয়েছে?'

'কি জানি।' হাত নাড়ল জিনা।

'তাহলে এত নিশ্চিত হয়ে বলছ কি করে?'

'আগেই বলেছি, ওরা ঘুরিয়ে কথা বলে। তাছাড়া বাক্সে বা অন্য কিছুতে ভরে জ্যান্ত সাপ পাঠাবে? মোটেই রাজি হবে না খালা। তার সবচেয়ে বড় শত্রুকেও ওভাবে চমকে দিতে চাইবে না, কামড়াতে পাঠানো তো দূরের কথা!'

রবিন বলল, 'আরেকটা ব্যাপার আছে এখানে। বীলিয়াল শব্দটা বলেছিল ভ্যারাড। লাইব্রেরিতে বইপত্র ঘেঁটে জেনেছি, বীলিয়াল শয়তানের আরেক নাম। আর শয়তানকেই শ্রদ্ধাভরে ডক্টর কিংবা ডাক্তার শয়তান বলে ডাকে তার পূজারিরা।'

'গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মুসার। 'খাইছে রে! শয়তানের সঙ্গে সাপের সম্পর্ক! আল্লাই জানে, কি ঘটবে!'

এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ল জিনা। 'কার সঙ্গে যে ভাব জমাল খালা!'

'সেটা আমিও ভাবছি,' রহস্যময় শোনাল কিশোরের কথা। 'আসল ইবলিস না হলেও মানুষ-শয়তান তো বটেই।'

দশ

বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে পরদিন সকালে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে হাজির হলো জিনা, দেখেই বোঝা যায় সারারাত ঘুমোতে পারেনি। অফিসের কাছে তার অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা।

'খালা কাঁদছে,' জানাল জিনা। 'ভ্যারাড ঘুমোচ্ছে। আর ফোর্ড দেখে এলাম জানালা পরিষ্কার করছে।'

'মেরিচাচী বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে,' কিশোর বলল। 'এই সুযোগে ফোনটা সেরে ফেলো।'

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অফিসে ঢুকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল জিনা। হারটার কথা জিজ্ঞেস করে জবাব শুনল চুপচাপ, তারপর 'থ্যাংকিউ' বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

'ওরা হার পেয়েছে.' উৎকণ্ঠা দূর হয়েছে জিনার। 'দিন কয়েক রাখবে হারটা,

কাজ হয়ে গেলেই পাঠিয়ে দেবে। যাক, বাঁচা গেল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললা সে।

'তাহলে নিরাপদেই আছে,' কিশোর বলল। 'আর যাই হোক, তোমাদের নতুন লোকটা রত্নচোর নয়। এখন সাপের ব্যাপারটা কি, জানা দরকার। অ্যাকসিডেন্টটা কি করে ঘটল জানতে হবে।'

'তোমার কি ধারণা?' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'মিস পলের গাড়িতে সাপ ফেলে রাখা হয়েছিল?'

কেঁপে উঠল জিনা।

'খুব সম্ভব,' জবাব দিল কিশোর। 'গাড়ির ভেতর হঠাৎ জ্যান্ত সাপ দেখলে চমকে উঠবে না এমন মানুষ কমই আছে।'

'এখন কি করবে?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

'আমি লাইব্রেরিতে যাব,' রবিন বলল। 'সাপ, শয়তান আর প্রেতসাধকদের ব্যাপারে পড়াশোনা করব। দেখি, আর কি কি জানা যায়।'

'আমি আর মুসা যাব হাসপাতালে,' কিশোর বলল, 'মিস অ্যানি পলকে দেখতে। লস অ্যাঞ্জেলেসে যাবে বোরিস, আমাদেরকে নামিয়ে দিতে পারবে।'

'আমি বাড়ি যাচ্ছি,' দরজার দিকে রওনা হলো জিনা। 'সবকটার ওপর নজর রাখতে হবে।'

'তেমন কিছু যদি জানতে পারি, ফোন করব তোমাকে,' কথা দিল কিশোর।

জিনা বেরিয়ে গেল।

দরজায় দেখা দিল বোরিস। 'রেডি?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। মুসাকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাকে চড়ল।

লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে ছুটে চলেছে ট্রাক। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে কিশোর, মুসা চুপচাপ।

ভারমন্ট বুলভারে ঢুকল গাড়ি, ছোট্ট একটা ফুলের দোকান চোখে পড়তেই বোরিসের বাহুতে হাত রাখল কিশোর। আফ্রিকান ভায়োলেটের একটা তোড়া কিনল সে, উপহারের কার্ডে গুটি গুটি করে কিছু লিখল। তারপর আবার এসে উঠল ট্রাকে।

অ্যাঞ্জেল অভ মারসি হাসপাতালের গেটে গাড়ি রাখল বোরিস। 'আমি থাকব?'

'থাকবেন?...আচ্ছা, থাকুন, আমরা আসছি,' কেবিনের দরজা খুলল কিশোর।

'এবার কিসের খোঁজে?'

'এক মহিলার সঙ্গে দেখা করব। সাপ!'

'সাপ!' চমকে উঠল বোরিস। এমনভাবে বলেছে কিশোর, যেন গাড়ির ভেতরেই কোথাও রয়েছে সরীসৃপটা।

'তা-ও আবার যে-সে সাপ নয়, গান গাওয়া-সাপ!' বোরিসকে আরও তাজ্জব করে দিল মুসা।

নামল কিশোর। মুসাকে নামতে মানা করল। বলল, 'আমি একাই যাই। লোকের চোখে যত কম পড়া যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে।'

'ঠিক আছে,' যেতে হলো না বলে খুশিই মুসা, 'আমি বসছি।'

হাসপাতালে এসে ঢুকল কিশোর। রিসিপশন ডেস্কের ওপাশে বসা মহিলাকে

জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মিস অ্যানি পলের সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

একটা বাক্সে সাজানো কার্ডে আঙুল চালাল মহিলা নীরবে। নির্দিষ্ট কার্ডটা তুলে পড়ল ঃ 'রুম নাম্বার দু'শো তিন, ইস্ট উইং।' মুখ তুলে কিশোরকে বলল, 'করিডর ধরে চলে যাও, লিফট পেয়ে যাবে। দোতলায় গিয়ে কোন নার্সকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে ঘর।'

রিসিপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে করিডর ধরে রওনা হলো কিশোর। লিফটে করে উঠে এল দোতলায়। সামনেই একটা অফিস, লোকজন খুব ব্যস্ত। ফোনে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছেন একজন ডাক্তার, ওষুধ আর যন্ত্রপাতির ট্রে নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক নার্স, আরও কিছু ওষুধ নিয়ে ছুটে এল আরেকজন নার্স। তাদের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, কিন্তু দেখতেই পেল না যেন তাকে কেউ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে এক নার্সকে নিয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। দ্বিতীয় নার্স রইল ফোনের কাছাকাছি, চোখ একটা চার্টে।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'মিস অ্যানি পলের সঙ্গে দেখা করব, প্লীজ। দুশো তিন নাম্বার।'

চার্ট থেকে চোখ ফেরাল নার্স। 'হবে না। ঘুমের বড়ি খাইয়ে এসেছি।'

'প্লীজ, সিসটার...'

'বললাম তো, এখন দেখা করতে পারবে না।' নিজের কাজে মন দিল নার্স।

'অ!' চোখের পলকে চেহারা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল কিশোরের। 'আমার...আমার চাচী!...চাচী ছাড়া আর কেউ নেই দুনিয়ায়!' ফোঁপাতে শুরু করল সে। 'বাবা-মা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে! এখন চাচীও যদি যায়...' আর বলতে পারল না সে, ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

বিস্ময় ফুটল প্রথমে নার্সের চোখে, সেটা করুণায় রূপ নিল। হাত তুলল, 'দাঁড়াও, খোঁজ নিয়ে দেখি, ঘুমিয়ে পড়ছে কিনা।'

দু'হাতে চোখ ডলতে শুরু করল কিশোর।

ইউনিফর্মে খসখস আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল নার্স, ফিরে এল আধ মিনিট পরেই। 'এখনও জেগেই আছে, যাও। কিন্তু দেরি করবে না? ঠিক?' হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল।

'থ্যা-থ্যাংকিউ, সিসটার!' হাসি ফুটল কিশোরের মুখে, বড় বড় অপূর্ব সুন্দর দুটো চোখ কান্নাভেজা।

দরজার গায়ে নম্বর দেখে পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। বিছানায় শুয়ে আছেন এক গোলগাল চেহারার মহিলা, ধবধবে শাদা চুল, ঢুলুঢুলু চোখ। কোমর পর্যন্ত কম্বল টানা।

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'মিস পল?' তোড়াটা বাড়িয়ে দিল।

মহিলার ঘুমজড়ানো ধূসর চোখের তারা উজ্জ্বল হলো। 'বাহ্, কি সুন্দর!'

'স্পেশাল ভায়োলেট,' হাসল কিশোর। 'একটা লোক আপনাকে দিতে দিল।'

বালিশের পাশ থেকে আস্তে করে চশমাটা নিয়ে পরলেন মিস পল। 'কার্ডটা দেখি?'

বিছানার পাশের টেবিলে ফুলদানিতে তোড়াটা গুঁজে রাখল কিশোর, কার্ডটা

খুলে নিয়ে দিল মহিলার বাড়ানো হাতে।

কার্ড চোখের সামনে এনে বিড় বিড় করে পড়লেন মিস পলঃ শুভেচ্ছা—তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। উল্টে পাল্টে দেখলেন। অবাক। 'আরে! নামটাম কিচ্ছু নেই!'

চুপ করে রইল কিশোর।

'কালও একই কাণ্ড ঘটেছিল।' আবার বললেন মহিলা। 'একটা প্যাকেট, সঙ্গে কার্ড···নামঠিকানা কিচ্ছু নেই। এত ভুলো মন লোকটার!'

'আমারও তাই মনে হলো,' কিশোর বলল। 'লম্বা ছিপছিপে মানুষ, কালো চুল, ফেকাসে চেহারা।'

'হুঁমম্!' চোখ মুদলেন মিস পল।

ঘুমিয়ে পড়ছেন না তো! অধির হয়ে উঠেছে কিশোর, এই সময় ঘুমিয়ে পড়লে···হঠাৎ চোখ মেললেন মহিলা। 'মনে পড়েছে! গতকাল ওই লোকটাই সাপ দিয়েছিল। আজ দিল ফুল।···আশ্চর্য!···'

'সাপ!'

'হ্যাঁ!···ছোট্ট···' চোখ মুদলেন আবার মিস পল, ঘুমিয়ে পড়ছেন।

'সাপ?' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'সাপ সংগ্রহ করেন নাকি আপনি?'

আবার মেলল ধূসর চোখ জোড়া। 'না না! ওটা আসল সাপ না! ব্রেসলেট। পছন্দ হলো না···' চোখের পাতা কাছাকাছি হতে শুরু করল মহিলার।

'তারমানে সাপের মত?' মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ।···ঠিকানা জানি না তো, নইলে ফেরত পাঠাতাম। দেখাচ্ছি,' ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়ালেন মিস পল। 'আমার হ্যাণ্ডব্যাগে।'

তাড়াতাড়ি ড্রয়ার খুলে হাতব্যাগটা বের করে দিল কিশোর।

ব্যাগ খুলে ভেতরে হাতড়ালেন মহিলা। 'এই···এই যে··· বিচ্ছিরি না?'

'হুঁ!' ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। ব্রেসলেটটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। খুদে একটা ধাতব সাপ, কারিগরের বাহাদুরী আছে, স্বীকার করতেই হবে। ফণা তুলে আছে অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি একটা সোনালি রং করা গোখরো, গাঢ় লাল পাথরে তৈরি দুটো চোখ, জীবন্ত মনে হয়।

সাপের মসৃণ পেটে আঙুল চালিয়ে দেখল কিশোর, যত ভাবে সম্ভব পরীক্ষা করল। 'গতকাল গাড়িতে এটা ছিল আপনার সঙ্গে?'

'ছিল, পরেছিলাম। গতকালই তো? হ্যাঁ, অথচ মনে হচ্ছে অনেকদিন আগের কথা,' চোখ মুদলেন। 'কি করে যে খুলে এল চাকাটা!···'

'চাকা খুলে এল? গাড়ির ভেতরে তাহলে গোলমাল ছিল না?'

আবার চোখ খুললেন মিস পল। 'না···চাকাটা খুলে গেল, সামনের···। গড়াতে গড়াতে ছুটল, পরিষ্কার দেখলাম! সামনে পুল···তারপর আর কিছু মনে নেই···'

দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল কিশোর। নার্স। কড়াদৃষ্টি।

'যাচ্ছি,' অনুনয়ের সুরে নার্সকে বলল কিশোর। ব্রেসলেটটা মিস পলের হাতে গুঁজে দিয়ে রওনা হলো দরজার দিকে।

'এতক্ষণ জ্বালাবে জানলে ঢুকতে দিতাম না.' কঠোর গলায় বলল নার্স।

'সরি,' করুণ হাসি হাসল কিশোর। 'যেতে মন চাইছে না…'

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল নার্স। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, অন্য সময় এসে কথা বলো আবার।' তাড়াতাড়ি বলল সে, আশঙ্কা, ছেলেটা আবার না কেঁদে ফেলে!

চেহারা বিষণ্ণ করে নার্সকে দেখিয়ে দেখিয়ে লিফটে উঠল কিশোর, দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই আয়নার দিকে চেয়ে দরাজ হাসি হাসল নীরবে।

'কিছু জানলে?' কিশোর কাছে আসতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল মুসা।

'অনেক কিছু,' গাড়িতে উঠল কিশোর। 'সাপটা মহিলার ব্যাগেই রয়েছে।'

'সা—প!' চেঁচিয়ে উঠল বোরিস। 'হাসপাতালে সাপ সঙ্গে রেখেছে?'

'ধাতুর সাপ। একটা ব্রেসলেট, গোখরোর হুবহু নকল।'

'বুঝেছি,' আস্তে মাথা দোলাল মুসা। 'যত গোলমাল ওই ব্রেসলেটেই! কোন মাদক ছিল, গাড়ি চালানোর সময় ঢুকে গেছে মিস পলের শরীরে। বরজিয়া আঙটির কথা শোনোনি? গোপন কুঠুরি ছিল আঙটির ভেতরে, তার ভেতরে রাখা হত মারাত্মক বিষ। গোপন অতি সূক্ষ্ম একটা সূচ লাগানো ছিল, ওটা বিষ ইনজেক্ট করে দিত যে পরত তার শরীরে…'

'জানি,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'সে-জন্যেই ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছি ব্রেসলেটটা। বরজিয়া আঙটির মত ভেতরে কোন কৌশল নেই। চেহারা বাদ দিলে অতি সাধারণ একটা অলংকার, ভ্যারাড নিজে দিয়েছে মিস পলের হাতে। কোন জ্যান্ত সাপ ছিল না মহিলার গাড়িতে, সামনের একটা চাকা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল।' মুসার দিকে ফিরল সে। 'কি মনে হয়? ব্রেসলেটে খুলেছে চাকাটা? যদি প্রমাণ করতে পারো, রাশেদ চাচার সব ক'টা লোহার চুলো চিবিয়ে খাব আমি, কসম।'

এগারো

ইয়ার্ডে ফিরে সোজা হেডকোয়ার্টারে রওনা হলো মুসা আর কিশোর। ওয়ার্কশপে ঢুকতেই চোখে পড়ল ছাপার মেশিনের ওপরে চালায় লাগানো লাইটটা জ্বলছে-নিভছে। তারমানে হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন বাজছে।

'জিনা হবে,' কিশোর বলল। 'তাকে আমাদের নাম্বারটা দিয়েছি।'

দুই সুড়ঙ্গের মুখে রাখা ধাতব পাতটা সরিয়ে পাইপে ঢুকে পড়ল মুসা। হামাগুড়ি দিয়ে এসে পড়ল শেষ মাথায়, ঢাকনা তুলে উঠে এল ট্রেলারের ভেতরে।

কিশোর ঢাকনা তুলেই শুনল মুসার গলা ঃ '…সাপ সত্যিই পাঠানো হয়েছে, তবে নকল সাপ। একটা ব্রেসলেট।…না না, সাপে কিছু করেনি। সামনের চাকা খুলে গিয়েছিল। স্রেফ দুর্ঘটনা…কিন্তু মাত্র পৌঁছেছি আমরা, এখুনি…ঠিক আছে, ডিনারের পর যাব।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। 'জিনা। মিস মারভেল আর ভ্যারাড লাইব্রেরিতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে। ফোর্ড গেছে বাজারে। আগে কোথায় চাকরি করেছে, তাকে জিজ্ঞেস করেছিল জিনা। দু'জায়গার কথা বলেছে। মিসেস জেরিনাল নামে এক মহিলার বাড়িতে, আর জনৈক প্রফেসর

হ্যারিডানের বাড়িতে। মিস্টার জেরিনাল সরকারি চাকুরে, কানসাস সিটিতে বদলী হয়ে গেছেন। ওখানে ফোন করার চেষ্টা করেছে জিনা, পারেনি, ফোন গাইডে নামই নেই। প্রফেসর হ্যারিডানকেও পায়নি, লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।'

'সুবিধের মনে হচ্ছে না,' কিশোর বলল। 'লোকটাকে কাজ দেয়ার আগে ভালমত খোঁজখবর নেয়া উচিত ছিল।'

'নেয়নি, এখন সেটা নিতে বলছে আমাদেরকে। কায়দা করে ফোর্ডের বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছে জিনা, সান্তা মনিকার নর্থ টেনিসনে। এখুনি যেতে বলেছিল, মানা করে দিয়েছে।'

'ডিনারের পর যাবে বলেছ।'

'হ্যাঁ। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। এখুনি বাড়ি না গেলে মা আর ঢুকতেই দেবে না।'

'ডিনারের পরই ভাল। আমারও তখন কোন কাজ থাকবে না।'

'কিন্তু,' গলা চুলকাচ্ছে মুসা, 'জিনার কথায় বড় বেশি নাচছি না আমরা! ও বলল চিলে কান নিল, আর ওমনি চিলের পেছনে ছুটলাম!'

'ও আমাদের মক্কেল,' কিশোর যুক্তি দেখাল। 'ওভাবে ফোর্ডকে ঘরে জায়গা দিয়ে ভুল করেছে, কিন্তু ভুল তো করেই মানুষ। যাই হোক, এখন ওকে সাহায্য করতে হবে আমাদের। হ্যাঁ, রবিনকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি, ঠিক সাতটায় যেন সুপারমার্কেটের সামনের রাস্তায় থাকে। তুমিও ওখানেই এসো। নাকি?'

'আচ্ছা।'

'ঠিক সাতটা, দেরি করো না।'

সন্ধে সাতটা পাঁচ মিনিটে কোস্ট হাইওয়ে ধরে সান্তা মনিকার দিকে সাইকেল চালাল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে আনা ম্যাপ দেখে নর্থ টেনিসন প্লেস খুঁজে বের করল কিশোর। মূল সড়ক থেকে বেরিয়ে গেছে একটা সরু গলি, তার মাথায় একটা বড় পুরানো বাড়ি, লাল টালির ছাত। জিনার দেয়া নাম্বার মিলিয়ে দেখে নিল মুসা।

'গ্যারেজ অ্যাপার্টমেন্ট,' বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।' সরু গাড়ি পথ ধরে এগিয়ে গেল সে, ফিরে এল খানিক পরে। 'একটা ডবল গ্যারেজের ওপর আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। একই নম্বর।'

'কিন্তু কোনটাতে থাকে ফোর্ড, কি করে জানব?' মুসা বলল।

'বড় বাড়িটায় কাউকে জিজ্ঞেস করব। বলব, আমরা ফোর্ডের ভাইপোর বন্ধু, ওয়েস্টউড যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, ফোর্ড চাচার সঙ্গে দেখাই করে যাই,' হাসল কিশোর।

'ফোর্ডের ভাতিজা। হা-হা!' সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল রবিন।

সাইকেলটা পথের ওপর শুইয়ে রেখে হেঁটে গিয়ে সদর দরজায় দাঁড়াল কিশোর, বোতাম টিপল। পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল, কেউ এল না, আবার বেল বাজাল। দরজা খুলল না কেউ। ফিরে এল সে।

'বুদ্ধি খাটল না,' মুসা বলল। 'এবার কি?'

'আগে ওই ছোট গ্যারেজটাতেই দেখব,' সাইকেল তুলছে কিশোর। 'আমার

মনে হয় ওখানেই থাকে সে। অনেক সময় মানুষকে দেখেই অনুমান করা যায় সে কেমন জায়গায় বাস করে।'

'চুরি করে ঢুকব?' মুসার প্রশ্ন।'

'জানালা দিয়ে দেখব।'

খুব সহজেই দেখা সম্ভব হলো। গ্যারেজের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, সিঁড়ির মাথায় খুদে একটা চত্বরমত, সামনে দরজা, পাশে জানালা, জানালার খড়খড়ি ওঠানো।

'কপাল ভাল আমাদের,' জানালার কাচে নাক চেপে ধরল কিশোর।

তার গা ঘেঁষে এল মুসা। জুতোর ডগায় ভর রেখে মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রবিন।

ডুবন্ত সূর্যের সোনালি আলো জানালা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে, ফলে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা তাক, বইয়ে ঠাসা। একটা কাজের টেবিল, তাতে নানারকম ফাইল-ফোল্ডার আর বইয়ের স্তূপ। ছোট আরেকটা টেবিলে একটা টাইপরাইটার, পাশে একটা ফ্লোর ল্যাম্প, একটা সুইভেল চেয়ার···বসে টাইপ করার জন্যে; বড় একটা কাউচ আছে, চামড়ায় মোড়া গদি।

'বাড়ি না অফিস?' মুসা বলল।

জানালার কাছ থেকে সরে এল কিশোর। 'লোকটা বইয়ের পোকা। লেখালেখির দিকেও ঝোঁক আছে মনে হচ্ছে।'

শিস দিয়ে উঠল রবিন। 'বইয়ের নাম দেখেছ? উইচ-ক্র্যাফট, ফোকমেডিসিন অ্যাণ্ড ম্যাজিক, আনকোরা নতুন বই। লাইব্রেরিতে এসেছে গত হপ্তায়, অনেক দাম। আরেকটা বই দেখলাম টেবিলে, ভুডু—রিচুয়াল অ্যাণ্ড রিআলিটি।'

'সাপ সংক্রান্ত কোন বই?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'থাকতে পারে, অনেক বইই তো আছে। সব টাইটেল পড়তে পারছি না এখান থেকে।'

দরজার নব ঘোরানোর চেষ্টা করল কিশোর, তালা আটকানো। ফিরে এসে জানালার শার্সি টান দিল, খুলে গেল। 'ঢোকা যাবে!' দুই বন্ধুর দিকে তাকাল সে।

গ্যারেজের নিচের চত্বরের দিকে তাকাল মুসা, শূন্য, নির্জন; বড় বাড়িটার কাছেও লোকজন দেখা যাচ্ছে না।

'ধরা পড়লে বিপদ হবে,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'পড়ব না,' জানালার চৌকাঠে উঠে ভেতরে লাফিয়ে নামল কিশোর।

মুসা আর রবিনও ঢুকল ঘরে। পায়ে পায়ে তিনজনেই এগিয়ে গেল কাজের টেবিলটার দিকে। তাকের বইগুলোর দিকে তাকাল রবিন। আদিম মানুষের আচার-ব্যবহার, উপকথা, লোককথা, ব্ল্যাক ম্যাজিকের ওপর লেখা নানা রকম বই।

কয়েকটা বইয়ের নাম পড়েই মুসা বলে উঠল, 'ভ্যারাড আর মিস মারভেলের সঙ্গে ব্যাটার মিল হবে ভাল!'

'লোকটার ওপর ভক্তি এসে যাচ্ছে আমার,' রবিন বলল। 'কঠিন কঠিন সব বিষয়, আজ দুপুরে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম, মাথায়ই ঢুকল না বেশির ভাগ।'

'অকাল্ট-বিশেষজ্ঞ দেখা যাচ্ছে!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'সত্যিই এটা ফোর্ডের ঘর তো? এমন একজন মানুষ লোকের বাড়িতে চাকর থাকতে গেছে!' টেবিলের ওপর ঝুঁকে ফাইলে লাগানো ট্যাগে নাম পড়তে শুরু করল সে, 'আউরো'জ ক্লায়েন্ট, দা গ্রীন ট্রায়াঙ্গল, দা ফেলোশিপ অভ দা লোয়ার সার্কেল...আরিব্বাপরে। কি সব নাম!' আপন মনেই বাংলা করল ওগুলোর 'আউরোর মক্কেল, সবুজ ত্রিভুজ, নিম্নচক্রে সঙ্ঘ...' বলতে বলতেই মোটা ফাইলটা টেনে নিল। 'আমাদের ভ্যারাড মিয়ার সঙ্ঘ কিনা, এখনি বোঝা যাবে.' ফিতের বাঁধন খুলে ফেলল সে।

'কি?' তাকের দিক থেকে ফিরল রবিন।

ঘেঁটে ঘেঁটে দুই শীট কাগজ বের করল কিশোর ফাইল থেকে। 'এই যে, মিস মারভেলের নাম! হুঁ, ফোর্ডের চোখ তাঁর ওপর পড়েছে। নামধাম নাড়ি-নক্ষত্র সব লেখা ঃ গোটা পাঁচেক অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান কিংবা সঙ্ঘের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল মিস মারভেল, অতীতে, দুটো অ্যাসট্রলজি ম্যাগাজিনে ছবি ছাপা হয়েছে তার, সাধুদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ভারতেও গিয়েছিল একবার। বেশিদিন থাকেনি ওখানে, সন্ন্যাসগিরি বিশেষ ভাল লাগেনি বোধহয়। রকি বীচে পারকার হাউসে কবে উঠেছে মিস মারভেল, তা-ও পরিষ্কার করে লেখা আছে, এমন কি হিউগ ভ্যারাড কবে ঢুকেছে তা-ও।'

'আর কিছু?' মুসা জানতে চাইল।

আরেক শীট কাগজ বের করল কিশোর। 'মিস মারভেলের সয়-সম্পত্তি কি আছে না আছে, তার লিস্ট। নাহ্, বড় লোক নয় মহিলা।'

'টাকা চায় নাকি ফোর্ড?'

ফাইলের কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখল কিশোর। 'তাই তো মনে হচ্ছে। রাসলারের নামধামও লিখেছে, ওই যে, খাবারের দোকানের নোংরা মালিক। ইস্ট লস অ্যাঞ্জেলেসে সম্পত্তি আছে তার। চেহারা দেখলে তো ভিখিরি মনে হয়, আসলে টাকা পয়সা আছে, দেখা যাচ্ছে।'

'কমলা লেডি?'

'জেরি গ্যানারিল, হেয়ারড্রেসার?' ফাইলের পাতা উল্টে চলল কিশোর, এক জায়গায় এসে থামল। 'এই যে, বেশ কয়েকটা অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। নিজের ব্যবসা আছে, যথেষ্ট ভাল আয়। হেয়ার ড্রেসিঙের দোকান ছাড়া আরও ব্যবসা আছে। স্টক। স্যান ফারনানদো ভ্যালিতে অফিস, নিজের অ্যাকাউনটেন্ট আছে।'

'আর কারও নাম?' রবিন জানতে চাইল।

'আছে। এই যে, আরেকটা মনে হয়, সেই মোটা মহিলা, সবুজ পোশাক পরেছিল যে। লোনের জন্যে ব্যাংকে দরখাস্ত করেছে, আরেকটা দোকান করবে। আরও অনেকের নাম লেখা আছে, তাদেরকে চিনি না আমরা।'

'ম্যাজিক অ্যাণ্ড উইচক্র্যাফট,' টেবিলে রাখা বইটায় আঙুল রাখল রবিন। 'সেই সঙ্গে টাকা!'

'টাকার সঙ্গে প্রেততত্ত্বের সম্পর্ক আছে বোধহয়,' কিশোর বলল

টান দিয়ে একটা ড্রয়ার খুলল মুসা। কয়েকটা পেপার ক্লিপ আর একটা ছোট টেপরেকর্ডার, ব্যস, আর কিছু নেই। রেকর্ডারে টেপের ছোট একটা স্পুল লাগানো রয়েছে! 'দারুণ জিনিস। মেরে দিলে কেমন হয়?'

যন্ত্রটা তুলে নিল রবিন। 'সত্যিই ভাল! ব্যাটারিতে চলে।' ছোট একটা বোতাম টিপতেই এক প্রান্তের একটা খোপের দরজা খুলে গেল। ভেতরে খুদে মাইক্রোফোন। 'বাহ্! চমৎকার! পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার জিনিস। জেমস বণ্ড এটা পেলে বর্তে যেত।'

'কিন্তু কি টেপ করা হয়েছে?' যন্ত্রটার দিকে চিন্তিত চোখে চেয়ে আছে কিশোর। 'দেখো তো, প্লে করা যায় কিনা।'

বোতামের কাছে নির্দেশ চিহ্ন রয়েছে, একটা বোতাম টিপল রবিন। মৃদু হিররর্ শব্দে ঘুরতে শুরু করল ফিতে, পুরোটা রিভার্স করে নিয়ে প্লে লেখা বোতামটা টিপল সে। কয়েক সেকেণ্ড খুটখাট করার পর ভেসে এল একটা পুরুষ কণ্ঠ ঃ শুরু করা যায়!

'ভ্যারাড!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

সবাই হাজির হয়নি আজ রাতে। হয়তো আজ কিছুই করতে পারব না, ডাক্তার শয়তান আজ দেখা দেবেন কিনা জানি না। যোজন যোজন দূরে রয়েছেন মহাসর্প, তিনি কথা বলবেন কিনা, তাই বা কে জানে! তবু চেষ্টা করে দেখা যাক!

'টেপরেকর্ডারটা পারকারদের বাড়িতে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল!' মুসা বলল।

'ডাইনিং রুমের কাছাকাছি কোথাও হবে,' ভেবে বলল রবিন।

স্পীকারে জেরি গ্যানারিলের কোলা ব্যাঙের মত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হাসলারের ঘোঁত ঘোঁত, আর অন্যান্য কথাবার্তা সবই শোনা গেল স্পষ্ট। তারপর ভেসে এল সেই গা-শিউরানো গান, ভরে দিল যেন ঘর!

'মহাসর্প!' ফিসফিস করল কিশোর।

শিউরে উঠে আস্তে করে যন্ত্রটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রবিন। বিচ্ছিরি গান গেয়েই চলেছে 'মহাসর্প।'

ধীরে ধীরে শেষ মাথায় পৌঁছে গেল ফিতে, গুঙিয়ে উঠে আরেকবার ফুঁপিয়েই শেষ হয়ে গেল গান। স্পীকারের স্বাভাবিক অতি মৃদু স্‌স্‌ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কিশোরের, শীতেই বোধহয়। হঠাৎই খেয়াল করল, ঘরে আলো নেই, কখন ডুবে গেছে সূর্য। আবছা অন্ধকার।

দরজায় শব্দ হতেই এক সঙ্গে ঘুরল তিন গোয়েন্দা।

ফোর্ড!

বারো

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

লাফ দিয়ে গিয়ে টেপরেকর্ডারের সুইস অফ করে দিল রবিন।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে কিশোর, ফোর্ডকে 'কি বলবে, ভাবছে। আমতা আমতা করে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছিলাম।'

দরজায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোঁফওয়ালা লোকটা। 'যে পথে ঢুকেছ সে-পথে? জানালা দিয়ে ঢুকেছ, না?' ঝাঁজাল কণ্ঠস্বর, খোলস পাল্টে ফেলেছে, বাড়ির নম্র কাজের লোক আর নয় এখন।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ফোর্ড, কিশোরের মনে হলো, ডিনামাইট ছাড়া তাকে ওখান থেকে নড়ানো যাবে না। পালানোর উপায় খুঁজল। 'রবিন,' হাত বাড়াল সে, 'টেপটা।'

রেকর্ডার থেকে খুলে টেপের স্পুলটা কিশোরের হাতে দিল রবিন।

'ওটা আমার।' কপাল কুঁচকে গেছে ফোর্ডের।

স্পুলটা বাড়িয়ে ধরল কিশোর। 'রেকর্ড করলেন কি করে? ডাইনিং রুমে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন?'

প্রায় অন্ধকার ঘরের ভেতরে লাফিয়ে এসে পড়ল ফোর্ড। খপ করে চেপে ধরল কিশোরের হাত।

'দৌড় দাও!' বন্ধুদেরকে চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

খোলা দরজার দিকে দৌড় দিল দুই সহকারী গোয়েন্দা। হাত থেকে স্পুলটা ছেড়ে দিল কিশোর। ফোর্ডের বাঁ হাঁটুর পেছনে ডান পা বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল।

পেছনে বাঁকা হয়ে গেল ফোর্ডের শরীর, গাল দিয়ে উঠল সে। স্পুলের ফিতের এক প্রান্ত ধরে রেখেছিল কিশোর, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে ফিতে। প্রান্তটা ছেড়ে দিয়ে আচমকা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েই দৌড় দিল।

কিশোর দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় পেছন থেকে তার শার্ট চেপে ধরল ফোর্ড। কিন্তু গতি সামান্যতম শিথিল করল না কিশোর। শার্টের পিঠের খানিকটা ছিঁড়ে ফোর্ডের হাতে রয়ে গেল, কেয়ারই করল না গোয়েন্দাপ্রধান, একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নিচে নেমে চলল।

অনুসরণ করল না ফোর্ড। হাতে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো নিয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। সাঁই সাঁই প্যাডাল করে সাইকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে তিন কিশোর।

'গোলমাল বাধাবে না-তো ফোর্ড?' পাশাপাশি সাইকেল চালাতে চালাতে এক সময় বলল মুসা।

'হয়তো পুলিশে ফোন করবে। করলে আমরা বলে দেব টেপ আর ফাইলের কথা।'

'ওদুটো জিনিস সহজেই নষ্ট করে, কিংবা লুকিয়ে ফেলা যায়,' কিশোর বলল। 'আমরা রীতিমত অপরাধ করেছি। চুরি করে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করেছি, অভিযোগ করতে পারবে সে। জিনাদের বাড়িতে দেখেছে আমাদের, কোথায় থাকি, সহজেই বের করে ফেলতে পারবে।'

'তো, আমরা এখন কি করব?' রবিনের প্রশ্ন।

'ইয়ার্ডে ফিরে আগে জিনাকে ফোন করব। হয়তো কিছুই করবে না ফোর্ড। ও যে রাতে চুরি করে পারকারদের গ্যারেজে ঢুকেছে, এটা তো মিথ্যে নয়। তাছাড়া লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোঁজখবর করে তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করেছে। অপরাধবোধ আছে তার মনে। পুলিশকে ফোন করার আগে অন্তত দশবার

ভাববে।'

'আচ্ছা, উদ্দেশ্য কি ছিল ওর?' মুসা বলল। 'ব্ল্যাকমেল?'

'হতে পারে।'

'জিনা আমাদেরকে বললে পারত,' তিক্ত শোনাল মুসার কণ্ঠ, 'আজ রাতে ফোর্ড বাসায় যাবে!'

'জানে না হয়তো।'

হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। টেলিফোন বাজছে।

লাইনের সঙ্গে স্পীকারের কানেকশন রয়েছে, সুইচ অন করে দিয়ে রিসিভার তুলল কিশোর। জিনার কণ্ঠ শোনা গেল। 'কিশোর?'

'হ্যাঁ,' কিশোরের চাঁছাছোলা জবাব। 'ফোর্ড ধরে ফেলেছিল আমাদেরকে।'

'সরি,' আন্তরিক দুঃখিত মনে হলো জিনাকে। 'জানার পর তোমাদেরকে জানানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বেরিয়ে গেছ তোমরা তখন। ও বলল, বাসায় কি জরুরী কাজ আছে; কি করে আটকাই, বলো? চাপাচাপি করতে পারতাম, তাতে লাভ হত কি?'

'করে দেখতে পারতে,' ক্ষোভ যাচ্ছে না কিশোরের; 'আমার শার্ট ছিঁড়ল, ও জেনে গেল, ওর ওপর আমরা গোয়েন্দাগিরি করছি, তোমারও আরেকজন কাজের লোক গেল।'

'আর ফিরে আসবে না বলছ?'

দ্বিধা করল কিশোর। 'গরু হলে আসবে! ওর ঘরে ঢুকে এমন সব জিনিসপত্র পেয়েছি, প্রমাণ করতে পারলে কয়েক বছর জেল হয়ে যাবে ওর। তোমার খালাকে বোধ হয় ব্ল্যাকমেল করার তালে ছিল ফোর্ড। সে-রাতে গ্যারেজে লুকিয়েছিল ও-ই, বৈঠকের কথাবার্তা আর গান রেকর্ড করেছে।'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা! খালাকে ব্ল্যাকমেল করবে কি কারণে? কি অপরাধ করেছে খালা?'

'মিস অ্যানি পলের অ্যাকসিডেন্টের জন্যে কে দায়ী?'

চুপ করে রইল জিনা।

'তোমার খালা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওপরে। মন খারাপ।'

'ভ্যারাড?'

'লাইব্রেরিতে। কিছু একটা করছে।'

'ওই গান আর শুনেছ?'

'না। বাড়িটা কবরের মত নীরব।'

'ঠিক আছে, চোখ খোলা রাখো। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। ফোর্ড ফিরলে তা-ও জানাবে।'

কিন্তু ফোর্ড ফিরল না। পরদিন সকালে ইয়ার্ডে ফোন করে কিশোরকে জানাল জিনা। দুপুরের আগে রবিনকে নিয়ে আবার সান্তা মনিকায় গেল কিশোর। আগের দিনের মতই বড় বাড়িটার সদর দরজায় গিয়ে বেল বাজাল। আজ জবাব পেল, দরজা খুলে দিল এক শীর্ণকায় বৃদ্ধা। জানাল, সকাল বেলায়ই ঘর খালি করে মালপত্র

নিয়ে চলে গেছে ফোর্ড।

'কোথায় গেছে বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'দোকানে বিল বাকি ফেলে গেছে।'

'জানি না,' মাথা নাড়ল বৃদ্ধা। 'কোত্থেকে একটা গাড়ি আর ট্রেলার এনে মালপত্র তুলে নিয়ে চলে গেল।'

তেরো

'খুব অসুবিধে হচ্ছে,' কিশোরকে বলল জিনা। ফোর্ড গেছে তিন দিন হয়েছে। 'অন্তত খাওয়া-দাওয়াটা তো ঠিকমত করতে পারতাম। সারাদিন গুম হয়ে বসে থাকে খালা। ভ্যারাড আছে আগের মতই, সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে খালাকে।'

'এখন কোথায়? নিশ্চয় ঘুমোচ্ছ?' বেড়ার বাইরে রয়েছে কিশোর।

'না, চুল কাটাতে গেছে।'

'এই সকাল বেলা!'

'আজকাল ভোরে ভোরেই উঠে পড়ে, ছুঁচোবাজি কমিয়ে দিয়েছে কেন জানি!'

'কি কি আলোচনা করে দু'জনে?' তারের বেড়ার ভেতরে ঘাস খাচ্ছে আপালুসাটা, দেখছে কিশোর।

'কোন আলোচনাই নয়।'

'উদ্ভট কিছুতে জড়িয়ে পড়েছেন তোমার খালা। প্রেততত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছে রবিন ক'দিন ধরে, ও বলছে, তোমার খালা প্রেতসাধকের পাল্লায় পড়েছেন, প্রেতসাধনা চালাচ্ছেন। ছুড়ির ডগা দিয়ে বিছানায় চক্র এঁকে তাতে বসে থাকা, মোম জ্বেলে মন্ত্র পড়া, কিংবা রঙের ওপর বিশেষ জোর দেয়া, এসব প্রেত পূজারিরাই সাধারণত করে থাকে।'

'ক'দিন ধরে মোম জ্বালাচ্ছে না খালা।'

'আগামী হপ্তায়ই তো র‍্যামন ক্যাসটিলোর বাড়িতে নীলাম,' কথার মোড় ঘোড়াল কিশোর। 'তোমার খালা যাচ্ছেন? ক্রিস্টাল বল কেনার জন্যে বোধহয় যেতে পারবেন না মিস পল।'

আগামী এক মাসও কোথাও যেতে পারবেন না। পায়ের হাড় দু'জায়গায় ভেঙেছে। খালা খালি নিজেকে দোষ দিচ্ছে। রোজ সকাল-বিকাল ফোন করে হাসপাতালে, নার্সের কাছে খবর নেয় মিস পল কেমন আছে।'

ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শুনে দু'জনেই তাকাল বাড়ির সামনের দিকে। চকচকে কালো একটা লিমোসিন ঢুকছে। গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল গাড়িটা, শোফার নেমে পেছনের দরজা খুলে ধরল। খুব দামী পোশাক আর দস্তানা পরা একজন বেঁটেখাটো লোক বেরিয়ে এল।

ভুরু কোঁচকাল জিনা। 'মিস্টার ফন হেনরিখ!'

কিশোরও দেখছে লোকটাকে।

'সাধারণ জিনিস হলে কর্মচারী দিয়ে পাঠিয়ে দেয়,' আবার বলল জিনা। 'বোধহয় নেকলেসটা নিয়ে এসেছে। চলো তো, দেখি।'

বেড়া ডিঙিয়ে এপারে চলে এল কিশোর। জিনার সঙ্গে রান্নাঘর দিয়ে হলে ঢুকল। ফন হেনরিখের হাত থেকে একটা প্যাকেট নিচ্ছে মিস মারভেল। কিশোর লক্ষ্য করল, সেই নীলচে-লাল গাউনটাই পরে আছে মহিলা, তবে আগের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, জায়গায় জায়গায় কুঁচকে গেছে, ময়লা, ধোয়া হয় না কতদিন কে জানে। এক কাপড় অনেকদিন পরছে মনে হচ্ছে।

মাল ডেলিভারি দিয়ে রিসিপ্ট এবং ধন্যবাদ নিয়ে চলে গেল ফন হেনরিখ।

'জিনা…,' বলতে বলতেই কিশোরের দিকে চোখ পড়ল মিস মারভেলের। ভুরু কোঁচকাল। 'আরে, কিশোর! গুড মর্নিং! কখন এলে?'

'এই তো,' এক পা এগোল কিশোর! 'কেমন আছেন, খালা?'

'ভাল না।' জিনার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল খালা। 'নে, নেকলেস। খুলে দেখত, কেমন পরিষ্কার করেছে?'

শাদা কাগজের আবরণ ছিঁড়ে গাড় সবুজ রঙ করা চামড়ার একটা বাক্স বের করল জিনা। বাক্সের ডালা তুলতেই ঝিলিক দিয়ে উঠল একশোরও বেশি পাথর, ঠাণ্ডা, শাদা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

'দারুণ, না?' কিশোরকে দেখিয়ে বলল জিনা। 'দারুণ হবে না?'

'সীসের মত ভারি!' জিনা বলল। 'ভারি বলেই পরে না মা। আরেকটা হালকা হার আছে, ওটা পরে সব সময়। হীরা আমারও পছন্দ না, তার চেয়ে মুক্তো ভাল: হালকা। তবে কিনেছে যখন, এই হারটাই পরে রাখা উচিত ছিল মা'র। যে কোন আয়রন সেফের চেয়ে গলায় থাকা অনেক নিরাপদ।'

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল মিস মারভেল। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই বলল, 'ওই যে, এসেছে!'

'রকি বীচের আপদ!' মুখ কালো করে ফেলল জিনা। 'নাপিত ওর গলাটা কেটে দিল না কেন!'

'জিনা, জলদি সেফে রেখে দে নেকলেসটা!'

দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। গাউনের পকেটে হাত ঢোকাল মিস মারভেল, হাতটা যেন দেখাতে চায় না, তাই লুকিয়ে ফেলল। 'যা, দেরি করছিস কেন!'

বাক্সসহ হারটা নিয়ে চলে গেল জিনা। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল ভ্যারাড, আর এক মুহূর্ত আগে ঢুকলেই জিনার হাতে বাক্সটা দেখতে পেত। হেয়ার টনিকের মিষ্টি ঝাঁজাল গন্ধ এসে লাগল কিশোরের নাকে।

খানিক পরেই সিঁড়ির মাথায় দেখা দিল আবার জিনা। 'কিশোর, পরে কথা বলব।'

'আচ্ছা, আমি যাই,' দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর।

সারাদিন ইয়ার্ডে কাজ করল কিশোর, কান টেলিফোনের দিকে। বিকেল পাঁচটায় জিনার ফোন এল।

'আজ সকালে খালার ব্যবহারে অবাক হওনি?' জিনা বলল।

'হয়েছি,' জবাব দিল কিশোর। 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার, নেকলেসটা আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে, এটা কিছুতেই ভ্যারাডকে জানতে দিতে চান না।'

'হ্যাঁ। ভ্যারাড নাপিতের দোকানে যাওয়ার পর নিশ্চয় ফোন করেছিল খালা, তাড়াতাড়ি হারটা ডেলিভারি দিয়ে যেতে বলেছিল ফন হেনরিখকে। কিন্তু এত সবের কি দরকার ছিল? হারটা থাকত পড়ে হেনরিখের দোকানে, মা এসে আনিয়ে নিতে পারত।'

'তারমানে হারটা তোমার খালার দরকার।'

'কি দরকার!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'ওটা আমার মায়ের জিনিস! খালার না!'

'সে-তো ঠিকই। এক কাজ করতে পারবে? জিনিসটা একবার নিয়ে আসতে পারবে আমাদের এখানে? কাজ আছে।'

'নিশ্চয়ই,' সামান্যতম দ্বিধা নেই জিনার গলায়। 'জ্যাকেটের পকেটে করেই নিয়ে আসতে পারব। কেউ দেখবে না।'

'ভেরি গুড। নিয়ে এসো। আমি ওয়ার্কশপে আছি।'

ছ'টা নাগাদ জিনা এল। বাক্সসহ হারটা কিশোরের হাতে দিয়ে খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে চলে গেল।

পরদিন ওয়ার্কশপে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা আর জিনা। বোরিসকে এক জায়গায় পাঠিয়েছে কিশোর, তার ফেরার অপেক্ষা করছে ওরা।

দুপুর দুটোয় ফিরল বোরিস। একটা বাক্সে বসে পকেট থেকে সবুজ বাক্সটা বের করে ডালা খুলল। 'খুবই সুন্দর জিনিস, মিস পারকার,' জিনার দিকে চেয়ে হাসল সে। 'কিন্তু কোন দাম নেই।'

'দাম নেই!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা। 'জানেন, ওটা সম্রাজ্ঞী ইউজেনির জিনিস! অনেক দামী, ঐতিহাসিক মূল্য ধরলে তো কথাই নেই!'

একটু যেন থমকে গেল বোরিস। 'সরি, মিস পারকার, কিন্তু আমি ঠিকই বলছি। সম্রাজ্ঞীর জিনিস নয় এটা, মেকি। তিনটে বড় বড় দোকানে দেখিয়েছি, একই কথা বলল। একজন তো হেসে রসিকতাও করল, ইনসিওরেন্স করাতে বলল।'

'মেকি!' দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন জিনার। 'দিন!'

বাক্সটা জিনার হাতে দিয়ে উঠল বোরিস। 'আমি যাচ্ছি। কিশোর, মিসেস পাশা কিছু বলেছেন? খুঁজেছেন আমাকে?'

'খুঁজেছিল, আমি বলেছি।'

'আচ্ছা,' বেরিয়ে গেল বোরিস।

'ওকে পাঠালে কেন?' জিনা বলে উঠল। 'তুমি গেলেই পারতে?'

'না, পারতাম না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার বয়েসী কারও হাতে ওই জিনিস দেখলে লোকে সন্দেহ করত। বোরিস বড় মানুষ···তখন অবশ্য জানতাম না ওটা নকল!'

'আমি যাচ্ছি!'

'তোমার খালাকে জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়?'

'করব মানে!' কঠিন গলা জিনার। 'আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব! পেয়েছে কি? আসলটা কি করেছে না জেনে ছাড়ব মনে করেছ?'

'কি করেছে, অনুমান করতে পারি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'নকল একটা বানিয়ে এনেছে তোমাদের সেফে রাখার জন্যে। আসলটা রয়ে গেছে ফন

হেনরিখের কাছে। ইচ্ছে করেই আনায়নি তোমার খালা।'

ধীরে ধীরে আবার বাক্সের ওপর বসে পড়ল জিনা। 'তাই তো! এটা তো ভাবিনি! আগাথা ক্রিস্টির পোয়ারোকে হার মানাচ্ছ তুমি, কিশোর পাশা, নাহ্, স্বীকার করতেই হচ্ছে! তারমানে আসল হারটা নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা নিয়েছে খালা!'

'কিন্তু নকল হার বানানোর দরকার কি ছিল?' মুসা ঠিক বুঝতে পারছে না। 'কি করবে এটা দিয়ে?'

ভ্রূকুটি করল জিনা। 'ওই ছুঁচো ভ্যারাডটা বোধহয় কোনভাবে ভয় ঢুকিয়েছে খালার মনে! আসল হারটা তা-ই ব্যাটাকে দেখতে দিতেই রাজি নয় খালা।'

'ভ্যারাড হারটা চুরি করবে, এই ভয়?' রবিন বলল।

'তাহলে তো ভালই,' বলে উঠল মুসা। 'পালাক না! নকল হার নিয়ে ভাগুক ছুঁচোটা, জিনাও বাঁচুক।'

'এত সহজ চুরির কেস বলে মনে হচ্ছে না আমার,' কিশোর বলল। 'সাংঘাতিক কোন ঘাপলা রয়েছে! মিস অ্যানি পলের অ্যাকসিডেন্ট, প্রেতবৈঠক, মহাসর্পের গান, সব কিছু মিলিয়ে কোথায় জানি একটা মস্ত প্যাঁচ রয়েছে। তারই মাঝে কোনভাবে জড়িয়েছে এই হারের ব্যাপারটা।'

'এখনও কি গান শোনা যায়?' জিনাকে প্রশ্ন করল রবিন।

'না। আর একদিনও শুনিনি।'

'ভয় করে বাড়িতে থাকতে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'একটু যে করে না, তা বলব না!'

'এক্ষুণি তোমার কোন বিপদ নেই,' কিশোর অভয় দিল, 'এটুক বলতে পারি। তোমাকে ভ্যারাড যতক্ষণ না সন্দেহ করছে, তুমি নিরাপদ। ব্যাপারটাতে ফোর্ড জড়িত, আবার ফিরে আসবে সে কোনভাবে, তবে তাকে বিপজ্জনক লোক মনে হলো না। আর যা-ই করুক, মানুষের রক্তে হাত রাঙাবে না।'

'নিজের চেয়ে খালার জন্যে বেশি ভাবছি আমি,' জিনা বলল। 'আমাকে কচি খুকী ভাবে ওরা, ভাবুক, ভালই। কিন্তু খালা যে বিপদে পড়তে যাচ্ছে। আজ রাতে আবার প্রেতবৈঠক বসবে টরেনটি ক্যানিয়নের সেই বাড়িতে। ডক্টর শয়তান আজ দেখা দিতে পারে, বলল ভ্যারাড। খালা প্রথমে যেতে রাজি হয়নি, কিন্তু পরে শুনলাম যাবে।'

'চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'মোটেই চমৎকার নয়!' পাল্টা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল জিনা। 'ভয়ংকর! প্রেতবৈঠকে খালাকে দেখতে চাই না আমি!'

'প্রেতসাধনা করছে, না কি করছে, শিওর না হয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না। তোমার খালাকেও ভ্যারাডের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনার কোন উপায় দেখছি না। ...আজ রাতেও আমরা যাব...'

'আমিও যাব।' ধরে বসল জিনা।

'জিনা, প্লীজ!' অনুরোধ করল মুসা।

'না, আমি যাবই,' গোঁ ধরল জিনা। 'তোমাদের চেয়ে আমার দায়িত্ব বেশি,

কারণ, আমার খালা! ভ্যারাড আমার বাড়িতে থাকছে, আমাকে জ্বালাচ্ছে। তা কখন রওনা হচ্ছ?'

'সন্ধ্যায়,' কিশোর বলল। 'এই সাড়ে সাতটার দিকে।'

'কোথায় দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে?'

'এখানেই চলে এসো। দেখি, চাচীকে গিয়ে ধরতে হবে। পিকআপটা নিতে পারলে ভাল।'

'আমি যাই,' বাক্সটা জ্যাকেটের পকেটে নিয়ে বেরিয়ে গেল জিনা।

'রাজি হলে কেন?' মুসা আপত্তি করল। 'গিয়ে বিপদে পড়লে?'

'ওকে দেয়ালের ওপরে উঠতে না দিলেই হলো,' মচকি হাসল রবিন।

'দেখো, এক কথা বার বার ভাল্লাগে না!' রেগে গেল মুসা।

'আরে দূর, ঝগড়াঝাঁটি রাখো তো,' হাত তুলল কিশোর। 'এক কাজ করো, তোমরা আজ আমাদের এখানেই খাও। সকালে দেখলাম, অনেকগুলো আনারস আনিয়েছে চাচী, মোরব্বা বানাবে,' মুসার দিকে চেয়ে হাসল সে।

ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার, রাগ পানি। রবিনের দিকে চেয়ে বলল, 'যাও, মাফ করে দিলাম।'

চোদ্দ

'আমিও ঢুকব,' জেদ ধরল জিনা।

'ঢুকবে!' বিরাট গেটের দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিন্তিত। 'দেখা যাক!'

করবীর ঝোপে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে চারটি ছেলে-মেয়ে। নজর বাড়ির গেটের দিকে, মেহমানরা কখন আসে, সেই অপেক্ষায় আছে। পথের মোড়ে পহাড়ের গা ঘেঁষে পিকআপ থামিয়ে তাতে বসে আছে বোরিস।

'আমি ওটাতে চলে যাই,' গেটের আরও কাছে আরেকটা করবীর ঝোপ দেখিয়ে বলল রবিন। 'কে কি বলে, শুনতে পাব।'

মাথা কাত করল কিশোর।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে এক ছুটে গিয়ে অন্য ঝোপটায় ঢুকে পড়ল রবিন।

প্রথম গাড়িটা এল। জেরি গ্যানারিল নেমে রাস্তা পেরিয়ে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, খোপ থেকে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল। এই সময় এল নীলচে-লাল করভেট, ড্রাইভিং সীটে হিউগ ভ্যারাড। আবছা ধূসর আলোয় পেছনের সীটে বসা মিস মারভেলের মূর্তিটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে, বার বার চোখের কাছে হাত নিয়ে যাচ্ছেন, নিশ্চয় রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। ধরে ধরে তাঁকে নামাল ভ্যারাড। গুঞ্জন উঠল গেটের পাল্লায়, খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল তিনজনে।

মিনিট কয়েক পরে ফেকাসে-নীল একটা ক্যাডিলাক এসে থামল। হালকা-পাতলা একজন লোক নামল গাড়ি থেকে, বাদামী চুল। গেটের কাছে গিয়ে রিসিভার বের করে কানে ঠেকাল।

একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে রবিন, যে ঝোপে রয়েছে, সেখান থেকেও কথা স্পষ্ট শোনা যায় না। ঝুঁকি নিল। নিঃশব্দে বেরোল ঝোপ থেকে, পা টিপে টিপে এসে থামল লোকটার পেছনে।

'লোয়ার সার্কেলে নেমে যাব আমি,' বলেই রিসিভার রেখে দিল লোকটা।

'গুড ইভনিং,' বলল রবিন।

ঝট করে মুখ ফেরাল লোকটা।

'এটা কি আঠার'শ বত্রিশ টরেনটি সার্কেল?'

'না। এটা টরেনটি ক্যানিয়ন ড্রাইভ। রাস্তা ভুল করেছ।'

গুঞ্জন তুলে খুলে গেল পাল্লা। লোকটা ভেতরে ঢুকে যেতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।

প্রথম ঝোপটায় ফিরে এল রবিন। 'লোয়ার সার্কেলে নেমে যাব আমি।'

হাঁ করে চেয়ে রইল অন্য তিনজন।

'বুঝলে না?' হাসল রবিন। 'এটা ওদের কোড। দারোয়ান বলেঃ অন্ধকার রাত। তার জবাবে বলতে হবেঃ লোয়ার সার্কেলে নেমে যাব আমি।'

'তাহলে আর দেরি কেন?' জিনা বলল। 'চলো নেমে যাই।'

গেটের কাছে এসে দাঁড়াল চারজনে। রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। ভেসে এল একটা খসখসে গলাঃ অন্ধকার রাত! কণ্ঠস্বর যতখানি সম্ভব ভারি করে তার জবাব দিল কিশোর।

ক্লিক করে কেটে গেল কানেকশন। রিসিভার রেখে দিল কিশোর। মুহূর্ত পরেই গুঞ্জন তুলে খুলতে শুরু করল পাল্লা।

জিনাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। হ্যাণ্ডেল টেনেটুনে দেখল রবিন, নড়ল না দরজা।

'ওভাবে টানাটানি করে লাভ নেই, খুলবে না,' মুসা বলল। গেটের এক পাশে আইভি লতার ঝাড় দেখাল। 'ওর ভেতরে দেয়ালে একটা খোপ আছে, তাতে সুইচ-টুইচ কিছু একটা আছে। সেদিন রাতে দারোয়ান ব্যাটাকে খুলতে দেখছিলাম।'

ভুরু কুঁচকে আইভি-ঝাড়ের দিকে তাকাল রবিন। 'তাই! তারমানে কোন ধরনের সারকিট ব্রেকার!'

'আহাহা, হাত দিও না!' বাধা দিল কিশোর। 'অ্যালার্ম কানেকশন থাকতে পারে, বেজে উঠবে! কোথায় আছে জানলাম তো, জরুরী দরকার পড়লে খুলে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'চলো, ব্যাটারা কি করছে দেখি!' তাড়া দিল জিনা।

'না, এখুনি বাড়ির ভেতরে ঢুকব না,' কিশোর বলল। 'মেহমানরা সবাই আসেনি। আসুক, তারপর।'

বাড়ির এক কোণে একটা অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে রইল ওরা। চোখ গেটের দিকে। খানিক পর পরই খুলতে লাগল গেট, মেহমানরা ঢুকল। পনেরো মিনিটে আরও আটজন লোক এল, লম্বা গাড়িপথ ধরে চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

'আটজন, প্লাস, জেরি গ্যানারিল, মিস মারভেল আর ভ্যারাড,' বলল কিশোর,

'এগারো জন। বাড়ির ভেতরে আছে আরেকজন, নিশ্চয় বাড়ির মালিক, মোট বারোজন। সেরাতেও বারোজনই ছিল। তারমানে মোট সদস্য এই-ই!'

চুপ করে রইল অন্য তিনজন।

আরও মিনিট দশেক গেল, কেউ এল না। নিশ্চিত হলো কিশোর, বারোজনই। ওঠার সিদ্ধান্ত নিল সে।

'হুঁশিয়ার!' সতর্ক করল মুসা। 'সেই দারোয়ান ব্যাটার হাতে পড়া চলবে না!'

নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে ঘাসে ঢাকা আঙিনা ধরে এগোল ওরা। লম্বা একটা জানালায় অতি ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে, ভারি পর্দা ভেদ করে আলো বেরোতে পারছে না ভালমত। জানালার কাছ থেকে দূরে রইল ওরা, ঘুরে চলে এল বাড়ির পেছন দিকে।

'দরজা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। সামান্য ঝুঁকে অন্ধকারে এগোল সাবধানে, যাতে কোন কিছুতে হোঁচট খেয়ে না পড়ে। দরজার নব ধরে মোচড় দিল, নড়ল না নব, তালা লাগানো।

কিশোরের কাঁধে হাত রাখল জিনা। 'ওই যে,' কানের কাছে বলল সে। 'একটা জানালা। খোলা আছে মনে হয়। এত ওপরে, ছিটকিনি লাগানোর কথা ভাববে না ওরা।'

'ভাঁড়ার বোধহয়,' জানালাটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'খুব বেশি ছোট।'

'আমি ঢুকতে পারব,' বলে উঠল জিনা।

'না, তুমি পারবে না,' রবিন মাথা নাড়ল। 'আরও সরু শরীর হতে হবে।'

'ঠিকই বলেছ,' কিশোর বলল। 'তারমানে তোমাকেই যেতে হচ্ছে। আমিও ঢুকতে পারব না। পারবে?'

'খুব পারব।'

'সাবধান!'

জানালার নিচে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা। তার কাঁধে উঠে দাঁড়াল রবিন।

'খোলা?' নিচ থেকে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'শ্ শ্ শ্! আস্তে!' কান পেতে শুনছে কিশোর, কাঠে কাঠ ঘষার শব্দ।

গুঙিয়ে উঠল রবিন, হাতে ভর দিয়ে টেনে তুলল শরীরটা, জানালা দিয়ে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেটে গেল দীর্ঘ এক মিনিট। ক্লিক করে মৃদু একটা শব্দ হলো, আস্তে করে খুলে গেল পেছনের দরজা, একটু আগে যেটা খোলার চেষ্টা করেছিল কিশোর।

'এসো,' চাপা গলায় ডাকল রবিন। 'ওরা সামনের কোন একটা ঘরে রয়েছে।'

আরেকটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা, রান্নাঘর। সামনের দিকে ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে। ঘরের অন্য পাশের দরজার কাছে এসে ওপাশে উঁকি দিল কিশোর, একটা হলঘর। বাঁয়ে চওড়া সিঁড়ি, ডানে সিঁড়ির ঠিক উল্টো দিকে একটা দরজা, ওপর দিক ধনুকের মত বাঁকানো। ওই দরজা দিয়েই আসছে আলো।

আবার আগের জায়গায় ফিরে এল কিশোর। জানালায় পর্দা নেই, বাইরে গাছের মাথায় ঘোলাটে জ্যোৎস্না, আবছা আলো এসে পড়েছে ঘরে। একটা স্টোভের আদল চোখে পড়ছে। কাছেই কোথায় জানি একটা কলের চাবি ঠিকমত

লাগানো হয়নি, পানি পড়ার টুপটাপ শব্দ কানে আসছে। বাঁয়ে দেয়ালের গায়ে মস্ত এক কালো ফোকর, না না, আরেকটা দরজা, পাল্লা খোলা।

রবিনের কাঁধে হাত রাখল কিশোর, মাথা ঝোঁকাল রবিন। জিনার হাত ধরে তাকে নিয়ে তৃতীয় দরজাটার আরেক পাশে চলে এল কিশোর, তাদেরকে অনুসরণ করল অন্য দু'জন।

গাঢ় অন্ধকার। দৃষ্টি পুরোপুরি অচল। অনুমানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল ওরা। নানারকম জিনিস হাতে ঠেকছে, পায়ে ঠেকছে। নরম একটা কিছু হাতে ঠেকল মুসার, চাপ দিয়ে বুঝল সোফা।

অবশেষে অন্ধকারে চিড় ধরল, আলোর সূক্ষ্ম একটা চুল দেখা গেল, দরজার ফাঁক দিয়ে আসছে। জিনার হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, মসৃণ পাল্লায় হাত বোলাল। হাতে নব ঠেকতেই মোচড় দিল আস্তে করে। নিঃশব্দে ঘুরে গেল নব। টেনে পাল্লাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করল সে।

চোখে পড়ল খিলানে ঢাকা আলোকিত পথ, তার ওপারে বিরাট এক হলঘর।

'বৈঠক শুরু করা যায়,' কানে এল ভ্যারাডের পরিচিত খসখসে কণ্ঠ।

দরজা আরও কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করল কিশোর। অন্য তিনজনও এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। সবারই নজর হলঘরে। রূপার মোমদানীতে জ্বলছে লম্বা কালো কালো মোম। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা গোল টেবিল, কালো কাপড়ে ঢাকা। টেবিল ঘিরে বারোটা চেয়ার, প্রতিটি চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়েছে একজন করে। ভ্যারাডের সামনের চেয়ারটাকে ছোটখাট একটা সিংহাসন বলা চলে, হাতল দুটো কাঠের তৈরি দুটো কালো গোখরো, ফণা উঁচিয়ে রেখেছে। তার পাশে জিনার খালা। বিষণ্ন, নিষ্প্রাণ চাহনি।

সদস্যরা সব নীরব, নিথর, অথচ ঘরের সর্বত্র যেন নড়াচড়ার আভাস! কিশোরের মনে হলো, মানুষগুলোকে ঘিরে নাচছে অন্ধকারের কালো চাদর, হাসছে বিকট হাসি, নীরবে। চারদিকে শুধু কালো আর কালো। দেয়াল ঢাকা কালো কাপড়ে, দরজা-জানালায় কালো পর্দা। এ-যেন কালোর রাজত্ব!

নড়েচড়ে দাঁড়াল ভ্যারাড, এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর বদল করছে। 'বৈঠক শুরু করা যায়,' সেই একই কথা, একই কণ্ঠ।

খিলানে ঢাকা পথের এক পাশ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে, তাতে পায়ের শব্দ হলো। লম্বা আলখেল্লা পরা একটা কালো মূর্তি নেমে এল, হালকা পায়ে গিয়ে দাঁড়াল টেবিলের ধারে। সাপ-সিংহাসনে বসল সে এদিকে ফিরে।

'ইয়াল্লা!' বিড়বিড় করল মুসা, ভীষণ চমকে গেছে।

চমকে দেয়ার মতই চেহারা আগন্তুকের। ভ্যারাডের চেহারা আর কি এমন ফ্যাকাসে! এই লোকটাকে দেখে মনে হলো, গায়ে এক বিন্দু রক্ত নেই। কবর থেকে উঠে এসেছে যেন একটা লাশ। সারা গা কালো কাপড়ে ঢাকা, এমনকি মাথার চুলও কালো টুপি দিয়ে ঢেকে রেখেছে, সার্জনদের টুপির মত আঁটসাঁট টুপি। মোমের চেহারা যেন, তাতে টকটকে লাল দুটো চোখ।

মোম-শাদা হাত দিয়ে টুপিটা আধ ইঞ্চিমত পেছনে সরাল লোকটা, মাথা একটুখানি নুইয়ে সালাম জানাল।

একে একে যার যার চেয়ারে বসে পড়ল সদস্যরা।

দু'বার হাততালি দিল আগন্তুক।

টেবিলের কাছ থেকে নিঃশব্দে যেন উড়ে চলে গেল ভ্যারাড, ফিরে এল হাতে ট্রে নিয়ে। তাতে একটা রূপার বড় কাপ, ট্রে-সহ কাপটা বাড়িয়ে দিল সে সিংহাসনে বসা লোকটার দিকে।

'বীলিয়াল আমাদের সহায় হোন!' বলে কাপ তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল লোকটা।

'মোলক শুনছেন সব!' জবাবে সুর করে জারিগান গেয়ে উঠল যেন বারোটা কণ্ঠ।

কাপটা মিস মারভেলের হাতে তুলে দিল কালো আলখেল্লা। 'বীলিয়াল সবার মঙ্গল করুন!' গলা কাঁপছে মিস মারভেলের, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। কাপে চুমুক দিয়ে সেটা তুলে দিল পাশের লোকের হাতে।

হাতে হাতে ঘুরতে থাকল কাপ, বীলিয়ালের জয়ধ্বনিতে ভরে উঠল ঘর। বার বার সুর করে জারি গান গেয়ে, 'মোলক যে সব শুনছেন' সেটা ঘোষণা করল সদস্যরা। কাপটা আবার ফিরে এল কালো আলখেল্লার হাতে, সে রেখে দিল ভ্যারাডের ট্রেতে।

কয়লা রাখার চার পা-ওয়ালা ছোট একটা তাওয়া নিয়ে এল ভ্যারাড, টেবিলে রাখল কালো টুপির সামনে। তাওয়ায় জ্বলন্ত কয়লা। উঠে দাঁড়িয়ে কয়লার ওপরে হাত ছড়াল লোকটা, চেঁচিয়ে বলল, 'অ্যাসমোডিউস, অ্যাবাডন, ইবলিস, দয়া করে আমাদের দিকে তাকান!'

রূপার একটা ডিশ এনে দিল ভ্যারাড। ওটা থেকে কি যেন খানিকটা নিয়ে জ্বলন্ত কয়লায় ছিটাল কালো পোশাক পরা লোকটা, প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ঘন ধোঁয়া, বাতাসে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল মিষ্টি একটা গন্ধ।

'বীলিয়াল শুনছেন!' মিনতিভরা কণ্ঠ লোকটার, 'মহাসর্পের শক্তিকে পাঠান আমাদেরকে পাহারা দিতে! দেখা দিন দয়া করে! শোনান আপনার মিষ্টি গলা!'

চুপ হয়ে গেল লোকটা। চুপ হয়ে গেল অন্যেরাও। স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে।

আস্তে আস্তে কানে এল শব্দটা, সেই বিচ্ছিরি গানের শুরু!

এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়াল জিনা, পালাবে, খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। ফেরাল।

বাড়ছে শব্দ। বাড়ছে, আরও বাড়ছে, মাংস চিরে ঢুকে যাচ্ছে যেন শব্দের ফলা, হাড় ভেদ করে মজ্জায় ঢুকতে চাইছে!

আবার রূপার ডিশ থেকে খানিকটা জিনিস তুলে নিয়ে কয়লায় ছিটাল লোকটা। ভক্‌ করে লাফিয়ে উঠল আবার ঘন ধোঁয়ার স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় কি যেন নড়ছে!

অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল রবিনের গলা থেকে, তার টুঁটি টিপে ধরেছে যেন কেউ।

'বীলিয়াল দয়া করেছেন আমাদের!' কালো টুপির গলায় আনন্দ। 'অমর মহাসর্প দেখা দিয়েছেন!'

মানুষগুলো যেন সব পাথর হয়ে গেছে, দৃষ্টি ধোঁয়ার স্তম্ভের মাথায় স্থির। মস্ত এক গোখরো সাপ দেখা যাচ্ছে, নীলচে-সবুজ রঙ, ছড়ানো ফণা, টকটকে লাল

চোখ জ্বলছে!

বেড়েই চলেছে শব্দ। কানের পর্দা ফুঁড়ে মগজে ঢুকে যাবে যেন। আর সইতে না পেরে কানে আঙুল দিল কিশোর। হঠাৎ করেই কমতে শুরু করল তীক্ষ্ণ আওয়াজ, পাতলা হয়ে এসেছে ধোঁয়ার স্তম্ভ, মিলিয়ে যাচ্ছে সাপটা। থেমে গেল গান। 'মহাসর্পও' গায়েব।

ধপ করে সিংহাসনে বসে পড়ল কালো পোশাক পরা লোকটা। 'মঙ্গল হোক আমাদের। আসুন, হাত মেলাই।'

হাত বাড়িয়ে দিল মিস মারভেল, বোধহয় লোকটার হাতেই রাখতে চাইল, কিন্তু ভুলে পড়ল টেবিলে। হাতটা তুলে নিল লোকটা।

মুসার গায়ে কনুইয়ের খোঁচা লাগাল কিশোর। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, পরক্ষণেই নেমে এল একটা মূর্তি, ছেলেদের দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। পেশীবহুল লোকটাকে দেখেই চিনল মুসা, সেদিন দেয়াল থেকে সে পড়ে যাওয়ার পর ওই লোকটাই এসে ধরেছিল তাকে। গার্ড। চুপ করে দাঁড়িয়ে হলের দৃশ্য দেখল, এক মুহূর্ত দ্বিধা করে পায়ে পায়ে এগোল টেবিলের দিকে। সিংহাসনে বসা লোকটার কানে কানে কি বলল।

'অসম্ভব!' বলে উঠল লোকটা। 'আমরা সবাই হাজির এখানে!'

'তেরোজন হওয়ার কথা,' গার্ড বলল। 'মিস গ্যানারিল, মিস মারভেল আর মিস্টার ভ্যারাড একসঙ্গে ঢুকেছেন। এগারোবার গেট খুলেছি আমি, তারমানে অন্তত আরও একজন এখানে থাকার কথা।'

উঠে দাঁড়াল কালো টুপি। 'তারমানে ফাঁকি দিয়ে ঢুকেছে কেউ! বৈঠক বাতিল! সময় করে আবার ডাকব আপনাদের, এখন যার যার বাড়ি যান।'

আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর।

'ব্যাটারা টের পেয়ে গেছে!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

হলরুমে চেয়ার টানা-হেঁচড়ার শব্দ, কথা বলছে সবাই।

'ব্যাটা সাংঘাতিক হুঁশিয়ার!' কিশোর বলল। 'ঠিক সন্দেহ করে বসেছে!'

'চলো পালাই!' তাড়া দিল রবিন। 'খোঁজা শুরু করবে এখুনি?'

'তোমরা যাও,' কিশোর বলল।

'এটা মজা করার সময়?'

'মজা করছি না,' গলা আরও খাদে নামাল কিশোর। 'যেদিক দিয়ে ঢুকেছ, ওদিক দিয়ে বেরোবে। বেরোনোর সময় ইচ্ছে করেই শব্দ করবে। তারপর দেয়ালে চড়ে বসে দেবে অ্যালার্ম বাজিয়ে। ওদের বোঝাবে, ফাঁকি দিয়ে যে ঢুকেছিল, সে পালিয়েছে। ট্রাক নিয়ে চলে যাবে। সানসেট অ্যাণ্ড টরেনটিতে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। ঠিক আছে?'

কিশোরকে সাবধানে থাকতে অনুরোধ করে অন্য দু'জনের সঙ্গে চলে গেল রবিন।

রান্নাঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ হলো, বাইরে গার্ডরা হৈ-চৈ করে উঠল। জিনার চিৎকার শোনা গেল হঠাৎ, তারপরই বেজে উঠল ঘন্টা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। ধীরে ধীরে থেমে এল গোলমাল, হৈ-চৈ।

বাইরে নীরবতা, ঘরও নীরব। আস্তে করে আবার দরজাটা খুলে হলে উঁকি দিল সে। নির্জন। এক ছুটে খিলানে ঢাকা পথ পেরিয়ে হলে ঢুকল এসে, দেয়াল-ঢাকা একটা কালো কাপড়ের তলায় লুকিয়ে পড়ল। বাইরে পায়ের আওয়াজ, ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ হলো জোরে।

'কটা ছেলে,' বলল একটা কণ্ঠ, কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

'ওদের কৌতূহল মিটিয়ে দেয়া উচিত ছিল তোমার, রড,' কালো আলখেল্লা পরা লোকটার গলা। 'যাতে কোন সন্দেহ না থাকে ওদের মনে। সব ক'টা বেরিয়ে গেছে তো?'

'হ্যাঁ।'

কাপড়ের আড়ালে থেকে হাসি পেল কিশোরের। গেছে, তবে সবাই নয়, মিয়া শয়তানের চেলা—মনে মনে বলল সে, একজন রয়ে গেছে। সে এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, কি নিয়ে কি কারণে শয়তানী শুরু করেছ তোমরা!

পনেরো

ছোট্ট একটা ফুটো দেখতে পেল কিশোর কালো কাপড়ে, ওটাতে আঙুল ঢুকিয়ে অতি সাবধানে ছিঁড়ে বড় করতে শুরু করল। ফুটোটা বড় হতেই তাতে চোখ রেখে দেখল, দরজার কাছে একটা সুইচে আঙুল রাখছে গার্ড। রড। ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, মাথার ওপরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো।

শঙ্কিত হলো কিশোর। মোমের আলোয় কাটেনি ঘরের অন্ধকার যেখানে যেখানে আলো পড়েছিল, সেখানেও ছিল ছায়ার নাচন, ফলে তার লুকিয়ে থাকা চোখে পড়েনি কারও। কিন্তু এখন? উজ্জ্বল আলোয় চোখে পড়ে যাবে না ওদের? গোল টেবিলে ধুলো দেখতে পাচ্ছে এখন সে পরিষ্কার, দেয়াল ঢাকা দেয়ার কাপড় পুরানো, মলিন, একেবারেই বাজে, কমদামী জিনিস। রূপার মোমদানীগুলো আরও পুরানো, ঘসেমেজে চকচকে করা হয়েছে।

ঘর আর আসবাবপত্রের চেয়ে শোচনীয় লোক দুটোর অবস্থা। ধূসর চুলওয়ালা গার্ড ফুঁ দিয়ে দিয়ে নেভাচ্ছে মোমগুলো। মুখের চামড়ায় গভীর ভাঁজ, চোখের কোণ থেকে শুরু করে ঠোঁটের কোণে এসে শেষ হয়েছে। মেদ জমেছে শরীরে, চলাফেরা ভারি, থুতনির নিচটা ঝুলে পড়েছে।

সিংহাসনে বসে আস্তে আস্তে সাপের মাথায় টোকা দিচ্ছে কালো আলখেল্লাধারী, চিন্তিত। চেয়ার পেছনে ঠেলে পা তুলে দিল টেবিলে। উজ্জ্বল আলোয় তার চেহারা আর তেমন রক্তশূন্য লাগছে না। আলগা রঙ, বুঝল কিশোর। শাদাটে-সবুজ কোন পাউডার মেখেছে মুখের ভাঁজ আর নাকের দু'পাশে।

'টেলিফোন সিসটেম একেবারে ফেল মারল!' হঠাৎ বলল লোকটা।

শেষ মোমটা নিভিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল রড। 'দেখো, আমি গিয়ে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম, কে আসছে কে যাচ্ছে, ভাল মত খেয়াল রাখতে পারতাম। কিন্তু তাতেও কিছু হত না। বাচ্চাদেরকে ঠেকানো শয়তানের অসাধ্য, আর আমি তো মানুষ। কোন না কোনভাবে ঢুকে পড়তই ওরা। মনে হচ্ছে,

তল্পি গোটানোর সময় এসে গেছে। চলো, কেটে পড়ি। স্যান ফ্র্যানসিসকো কিংবা স্যান ডিয়েগো কিংবা শিকাগোতে গিয়ে আবার নতুন খেল শুরু করা যাবে। অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার আগেই চলো কাটি। এখানে তোমার ডক্টর জিহাভোগিরি আর বেশিদিন চলবে না।'

'কিন্তু রড, এখনও অনেক আসা বাকি,' এক টানে মাথার কালো টুপিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল ডক্টর জিহাভো। মাথায় আগুন-লাল চুল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে ঘষতে শুরু করল লোকটা। মুখের সবজে পাউডার ঝরে যেতেই বেরিয়ে পড়ল লাল চামড়া।

কষ্টে হাসি চাপল কিশোর।.

'এখানে না ফেললে চলত না?' বিরক্ত মুখে বলল রড। 'ঝাড়বে কে ওগুলো?'

'ভাবছি,' রুমালটা মুঠোয় দলা পাকাচ্ছে জিহাভো, 'আরও কিছু দিন দেখা দরকার। পুরো সেট আপটা ঠিক করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। গরুগুলোকে খুঁজে বের করতে কম কষ্ট করেছি? ওই নাপতানিটা, গ্যানারিল, ওর কাছে থেকে বেশ কিছু পাওয়া গেছে, তাকে এখন বাদ দিলেও চলে। আর ওই কনট্রাকটার ব্যাটার কাছ থেকেও প্রচুর পাওয়া গেছে। মিস মারভেল এখনও কিছু দেয়নি, তবে দেবে শিগগিরই। এত ভাল ব্যবসা কয়েকটা বাচ্চার ভয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে পালাব?'

'ভাল ব্যবসাটা কতদিন ভাল থাকব, ভাবছি!'

'ঠিকমত চালানো গেলে থাকবে আরও অনেক দিন,' হাসল জিহাভো। 'শুধু জানতে হবে কিভাবে কি করা দরকার। ওই রলির কথাই ধরো। চমৎকার দেখিয়েছে। অচল করে দিল অ্যানি পলকে, কেউ কিচ্ছু সন্দেহ করতে পারল না। মিস মারভেলের ভাবগতিক দেখেছ আজকে?'

'ভয় পেয়েছে।'

'মূর্ছা যেতে বাকি রেখেছে। দাবি পূরণ না করলে সেটাও যাওয়াব। তবে, রাসলারকে ভয় পাওয়ানো কঠিনই হবে। ওর ব্যাপারে কিছু একটা করতেই হচ্ছে।'

নাক দিয়ে ছোঁক ছোঁক শব্দ করল রড। 'ও-ব্যাটার কাজটা করে দিলেই তো হয়ে যায়। রাস্তার ওপারের রেস্তোরাঁর মালিককে কোনভাবে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিলে সব কাস্টোমার আসবে রাসলারের ওখানে।'

'ভুল করছ। শুধু টাকাই চায় না রাসলার, ক্ষমতাও চায়। সেটা কি করে দেব তাকে?'

'আমি কি জানি!' হাত ওল্টাল রড।

'তোমাকে জানতে বলছিও না,' বার বার দু'হাতের আঙুলের মাথা এক করছে, আর সরিয়ে আনছে জিহাভো। 'কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। দরকার পড়লে...,' হাই তুলল। 'যাকগে, যখনকারটা তখন ভাবা যাবে। ঘুম পেয়েছে।' উঠে দরজার দিকে রওনা দিল সে।

'টুপি ফেলে যাচ্ছ,' মনে করিয়ে দিল রড।

'থাকগে, সকালে তুলে নেব,' বেরিয়ে গেল জিহাভো। সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।

বিড়বিড় করে গাল দিল রড, কাকে বোঝা গেল না। চেয়ার ঠেলে উঠে দরজার দিকে রওনা দিল। সুইচ টিপে আলো নেভাল।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনল কিশোর, বোধহয় জিহাভোকে অনুসরণ করেছে রড। দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো। পানির পাইপে পানি পড়তে শুরু করল বাড়ির পেছনে কোথাও।

কাপড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে অনুমানে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল কিশোর, যে পথে ঢুকেছিল, সে পথ ধরে আবার ফিরে এল প্রথম হলঘরটায়। রান্নাঘরের দরজা খোলাই রয়েছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেটের দিকে চলল সে। ফিরে তাকাল একবার, ওপর তলায় কয়েকটা জানালায় আলো। একটা পর্দায় মানুষের ছায়া পড়েছে। হাসল কিশোর। ডক্টর জিহাভো মুখ ওপর দিকে তুলে ধরেছে, কুলকুচা করছে বোধহয়। ইস্, এই মুহূর্তে যদি ওর একটা ছবি তোলা যেত!

গেটের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। চাঁদের আলো বিচিত্র আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে আইভি লতার ঝাড়ে, এরই কোন একটা ফাঁকে রয়েছে খোপ, তাতে সুইচ। অনুমানে একটা ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিল সে, পয়লা বারেই হাত লাগাল সুইচে। সুইচ মানে প্লাস্টিকের একটা লীভার। চাপ দিতে গিয়েও থেমে গেল। ঘণ্টা বেজে উঠবে না তো? কিন্তু উঠলেও কিছু করার নেই। কাঁপা হাতে চাপ দিল। ঘণ্টা বাজল না, আলো জ্বলল না। গুঞ্জন তুলে খুলতে শুরু করল পাল্লা। ঠিক এই সময় দপ করে জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট।

'এই! এই ছেলে! দাঁড়াও!' চিৎকার শোনা গেল দোতলা থেকে।

ফিরেও তাকাল না কিশোর, গলা শুনেই বুঝতে পেরেছে, রড। গেটের দিকে লাফ দিল সে।

'দাঁড়াও!' আবার ধমকে উঠল রড।

দাঁড়াল না কিশোর, এক লাফে গেট পেরিয়ে এল। গায়ের ওপর এসে পড়ল ভারি একটা শরীর, তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। ভ্রাম্‌ম্ করে বিকট শব্দ হলো, মাথার ওপর দিয়ে শাঁ করে উড়ে গেল কিছু।

ওঠার চেষ্টা করল কিশোর।

কানের কাছে ধমক দিল কেউ, 'চুপ! নোড়ো না!'

আবার গর্জে উঠল শটগান, শাঁ শাঁ করে উড়ে গেল ছড়রা, প্রায় কান ঘেঁষে।

কিশোরকে চেপে ধরে রেখেছে লোকটা। দ্বিতীয় গুলি হওয়ার পরই ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দৌড় দাও!'

লাফিয়ে উঠে মাথা নিচু করে করবীর ঝোপের দিকে ছুটল লোকটা। কিশোরও দৌড় দিল তার পেছনে। ঝোপ পেরিয়ে ঘুরে এসে রাস্তায় পড়ল দু'জনে।

'থেমো না!' কিশোরকে হুঁশিয়ার করেই মোড় নিয়ে আরেক দিকে ছুটল লোকটা।

থামল না কিশোর। পা কাঁপছে, বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।

সানসেট অ্যাণ্ড টরেনটি রোডের মোড়ে অপেক্ষা করছে পিকআপ। কিশোরকে দেখেই জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল বোরিস। 'হোকে (ও কে)?'

কোন মতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। পিকআপের পেছনে তাকে টেনে তুলল

মুসা আর রবিন। গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস।

'কি হয়েছে?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

চুপ করে বসে জিরিয়ে নিল কিশোর। 'গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল গোঁফওয়ালা।'

'ফোর্ড?'

'হ্যাঁ। ওকে ধন্যবাদ জানানোরও সময় পাইনি।'

'কেন?'

'ফোর্ড না থাকলে ঝাঁজরা হয়ে পড়ে থাকতাম এখন মাথা ঠিক রাখতে পারেনি রড। ব্যাটার একটা ডবল ব্যারেল শটগান আছে. গুলি করে বসেছিল।'

ষোলো

'ডাইনীবিদ্যা,' ঘোষণা করল রবিন।

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা মোটা বই নিয়ে এসেছে রবিন। তার একটা ঃ উইচ ক্র্যাফট, ফোক মেডিসিন অ্যাণ্ড ম্যাজিক। বইটাতে টোকা দিল সে। 'হয়তো এটা থেকেই তথ্য জোগাড় করেছে ওরা, অন্য কোন বইও হতে পারে অবশ্য। সেটা কথা না, কথা হলো, ওরা ডাইনীবিদ্যা নিয়ে চর্চা করছে। একেক দেশে এর একেক নাম। ইংরেজরা বলে ব্ল্যাক ম্যাজিক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লোকেরা বলে ভুডু, ইণ্ডিয়ানরা বলে প্রেতসাধনা কিংবা কালিসাধনা। যে যাই বলুক, সোজা কথা, শয়তানের পুজো করে ওরা, কালো পথে ক্ষমতার অধিকারী হতে চায়। আমাদের টরেনটি ক্যানিয়নের জনাবরাও এই কাজই করছে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারছে বলে মনে হয় না।'

'বলির পাঁঠারা বিশ্বাস করছে না বলে?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করছে না বলে,' সায় দিল রবিন।

'তোমাদের কথা কিচ্ছু বুঝছি না আমি,' অনুযোগ করল মুসা। 'দয়া করে খুলে বলবে?'

'খুব সহজ,' উইচক্র্যাফটের ওপর লেখা বইটা তুলে দেখাল রবিন. 'এতে সব লেখা আছে। রুকসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নরবিজ্ঞানের প্রফেসর ডক্টর জন এ. স্মিথের লেখা। ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে গবেষণা করার জন্যে অনেক দেশে ঘুরেছেন তিনি, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মেকসিকো, অস্ট্রেলিয়া, কোথাও বাদ রাখেননি। ওঝাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তিনি দেখেছেন, যারা ভুডুর চর্চা করে, তারা কাউকে মারতে চাইলে ওই লোকের নাম করে একটা পুতুলের গায়ে পিন বিঁধিয়ে দেয়। তারা বলে, পুতুলের যেখানে পিন বেঁধানো হলো, মানুষটাও ঠিক ওখানেই ব্যথা পাবে। পুতুলের বুকে পিন বেঁধাল, মানুষটারও বুকে বিঁধবে, ফলে মারা যাবে সে। মেকসিকোতে প্রেতপূজারিরা গিয়ে ঢোকে কোন অন্ধকার গুহায়, মোম জ্বেলে মন্ত্র পড়ে। তারপর একটা বিশেষ সুতা কেটে দু'টুকরো করে ফেলে। তারমানে, কোন একজন মানুষের আয়ু কমিয়ে দিল। লোকটা যখন জানতে পারে তার নাম করে সুতো কেটেছে ওঝা, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তারপর মরে যায়।'

'বুঝলাম না,' মুসা বলল।

'মানে, মানুষটা ওঝার কথায় বিশ্বাস করে,' বুঝিয়ে দিল কিশোর, 'ভয় পেয়ে যায়। ফলে অসুস্থ হয়ে মারা পড়ে সে।'

'শুধু বিশ্বাসেই এত মারাত্মক কাণ্ড ঘটে?' ফেকাসে হয়ে গেছে মুসার চেহারা।

'আন্তরিকভাবে যদি কোন কথা বিশ্বাস করো, সেটা ঘটতে বাধ্য,' আবার বইটাতে টোকা দিল রবিন, 'প্রফেসর ব্যারিস্টার তাই বলেছেন। তিনি দেখেছেন, ওঝা ঘোষণা করার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে মানুষটা, মারা গেছে কয়েক দিন পর। প্রফেসরের ধারণা ঃ মন্ত্রফন্ত্র সব বাজে কথা! তীব্র আতঙ্কই কাহিল করে করে মেরে ফেলেছে লোকটাকে।'

'হুঁমম! বুঝলাম!' মাথা দোলাল মুসা। 'ভ্যারাড আর জিহাভোও একই কাণ্ড করছে! ব্যাটারা পুতুল কিংবা সুতো বাদ দিয়ে সাপ ব্যবহার করছে। যার ক্ষতি করতে চায়, তার কাছে জাদুর সাপ পাঠাচ্ছে!'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'কিন্তু জাদুর জ-ও জানে না ব্যাটারা। তাছাড়া যাদের কাছে পাঠাচ্ছে, তারাও বিশ্বাস করছে না, ভয়ও পাচ্ছে না। মিস অ্যানি পল বিশ্বাস করেননি। তাঁর কাছে ওটা স্রেফ একটা শস্তা অদ্ভুত ব্রেসলেট। জিনার খালাই শুধু বিশ্বাস করে কেঁদে কেটে মরছেন, তাঁর ধারণা, সাপই বুঝি অ্যাকসিডেন্টটা ঘটাল। ফলে নিজেকে দোষ দিচ্ছেন। খুব স্বাভাবিক। তাঁর মত মহিলা এই-ই তো করবেন।

'কিন্তু আমরা জানি, সাপের জন্যে হয়নি অ্যাকসিডেন্ট। জিহাভো কাউকে দিয়ে চাকার নাট ঢিল করিয়ে রেখেছে, ফলে খুলে এসেছে চাকাটা। অ্যাকসিডেন্ট করেছেন মিস পল।'

'এখন হাসলারের সুবিধের জন্যে অন্য কারও ক্ষতি করার প্ল্যান করছে জিহাভো!' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি।

কপাল ডলল কিশোর। 'ওই রকমই কিছু করবে মনে হলো ওদের কথা শুনে।'

'পাগলামি! স্রেফ পাগলামি!' বলে উঠল মুসা।

'আমাদের কাছে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু মিস মারভেল? তিনি তো বিশ্বাস করে বসে আছেন, মহাসর্প তাঁকে র‍্যামন ক্যাসটিলোর ক্রিস্টাল বল পাইয়ে দেবে। মিস গ্যানারিলের বাড়িওলির সঙ্গে গোলমাল চলছিল, সেটাও নাকি মিটমাট করে দিয়েছে মহাসর্প।'

'হাসলার চাইছে ক্ষমতা। যে যা চাইছে, টাকার বিনিময়ে তাকে তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে জিহাভো। কিছু "কেরামতি" দেখিয়েছেও সে।'

'কিন্তু ফোর্ডের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না! সে কি চায়?'

'ওরও হয়তো, টাকা,' রবিন অনুমান করল। 'তবে ব্ল্যাকমেলার হোক, আর যা-ই হোক ওর কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। তোমাকে বাঁচিয়েছে।'

'তা রয়েছি। কিন্তু লোকটা চায় কি সত্যি সত্যি?'

'বড় একটা রহস্য!' গলা চুলকাল রবিন। 'তবে তথাকথিত শয়তান উপাসকদের উদ্দেশ্য জানা গেছে। ওরা একদল ঠকবাজ, বোকাদেরকে ঠকিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। তো, এখন কি করব আমরা?'

'পুলিশকে জানাব,' পরামর্শ দিলো মুসা।

'বিশ্বাস করবে পুলিশ?' কিশোর বলল।
'কেন করবে না? মিস পলের অ্যাকসিডেন্ট তো মিথ্যে নয়।'
'অ্যাকসিডেন্ট? গাড়ির চাকা খুলে গেছে, অমন তো খুলতেই পারে। টরেনটি ক্যানিয়নে পুলিশকে নিয়ে যেতে পারি হয়তো। কিন্তু গিয়ে কি পাবে? দুজন মানুষ, আর কিছু কালো মোমবাতি। না, এখনও পুলিশকে বলার সময় আসেনি। প্রমাণ দরকার।'
'ভ্যারাড প্রমাণ নয়?' রবিন বলল। 'মিস মারভেলকে কিছু একটার জন্যে চাপাচাপি করছে না সে?'
'ভ্যারাড কি স্বীকার করবে সে কথা? না মিস মারভেল তার বিপক্ষে বলবেন? ঠোঁটে তালা এঁটে থাকবেন তিনি।'
'কিন্তু ব্যাটারা কি চাইছে তাঁর কাছে?' মুসার প্রশ্ন।
'টাকা নয়, অন্য কিছু। বোধহয় নেকলেসটার ওপর চোখ পড়েছে ব্যাটাদের।'
'কিন্তু ওটা পাচ্ছে না ওরা। ফন হেনরিখের ভল্টে···,' কথা শেষ করতে পারল না রবিন, বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল।
'কিশোর! কিশোর পাশা!' ট্রেলারের ছাতের ভেন্টিলেটার দিয়ে ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।
'জিনা!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর।
এক টানে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা তুলে ফেলল মুসা। 'নিশ্চয় কোন বিপদ!'
পাইপের ভেতর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারল, ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল ছেলেরা। ছুটল।
ছোট অফিসটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। কাঁদো কাঁদো ভাব। এক গালে লাল একটা দাগ। বলল, 'ডক্টর জিংহাভো! আমাদের বাড়িতে!'
শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'ও-ই মেরেছে?'
'কী!' মুসার দিকে ফিরল জিনা।
'গালে লাল দাগ। চড় মেরেছে বুঝি?'
পেছনে চুল সরাল জিনা। 'না, খালা।'
'দূর, কি বলছ! তোমার খালা মেরেছেন?'
'মারতে চায়নি! খুব ভয় পেয়ে গেছে, তাই। জানালা দিয়ে দেখল, কালো একটা গাড়ি ঢুকছে। গাড়িবারান্দায় থামল গাড়িটা, কালো আলখেল্লা আর টুপি পরা জিহাভো নামল। গার্ড ছুঁচোটা শোফার সেজেছে। আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল খালা। মানা করে দিলাম। রেগে গিয়ে চড় মারল আমাকে খালা, ঠেলে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দরজা লাগিয়ে দিল। এই সময় সামনের দরজায় বেল বাজল,' বিষণ্ণ হাসি হাসল জিনা।
'এখন তো পুলিশের কাছে যাওয়া যায়?' কিশোরের দিকে ফিরল মুসা।
'না, যায় না,' জবাবটা দিল জিনা, 'সময় নেই। বুঝতে পারছ না, তিনটে শয়তানের সঙ্গে বাড়িতে একা খালা। ওরা যা খুশি করতে পারে।'
'চলো, তোমাদের বাড়িতেই যাই!' ব্যস্ত হয়ে বলল কিশোর, 'জলদি!'
চারজন দৌড় দিলো একই সঙ্গে। কিন্তু তবুও দেরি হয়ে গেল। দেখল, গেট

দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কালো গাড়িটা। গাড়ি চালাচ্ছে রড, তার পাশে ভ্যারাড। জিহাভো পেছনের সিটে।

সদর দরজার তালা খোলা। এত জোরে ধাক্কা মারল জিনা, ধ্রাম্‌ম্‌ করে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেলো পাল্লা। 'খালা! খালাআ!' চেঁচিয়ে ডাকল সে।

সোনালি-সবুজ বসার ঘরে গুম হয়ে বসে আছে মিস মারভেল। দেখেই বলে উঠল, 'জিনা, জিনা, কিছু মনে করিস না, মা! আমার মাথার ঠিক ছিল না!'

ছুটে গেল জিনা। 'তোমার কিছু হয়নি তো, খালা!'

'না, আমি ঠিক আছি,' থিরথির করে গলা কাঁপছে মিস মারভেলের। চিবুকে চোখের পানি শুকিয়ে দাগ লেগে আছে। 'মিস্টার ভ্যারাড, আর···আর···'

'ডক্টর জিহাভো?' বলল কিশোর।

অন্ধের মত দুহাত বাড়িয়ে এগোল মিস মারভেল, একটা চেয়ার হাতে ঠেকতেই তাতে বসে পড়ল।

'নেকলেসটা চায় ওরা?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর। 'নকলটা দিয়ে দিয়েছেন তো?'

স্থির দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে চেয়ে রইল মিস মারভেল, একে একে নজর দিল অন্য তিনজনের দিকে। 'তোমরা জানো?'

'জানি,' কিশোর জবাব দিল। 'আপনাকে শাসিয়েছে ওরা, খালা?'

আবার কেঁদে ফেলল মিস মারভেল। 'আরিব্বাপরে! কি সাংঘাতিক! সাংঘাতিক! বলল বিনিময়ে কিছু দিতেই হবে!' গাউনের পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। নাকের পানি মুছল। কিন্তু ফাঁকি দিতে পেরেছি ওদের। বুদ্ধিটা ঠিকই হয়েছে, না? নকলটা নিয়ে চলে গেছে ওরা, আসলটা নিরাপদ।'

'ফন হেনরিখের কাছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, তা হবে কেন? ও দুটোই দিয়ে গেছে। আসলটা এনেছিল সাধারণ কাগজে পোটলা করে। চট করে গাউনের পকেটে রেখে দিয়েছিলাম ওটা, তারপর সুযোগ বুঝে লুকিয়ে ফেলেছি।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল জিনা। 'তারমানে এই বাড়িতেই!'

'নিশ্চয়! আর কোথায় রাখব? তবে নিরাপদেই আছে। আমি বের করে না দিলে কেউ খুঁজে পাবে না। আর কাউকে বলিওনি।'

খালার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল জিনা। 'খুব ভাল করেছ, খালা। আমাদেরকেও বলার দরকার নেই। পুলিশকে জানাব?' খুব নরম গলায় বলল সে।

'না!'

'এখন প্রমাণ রয়েছে আমাদের হাতে,' কিশোর বলল। 'পুলিশকে বলতে পারবেন, নেকলেসের জন্যে ওরা আপনাকে চাপ দিয়েছে, না দিলে ক্ষতি করবে বলে হুমকি দিয়েছে।'

'না!'

'খালা, ওরা ভয়ানক লোক। লস অ্যাঞ্জেলেসেই ওদের শয়তানী শেষ নয়, অন্য জায়গায় গিয়েও করবে। তার আগেই পুলিশকে বলা দরকার। নইলে আরও অনেকের সর্বনাশ করবে।'

'কিন্তু কি করে বলি! আমার দোষে এক বেচারী পা ভেঙে শুয়ে আছে! না না, আমি বলতে পারব না! তোমরা জানো না, বললে কি হবে!'

'বেশ, অন্য ভাবে ভেবে দেখুন,' কিশোর বলল। 'নেকলেসটা নকল, বুঝতে কত দিন লাগবে জিহাভোর? তারপর কি ঘটবে? কি করবে সে আপনাকে?' চুপ করে রইল মিস মারভেল।

'ভাবুন, খালা। নকল নেকলেস গছিয়ে ফাঁকি দিয়েছেন, বুঝতে বেশি সময় লাগবে না ওদের! তখন কি করবে?'

সতেরো

ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যেন মিস মারভেল। তাঁকে এখন আর কোন কথা বলে লাভ হবে না, বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

'মাথামোটা মেয়েমানুষ!' রাগে জ্বলছে মুসা।

'আহ্, ভদ্রভাবে কথা বলো, মুসা,' বিরক্তি ঝরল রবিনের গলায়। 'কেউ নিজের ভাল না বুঝলে, তাকে বোঝাতে যাবে কে?'

'এক কাজ করতে পারি আমরা,' কিশোর বলল। 'জিহাভোর প্ল্যান আমরা জানি, ও হাসলারের শত্রুকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে। খাবারের দোকানটা খুঁজে বের করে ওটার মালিককে সাবধান করে দিতে পারি।'

'বিশ্বাস করবে?' রবিন প্রশ্ন রাখল।

'হয়তো করবে না। কিন্তু একটা কার্ড দিয়ে বলতে পারি, দরকার মনে করলে যেন আমাদের ফোন করে। সাপটা এলেই কৌতূহল জাগবে তার। আমার ধারণা, তখন আমাদের ডাকবে সে।'

ইয়ার্ডে পৌঁছে সোজা অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে হাসলারের দোকানের নাম ঠিকানা বের করল কিশোর। বলল, 'হাসলার'স ফুড। বেভারলি অ্যাণ্ড থার্ড স্ট্রীট।'

'যাব কি করে?' ভুরু নাচাল রবিন। 'বোরিসকে বলবে?'

'নাহ্, বার বার ওকে বলা বোধহয় উচিত হবে না। তার চেয়ে বাসেই যাওয়া ভাল। হাসলারের শত্রুর দোকানটা সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ওই রাস্তায় শুধু দুটো খাবারের দোকান। কিন্তু তিন জনেরই যাওয়ার দরকার আছে কি? যদি জিনাদের বাড়িতে জিহাভো আসে আবার? আমি বরং এখানেই থাকি, কি বলো?'

'ইচ্ছে করলে তুমিও থাকতে পারো,' মুসা তাকাল রবিনের দিকে। 'কাজটা এমন কিছু না, আমি একাই গিয়ে সেরে আসতে পারব।'

সান্তা মনিকার বাস ধরল মুসা। সেখান থেকে গাড়ি বদল করে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসে চাপল। দুপুর নাগাদ এসে ঢুকল বেভারলি অ্যাণ্ড থার্ড স্ট্রীটে।

ঢুকেই হাসলারের দোকানটা চোখে পড়ল মুসার। বাস স্টপেজের উল্টো দিকে। দোকানের সঙ্গে দোকানের মালিকের হুবহু মিল রয়েছে। হাসলারের শার্টের মতই অপরিষ্কার তার দোকানের জানালা। গাড়ি রাখার জায়গাটায় ছেঁড়া খবরের কাগজের স্তূপ, মুসার সামনেই এক লোক একটা লেমোনেডের খালি বোতল

সেখানে ছুঁড়ে ফেলল। ভাঙা কাচের টুকরো, খাবারের খালি টিন, এটা ওটা নানারকম আবর্জনায় বোঝাই, যেন ডাস্টবিনের বদলে ব্যবহার হচ্ছে জায়গাটা।

পাশে তাকাল মুসা। একটা টেলিভিশন মেরামতের দোকান, তারপরে আরেকটা খাবারের দোকান। রঙ করা পরিষ্কার দেয়ালে পিতলের তৈরি ঝকঝকে হরফে বসানোঃ ডলফ টারনারস ফুড। কাচের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভেতরে বিশালদেহী এক লোক, কালো চুল, বাক্সে খাবার ভরছে। তার কাছেই এক মহিলা, ইয়া বড় ভুঁড়ি, লিস্ট মিলিয়ে নিচ্ছে। শাদা ফরমিকার কাউন্টারে একটা দাগ নেই, কাছে গেলে হয়তো দেখা যাবে, ধুলোও নেই এক কণা। আশপাশে আর কোন খাবারের দোকান চোখে পড়ল না।

হাসলারের শত্রুকে পাওয়া গেছে, বুঝল মুসা। মোটা মহিলা বেরিয়ে যাওয়ার পর সে গিয়ে ঢুকল। 'মিস্টার টারনার?'

'হ্যাঁ?' তাকাল কাউন্টারের ওপাশের বিশালদেহী লোকটা।

'আপনি মিস্টার টারনার? মানে, এই দোকানটা আপনার?'

মুসার দিকে চেয়ে রইল লোকটা এক মুহূর্ত। মুসাও তাকে দেখল ভাল করে। মস্ত শরীর, কিন্তু এক বিন্দু বাড়তি মেদ নেই। বাইরে থেকে যা মনে হচ্ছিল, চুল একেবারে কালো নয়, ধূসর একটা ছোঁয়া রয়েছে, বাদামী চোখের তারা স্থির, উজ্জ্বল, পরিষ্কার। দেখেই বোঝা যায়, শরীরের যত্ন নেয় টারনার। 'কাজ চাইছ, খোকা?' অবশেষে বলল সে। 'গত সপ্তায় একটা ছেলে নিয়ে ফেলেছি, তবু যদি চাও...'

'না না, চাকরির জন্যে আসিনি,' হাত তুলল মুসা। 'আমি শিওর হতে চাইছি, এটা আপনারই দোকান কিনা।'

'হুঁ! টোমাটোর আচার খারাপ পড়েছে? অসম্ভব...'

'...আমি ওসব কিছুই বলতে আসিনি! আপনিই মিস্টার টারনার তো?'

'হ্যাঁ, আমিই ডলফ টারনার, এ-দোকানের মালিক। কি চাও?'

'আপনাকে সাবধান করতে এসেছি, মিস্টার টারনার। কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাবে, হয়তো, কিন্তু অবিশ্বাস্য কাণ্ডই ঘটতে যাচ্ছে। ঠিক কি ঘটবে, এখনও জানি না, তবে খারাপ কিছু, সন্দেহ নেই।' তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে কাউন্টারে রাখল মুসা, হেডকোয়ার্টারের টেলিফোন নম্বর লিখল। কি ভেবে তার তলায় ইয়ার্ডের নম্বরটাও লিখল। 'যদি সাপ দেখেন...'

'...তো চিড়িয়াখানায় ফোন করব,' কথা শেষ করে দিল টারনার।

'আরে না না, ওই সাপের কথা বলছি না,' জ্যান্ত সাপ নয়। হয়তো পাথরের, রবারের, কিংবা ধাতুর। হয়তো সাপের চেহারার টাই-পিনও পাঠাতে পারে। তবে সাপটা হবে, গোখরো। যা-ই আসুক না কেন, সাপের চেহারা হলেই ফোন করবেন, সঙ্গে সঙ্গে, এই ওপরেরটায় প্রথমে করবেন, কেউ না ধরলে নিচেরটায়।'

কার্ডটা ছুঁলো না টারনার। থমথমে হয়ে গেছে চেহারা।

দোকানের মালিকের চেহারা দেখে অস্বস্তি বোধ করছে মুসা, তাড়াতাড়ি বলল, 'আশা করি, আপনাকে সাহায্য করতে পারব। খুব সাংঘাতিক ব্যাপার! কেউ একজন আপনার ক্ষতি করতে চায়। সাপ দেখলেই বুঝবেন, খারাপ কিছু ঘটতে

যাচ্ছে। আমাদেরকে ডাকবেন...'

'ভাগো!' হাত নাড়ল টারনার।

'বুঝতে পারছেন না, মিস্টার টারনার...'

'ভাগো বলছি!' বাদামী চোখ দুটো কঠিন।

'সাপটা দেখলে হয়তো মত বদলাবেন...,' টারনারকে কাউন্টার ঘুরে আসতে দেখে থেমে গেল মুসা, পিছিয়ে গেল এক পা এক পা করে। 'যে-কোন সময় ফোন করবেন, কোন...'

'এখনও দাঁড়িয়ে...,' টারনারের কথা শেষ হওয়ার আগেই এক টানে দরজা খুলে বেরিয়ে এল মুসা, রাস্তা পেরিয়ে একেবারে বাস স্টপেজে। বাস দাঁড়িয়েই আছে।

ভাবছে মুসা, সুবিধে করতে পারেনি সে। কিশোর হলে হয়তো অন্য রকম ঘটত। মানুষকে বোঝানোর ব্যাপারে ওস্তাদ কিশোর, অভিনয় করে, এভাবে সেভাবে কথা বলে কি করে জানি আজগুবী কথাও বিশ্বাস করিয়ে ফেলে মানুষকে! টারনারের ব্যাপারে মুসা যা পারেনি, কিশোর হয়তো পারত।

বিকেলের দিকে ইয়ার্ডে ফিরে এল মুসা। রবিন আর কিশোর আছে। কোথা থেকে জানি পুরানো একটা সূর্যঘড়ি কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা, ময়লা আর মাটিতে একাকার, হোস পাইপ দিয়ে পানি ছুঁড়ে সেটা ধুচ্ছে কিশোর।

কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। 'হাসলারের শত্রুর নাম ডলফ টারনার। কঠিন ঠাঁই!'

'হুঁশিয়ার করেছ?' জানতে চাইল রবিন।

'করতে চেয়েছি। কাউন্টারে কার্ডও ফেলে এসেছি, দরকার মনে করলে আমাদের ফোন করবে। দোকান থেকে বের করে দিল সে আমাকে, আরেকটু দাঁড়িয়ে থাকলে মেরেই বসত।'

'বিশ্বাস করেনি,' হোসের চাবি বন্ধ করে দিল কিশোর। 'জানতাম। কিন্তু সাপটা পেলেই অন্য রকম ভাববে। মানে, ভাবতে পারে।'

'ওর ফোনের অপেক্ষা না করাই ভাল,' রবিন বলল। 'চলো, পুলিশের কাছেই যাই। কেউ তার নিজের ভাল না বুঝতে চাইলে, আমরা কি করতে পারি?'

গেটে গাড়ির শব্দ হলো। তিনজনেই ফিরে তাকাল সেদিকে। পুলিশের গাড়ি ঢুকছে, একটা পেট্রোল কার। ড্রাইভিং সীটে লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের প্রধান, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।

'আমাদেরকে আর পর্বতের কাছে যেতে হলো না,' কিশোর বলল, 'পর্বতই চলে এসেছে!'

গাড়ি থেকে নামলেন ক্যাপ্টেন। 'এই যে, ছেলেরা, এবার কি নিয়ে মেতেছ?'

'আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে, স্যার?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'জুভেনাইল ডিভিশন ফোন করল। তোমাদেরকে চিনি কিনা, জিজ্ঞেস করল। বলে দিয়েছি, চিনি,' মুসার দিকে আঙুল তুললেন ফ্লেচার। 'টারনারের খাবারের দোকানে গিয়েছিলে।'

ঢোক গিলল গোয়েন্দা সহকারী।

'কার্ড আর ফোন নম্বর রেখে এসেছ,' আবার বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওরা ভাবছে,

তুমি টারনারকে হুমকি দিতে গিয়েছিলে।'

'হুমকি!' চমকে গেছে মুসা। 'হুমকি কে বলল! হুঁশিয়ার করতে গিয়েছিলাম।'

'টারনারের সেটা মনে হয়নি। ও ধরে নিয়েছে, হুমকি। খুলে বলবে?'

'আনন্দের সঙ্গে,' গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর, ভারি শব্দ ব্যবহার শুরু হলো তার।

'ফাইন,' বললেন ফ্লেচার। 'বলো।'

জিনা আর মিস মারভেলের কথা বাদ দিয়ে, এ-যাবৎ আর যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল কিশোর। শেষে বলল, 'আমাদের অনুমান, মিস্টার টারনার বিপদে পড়তে যাচ্ছেন। গান গাওয়া সাপের ক্ষমতা...'

'ব্যস ব্যস,' হাত তুললেন ফ্লেচার, 'হয়েছে। ওসব কথা বাদ। এটা লস অ্যাঞ্জেলেস, খুঁজলে অনেক পাগল পাবে। প্রায়ই অঘটন ঘটিয়ে বসে ওরা। এক এক করে যদি ধরতে শুরু করি, জেলে জায়গা দিতে পারব না। যাকগে, গিয়ে এখন তোমাদের জন্যে সাফাই গাইতে হবে আরকি জুভেনাইল পুলিশের কাছে। আমার একটা কথা শুনবে? ওভাবে আর কক্ষণো লোকের বাড়িতে চুরি করে ঢুকো না। নইলে সত্যি সত্যি একদিন গুলি খাবে।'

চলে গেলেন ক্যাপ্টেন।

মুসা বলল, 'মিস মারভেল আর নেকলেসটার কথা বললে না কেন?'

'কি করে বলি?' হাত নাড়ল কিশোর। 'হাজার হোক, জিনা আমাদের মক্কেল, তার খালার বদনাম ঢেকে রাখতে হবে আমাদের।'

অফিসে ফোন বাজল। কেউ নেই, কিশোরই এসে রিসিভার তুলল। কয়েক সেকেণ্ড পরই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল। 'জিনা! তার খালাকে সাপ পাঠানো হয়েছে! এইমাত্র!'

আঠারো

দরজায় দাঁড়িয়ে তিন গোয়েন্দার অপেক্ষা করছে জিনা, উত্তেজিত, হাতে একটা গোখরো। চমৎকার একটা শিল্পকর্ম, ধাতুর তৈরি, একেবারে জ্যান্ত মনে হয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, তবে ভেতর থেকে উঁচু করে রেখেছে ফণা, ছোবল মারতে প্রস্তুত। জিনা মূর্তিটা উঁচু করতেই চকমক করে উঠল সাপের দুটো লাল পাথরের চোখ।

'কে নিয়ে এসেছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

ছেলেদের আগে আগে বসার ঘরে এসে ঢুকল জিনা। মূর্তিটা কফির টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'জানি না। বেল বাজতেই গিয়ে দরজা খুললাম। দেখি, একটা বাক্স পড়ে আছে।'

'হবে না কিছু,' মুসা বলল।

'আমারও মনে হয়, হবে না। তবে খালাকে নিয়ে ভাবনা। পেছন থেকে এসে আমার আগেই বাক্সটা তুলল খালা, ডালা খুলেই কাঁপতে শুরু করল।'

'তারপর?' রবিন জানতে চাইল।

'সাপটা দেখল। ওটার গলায় ঝোলানো কার্ড পড়ল,' টেবিল থেকে তুলে

বাড়িয়ে ধরল জিনা, 'এই যে, এটা।'

শাদা কার্ডটা দেখাল কিশোর। জোরে জোরে পড়লঃ 'বীলিয়াল তার পাওনা চায়। হীরার চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি আকর্ষণীয় তার কাছে।'

'দেখেছ,' জিনা বলল, 'বড় বড় হরফে পরিষ্কার করে লিখেছে! পাঠকের মনে ছাপ ফেলবার জন্যে!'

'সফল হয়েছে নিশ্চয়?' জিনার দিকে তাকাল রবিন।

'হয়েছে। টলে উঠেই পড়ে গেল খালা। আগে কাউকে বেহুঁশ হতে দেখিনি! ভয়ই পেয়ে গেলাম। খানিক পড়েই গোঙাতে শুরু করল খালা, চোখ মেলল। ধরে ধরে অনেক কষ্টে তাকে ওপরে নিয়ে গেছি।'

'পুলিশকে বলতে রাজি হয়েছে?'

'না। অনেকবার বলেছি, বুঝিয়েছি, শুনতেই রাজি না। বলেছি, সাপটা আছে, কার্ডটা আছে, পুলিশকে প্রমাণ দেখাতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু শুনলই না আমার কথা। খালি বলে, জিহাভোকে নেকলেস দেয়া ছাড়া নাকি আর কোন উপায় নেই।'

'তার মানে নেকলেসটা দিতে যাচ্ছে?' কিশোর বলল।

'না। ওটা পেয়ে গেছি, আমার কাছে।'

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'কয়েক দিন আগে টেলিভিশনে একটা সিনেমা দেখেছিলাম,' খুলে বলল জিনা। 'স্পাই ছবি। মেয়েদের বাথরুমে পুরানো সাবানের বাক্সে একটা মাইক্রোফিল্ম লুকিয়ে রাখল গুপ্তচর। খালাও দেখেছে ছবিটা। নিজের বুদ্ধিতে কিছুই করতে পারে না খালা, ভাবতেই বুঝে গেলাম নেকলেস কোথায় লুকিয়েছে। তোমরা যাওয়ার পর গিয়ে খুঁজলাম। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই।'

'তুমি নিশ্চয় আরও ভাল জায়গায় লুকিয়েছ,' মুসা বলল।

'তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি,' রসিকতার সুরে বলল জিনা, 'যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তো গ্যারেজে খুঁজো। ঘোড়ার ওট বিনের টিনে।'

'মন্দ না,' মাথা নাড়ল মুসা।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, খালার অবস্থা ভাল না। বিছানায় পড়ে আছে, দেয়ালের দিকে চোখ। মনে হলো, অসুখ করবে।'

'অসুখ খুব খারাপ হতে পারে,' সাবধান করল কিশোর। 'এমনিতেই দুর্বল, না?'

'আগে ভালই ছিল। মিস পলের অ্যাকসিডেনটের পর থেকেই কাহিল হয়ে পড়েছে।'

'তাকে এখন একা থাকতে দেয়া ঠিক নয়। দাঁড়াও, চাচীকে আসতে ফোন করছি।'

জিনার মুখ উজ্জ্বল হলো। 'খুব ভাল হবে। তোমার চাচী খুব শক্ত মনের মহিলা! তাঁকে সব কথা বলব। হয়তো খালাকে পুলিশের কাছে মুখ খুলতে রাজি করাতে পারবেন।'

'শুধু শক্ত বললে ভুল হবে,' কিশোর শুধরে দিল, 'চাচীর স্নায়ু ইস্পাতে তৈরি। কিন্তু, এই অবস্থায় চাচীও কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তোমার খালা

ভ্যারাড আর বীলিয়ালের ভয়ে কাতর, এখন অন্য কিছু ভাবতেই চাইবে না। চাচীকে শুধু বলব, তোমার খালার অবস্থা খারাপ, তুমি একা সামলাতে পারছ না।'

'তা-ও ঠিক।'

উঠে গিয়ে বাড়িতে ফোন করল কিশোর।

ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় হাজির হয়ে গেলেন মেরিচাচী। মিস মারভেলের ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন ঘরের আর মহিলার অবস্থা। গভীর ভ্রূকুটি করলেন জিনা আর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এক্ষুণি ঘুমাতে যাওয়া উচিত জিনার, ছেলেদের বাড়ি ফেরা উচিত।

কিশোরের দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'তুই আর তোর চাচা বাইরে খেয়ে নিস রাতে, আমি থাকছি। সকালে ফোন করব।' বলেই রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। খুটখাট আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল, রেফ্রিজারেটর, আর তাকগুলো খোঁজাখুঁজি করছেন।

'জিনা, আজ রাতে পেট ভরে খেতে পারবে,' হেসে বলল কিশোর। 'খবরদার, একবারও বলবে না, ওটা আরেকটু দিন। চাচী যদি মনে করে তোমার পেট ভরেনি, বুঝবে ঠেলা।'

'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না,' বারবার রান্নাঘরের দিকে তাকাচ্ছে মুসা। 'আজ রাতে আমরাও এখানেই থেকে যাই না কেন? কত কি লাগতে পারে রাতে, তখন কাকে ডাকবেন চাচী?'

'পারলে চাচীকে গিয়ে বলো সে কথা,' হাসল কিশোর, জিনার দিকে ফিরল। 'আসলে আর থাকার দরকারই নেই আমাদের। ওসব গান গাওয়া সাপ-টাপের পরোয়া মেরিচাচী করবে না, আর হ্যাঁ, তোমার খালা সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু তুমি তো জানাতে পারো পুলিশকে? বলবে, ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে তোমার খালাকে।'

'না না, বাপু, আমি পারব না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল জিনা। খালাকে ভূতে ধরেছে, একথা গিয়ে পুলিশকে বলতে পারব না। খালাও পরে শুনলে খুব দুঃখ পাবে।'

ঝটকা দিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। 'কিশোর!' মেরিচাচীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, 'এখনও দাঁড়িয়ে বকবক করছিস কেন তোরা? মেয়েটাকে ঘুমোতে দিবি না নাকি?'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল ছেলেরা।

সন্ধ্যার পরে ফোন করল কিশোর। ধরলেন মেরিচাচী। কড়া গলায় জানালেন, 'জিনা ঘুমোচ্ছে, মিস মারভেল ঘুমায়নি, তবে শান্তই রয়েছে। বিছানায় না গিয়ে এত রাত অবধি কি করছে কিশোর, কৈফিয়ত চাইলেন। শেষে ধমক দিয়ে বললেন, সকালের আগে যেন আর কোন ফোন না করে।'

চিত হয়ে শুয়ে ছাতের দিকে চেয়ে রইল কিশোর, ভাবছে। ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়, দুঃস্বপ্ন দেখলঃ অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে পোড়ো বাড়িতে কালো মোম জ্বলছে। বীভৎস সব ছায়ারা নেচে বেড়াচ্ছে আলোর আশেপাশে। কাক-ভোরের আগে নীরব এক মুহূর্তে ঘুম ভাঙল তার, ঘামছে দরদর করে। মনে পড়ল, সাপের মূর্তিটার কথা, আতঙ্কে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া মিস মারভেলের কথা।

মনের পর্দায় ভেসে উঠল ডক্টর জিহাভোর কালো পোশাক পরা মূর্তি, ভীষণ ফ্যাকাসে চেহারা। দু'দিন আগেও এত তাড়াহুড়ো ছিল না লোকটার। এখন এতই অস্থির হয়ে উঠেছে, পারকারদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করছে মিস মারভেলকে হুমকি দিতে। কেন?

ইস, যদি জানা যেত জবাবটা! ফ্লাডলাইটের আলোয় কিশোরকে দেখেছে নিশ্চয় জিহাভো, আর তাকে দেখে থাকলে ফোর্ডকেও অবশ্যই দেখেছে তাতে ভয় পেয়ে গেছে ঠগবাজটা?

নড়েচড়ে শুলো কিশোর। এখন ফোর্ডকে খুঁজে পেলেই অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেত। কিন্তু পাবে কোথায়? পুরো ব্যাপারটার চাবিকাঠিই বোধহয় ওই রহস্যময় লোকটা! ওদিকে মস্ত বিপদ, ধীরে ধীরে অসুস্থতা বাড়ছে মিস মারভেলের, এগিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। আর টারনার? তার কি হবে? সাপ কি পাঠানো হয়েছে তার কাছে?

ডাইনিবিদ্যার ওপর লেখা বইটার কথা মনে পড়ল কিশোরের, রবিন যেটা লাইব্রেরি থেকে এনেছিল, ফোর্ডের বাসায় যেটা দেখেছিল সেই বই। লেখক রুকসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, রকি বীচ থেকে রুকসটন মাত্র দশ মাইল। হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। পেয়েছে, সমাধান পেয়েছে! ফোর্ডকে ছাড়াও চলবে, মিস মারভেলের জন্যে কিছু করতে পারবে এখন। ডক্টর জিহাভোর তাড়া রয়েছে, এটা খারাপ না হয়ে ভালই হতে যাচ্ছে জিনার খালার জন্যে।

উপায় একটা পেয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান, দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

উনিশ

সকাল সকালই পারকারদের বাড়িতে এল তিন গোয়েন্দা। হাতে খাবারের ট্রে নিয়ে ওপর তলায় যাচ্ছেন মেরিচাচী। রান্নাঘরে ঢকঢক করে কমলার রস গিলছে জিনা।

'নেকলেসটা নিয়ে কি করব ঠিক করে ফেলেছি,' ছেলেদের দেখেই বলে উঠল জিনা। 'ফন হেনরিখের কাছে দিয়ে আসব। ও-ই সামলাক।'

'ভাল!' সমর্থন করল রবিন।

'তা তোমরা কি করেছ? মানে, করবে?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে এক লোক আছে, তার নাম ডলফ টারনার, একটা খাবারের দোকানের মালিক,' গল্প বলছে যেন কিশোর, 'আশা করছি, এতক্ষণে তার কাছে সাপ পৌঁছে গেছে। জিহাভোর তাড়া আছে, কাজেই দেরি করবে না সে। হাসলারের প্রতিদ্বন্দ্বী টারনার, বীলিয়ালেরও শত্রু।' বলার ঢং পাল্টাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'আমরা লস অ্যাঞ্জেলেসে যাচ্ছি।'

'খালার কি হবে? তার অবস্থা খুব খারাপ!'

'চাচী আছে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর, 'খালাকে দেখবে। তুমিও আছ। ফন হেনরিখকে ফোন করে বাসাতেই থাকতে হচ্ছে তোমাকে। কখন ওদের লোক আসে, কে জানে।'

'তা ঠিক। কিন্তু জিহাভো যদি আসে?'

'আসবে না। দেখো জিনা, তোমার খালা সাপের ক্ষমতায় বিশ্বাসী। এতেই অসুখ বাড়ছে তার। জিহাভো জানে এটা। জানে বলেই আসবে না, কখন তার চাহিদা মত জিনিস যাবে সে-অপেক্ষায় থাকবে।'

'জিনিস যাবে না, খালা উঠতেই পারে না, পাঠাবে কে? একেবারে অচল হয়ে গেছে।'

'তোমার খালাকে বাঁচানোর একটা উপায় আছে, জিনা, কিন্তু টারনারের কথা আগে ভাবতে হবে আমাদের। তোমার খালার হাতে সময় আছে, কিন্তু টারনারের একেবারেই নেই।'

'কি করতে যাচ্ছ?' ভুরু কোঁচকাল জিনা।

'টারনারের দোকান বাঁচাতে যাচ্ছি,' রবিন আর চেপে রাখতে পারল না।

'তাহলে আমিও যাব,' ঘোষণা করল জিনা।

'না, তুমি যাচ্ছ না,' সাফ বলে দিল মুসা। 'টারনার দুর্বল লোক না, তাকে নোয়াতে কষ্ট হবে জিহাভোর। গোলমাল হতে পারে।'

'হোক, আমি যাবই!' জেদ ধরল জিনা। 'মেরিচাচী থাকছে, জিহাভো আসছে না। নেকলেসটাও এখন যেখানে আছে, নিরাপদেই আছে। আমার যেতে বাধা কি? তোমরা ওদিকে মজা লুটবে, আর আমি বসে বসে আঙুল চুষব? তা হবে না। আমি যাব।'

ট্রে হাতে এসে ঢুকলেন মেরিচাচী। 'কোথায়?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে যাব, চাচী,' বলতে একটুও দেরি করল না জিনা, 'খালার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিশোরকে আমার সঙ্গে যেতে বলুন না!'

অবাক হলেন মেরিচাচী। 'অবস্থা খুব খারাপ, একটা দানাও মুখে দেয়নি সকালে, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকারই, কিন্তু যাওয়া লাগবে কেন? লস অ্যাঞ্জেলেস কি কম দূর? ফোন করলেই পারো।'

'ডাক্তারের নাম ভুলে গেছি, ফোন নম্বরও জানি না। তবে তার চেম্বার চিনি, উইলশায়ারে, গির্জার পাশে একটা বাড়ি।'

'এত কষ্ট করবে? তার চেয়ে তোমার খালাকে জিজ্ঞেস করে দেখো না। নাম, নাম্বার, দুটোই হয়তো পেয়ে যাবে।'

'খালা বলবে না। জিজ্ঞেস করিনি ভাবছেন? করেছি। আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। ভূতে ধরেছে, ডাক্তারের কথা শুনতে চাইবে কেন!'

নীরবে জিনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মেরিচাচী। দু'হাত নাড়লেন। 'ঠিক আছে! কিশোর, দৌড়ে যা-তো, বোরিসকে বলগে পিকআপটা নিয়ে আসতে। বাসে গেলে সারাদিন লেগে যাবে।'

আনন্দে মেরিচাচীকে জড়িয়ে ধরল জিনা। 'ও, মাই সুইট আন্টি!'

ছেলেরা মুখ গোমড়া করে থাকল। কিশোরের পেছনে বেরোল জিনা, তাদেরকে অনুসরণ করল অন্য দুজন। রাগে ফুলছে। টারনারকে সাহায্য করতে যাচ্ছে, কিছুতেই বলা যাবে না চাচীকে। বিপদ আছে শুনলে যেতেই দেবেন না চাচী।

ইয়ার্ডে প্রচুর কাজ, তা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশিই হলো বোরিস। চুপচাপ পিকআপের পেছনে উঠে বসল ছেলেরা, জিনা বসল ড্রাইভারের পাশে।

বেভারলি অ্যাণ্ড থার্ড স্ট্রীটের মোড়ে গাড়ি পার্ক করল বোরিস। দরজা খুলে দিলো বাড়াল। 'আমি আসব?'

'না,' বলল কিশোর। 'এখানেই থাকুন। বসে বসে জিরোন। আমাদের দেরি হতে পারে।'

'হোক!' একটা খবরের কাগজ খুলে আরাম করে বসে তাতে মন দিল বোরিস।

জিনাকে হ্যাঁ-না কিছুই বলল না ছেলেরা। অনেকটা বেহায়ার মতই তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল সে।

'ওই যে, হাসলারের দোকান,' হাত তুলে দেখাল মুসা।

নাক বাঁকাল জিনা, থুথু ফেলল মাটিতে, নোংরামি দেখে।

টারনারের দোকানের দরজা খুলে একটা ছেলে বেরোল। তার পেছনেই মালিকের মুখ দেখা গেল। 'আজ আর এসো না।'

বড় বড় কদমে কাছে চলে এল কিশোর, দরজায় তালা লাগাচ্ছে টারনার।

'সরি,' ফিরে চেয়ে বলল লোকটা, 'বন্ধ করে দিয়েছি।'

'সাপটা পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঝট করে সোজা হলো টারনার, মুসাকে চোখে পড়ল। 'তুমিও আবার এসেছ।'

'আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, মিস্টার টারনার,' নরম গলায় বলল মুসা।

'তাই, না? পুলিশ সব কথা বলেছে আমাকে। তোমরা কিশোর গোয়েন্দা, প্রেতসাধকদের পেছনে লেগেছ। কি বলব? ছেলেমানুষী, না পাগলামী? যা খুশি করোগে। আমি যাচ্ছি। দোকান বন্ধ।'

'সাপটা পেয়েছেন?' একই ভাবে জিজ্ঞেস করল আবার কিশোর।

কিশোরের শার্ট খামচে ধরল টারনার। 'তুমি রেখে গিয়েছিলে? ঘাড় মটকে দেব!'

শার্ট ছাড়ানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না কিশোর। 'আমরা কেউ রাখিনি। তবে জানি, ওটা একটা গোখরোর মূর্তি, কুণ্ডলী পাকানো, চোখ দুটো লাল পাথরের।'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ টারনার, তারপর আস্তে করে ছেড়ে দিল শার্ট। আবার দরজা খুলে কাউন্টারের দিকে ইঙ্গিত করল। শাদা ফরমিকার ওপর বসে আছে মূর্তিটা, মিস মারভেলকে যেটা পাঠানো হয়েছে, তার অবিকল নকল।

'মিনিট দুয়েকের জন্যে দোকানের পেছনে গিয়েছিলাম,' টারনার বলল, 'ফিরে এসে দেখি ওটা।'

'হুঁ!' কিশোর গম্ভীর।

'আমি যাচ্ছি, তোমরাও কেটে পড়ো। কিছু যদি ঘটেই, নির্জন জায়গায় ঘটুক। পুলিশকে ফোন করে জানিয়েছি। যাও যাও, সরে যাও।'

রাস্তা পেরিয়ে একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল। কাঁধ ধরে এক ঝটকায় তাকে আবার

রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে দিল টারনার। 'বাড়ি যাও! তোমার মাকে বলবে, সে-ও যেন আজ আর না বেরোয়! যাও!'

হাঁ করে টারনারের দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা।

'দেখছ কি!' ধমকে উঠল দোকানদার।

কিছুই না বুঝে প্রায় ছুটে পালাল মেয়েটা।

'খদ্দেরের জ্বালায় আর পারি না!' আক্ষেপ করল টারনার। 'একেবারে উইপোকা! ঝাঁকে ঝাঁকে আসে, ছাড়াতে পারি না!'

দালানের কোণের দিক থেকে একটা লোক এসে দাঁড়াল। নীল প্যান্ট আর কালো কোটের বয়েস কত, সে নিজেও বলতে পারবে না হয়তো। ময়লা, ছেঁড়া কোঁচকানো কাপড়-চোপড়। অনুনয় করল, 'কফি হবে?'

আগ্রহের সঙ্গে লোকটাকে দেখছে জিনা। জীবনে ভিখিরি খুব কমই দেখেছে সে, এই লোকটা তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। গায়ে শুধু কোট, শার্টও নেই। লালচে ঘাড় বেরিয়ে আছে। কতদিন চুল কাটেনি, কে জানে! ধুলোয় ধূসর, শিগগিরই পরিষ্কার না করলে জটা পড়বে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে গা থেকে।

'হবে, ভাই?' আবার অনুনয় করল লোকটা। 'একআধটা স্যাণ্ডউইচও যদি পেতাম! দু'দিন খাইনি!'

পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে একটা খুলে নিল টারনার। লোকটার দিকে না তাকিয়ে বাড়িয়ে ধরল নোটটা। 'আমার দোকান বন্ধ। ওই যে, ওই দোকান থেকে কিনে খাওগে,' হাসলারের দোকান দেখিয়ে দিল।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!' টাকাটা নিয়ে কপালে ছোঁয়াল ভিখিরি। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই খবরের কাগজ রাখার স্ট্যাণ্ডে হোঁচট খেল, সামলানোর চেষ্টা করল, পারল না, স্ট্যাণ্ড আর কাগজগুলো নিয়ে পড়ল হুড়াম করে।

'আরে দূরর্!' চেঁচিয়ে উঠল টারনার। 'জ্বালা!'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে উঠল ভিখিরি। 'সোকে!' (ইট'স ও কে) টলতে টলতে পা বাড়াল।

'এই, মিয়া!' জিনা ডাকল। 'দাঁড়াও!' এগিয়ে গিয়ে উবু হয়ে ছোট একটা কালো বাক্স তুলে নিল। 'তোমার রেডিও ফেলে যাচ্ছ!'

দৌড় দিল লোকটা।

'জিনা!' হাত বাড়াল কিশোর। 'জলদি দাও আমার হাতে!'

'গুড লর্ড!' চেঁচিয়ে উঠল টারনার। ছোঁ মেরে জিনার হাত থেকে বাক্সটা নিয়েই ছুঁড়ে ফেলল অন্ধের মত। উড়ে গিয়ে হাসলারের দোকানের দেয়ালে বাড়ি খেল ওটা, ভ্রাম্‌ম্‌ম্ করে বিকট আওয়াজ তুলে ফাটল। চোখ ধাঁধানো আলো। কালো ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল, হাসলারের দোকানের জানালা দরজার একটা কাচও নেই, সব গুঁড়ো। হাসলারের নোংরা ফেকাসে মুখটা চকিতের জন্য দেখল কিশোর।

খানিকের জন্য থ হয়ে গিয়েছিল টারনার, সংবিৎ ফিরে পেয়েই ঘুরে তাকাল। পথের মোড়ের কাছে চলে গেছে ভিখিরির পোশাক পরা লোকটা। লাফিয়ে উঠে

দৌড় দিল টারনার সেদিকে।

'বোমা!' থরথর করে কাঁপছে এখনও জিনা। 'জীবনে দেখিনি! আমি ভেবেছি রেডিও!'

'মাই ডিয়ার লেডি,' হাসিমুখে বলল মুসা, 'আমাদের সঙ্গে থাকলে আরও অনেক কিছুই দেখবে। সারা জীবন ঘরের ভেতরেই কাটিয়েছ তো।'

জিনার ওপর থেকে রাগ দূর হয়ে গেছে ছেলেদের।

বিশ

ফেরার পথে পিকআপের পেছনে বসল জিনা। এক সময় বলল, 'আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। এবার নিশ্চয় খালার সঙ্গে কথা বলবে পুলিশ।'

'ভদ্রভাবেই বলবে,' জিনার আশঙ্কা দূর করতে চাইল কিশোর। 'তিনি তো আর অপরাধী নন।'

'পুলিশের ঝামেলা থেকে যদি দূরে সরিয়ে রাখা যেত!'

'সম্ভব না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'তাছাড়া পুলিশের কাছে চেপে রাখাও আর উচিত হবে না আমাদের। ভয়ানক লোক জিহাভো, মানুষ খুন করতেও বাধে না তার। আজ আরেকটু হলেই তো দিয়েছিল টারনারকে শেষ করে!'

'জিনা, আজ একটা কাজের কাজ করেছ,' মুসা বলল। 'বোমাটা আমাদের চোখে পড়েনি, তুমি না দেখলে…' হাসল সে। 'এত তাড়াতাড়ি চলে আসা উচিত হয়নি। লোকটাকে ধরতে পারলে ধোলাই যা একখান দেবে না টারনার! আহ্, থাকলে পারতাম!'

'হাসলারের চেহারা দেখেছ! হাহ্ হাহ্!' হাসি ঠেকাতে পারছে না কিশোর। 'ওর জানালা ধসে পড়বে, এটা কল্পনাও করেনি সে।'

পারকারদের বাড়িতে ঢুকল পিকআপ। মেরিচাচী বোধহয় ওদের অপেক্ষায়ই ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে উঁকি দিলেন। 'এতক্ষণ! মিস মারভেলেরও অবস্থা আরও খারাপ। এখানকার ডাক্তারকেই ডেকেছি, কি করব! জিনা, ডাক্তারকে পেয়েছ?'

'না,' লাফ দিয়ে নামল কিশোর। মেরিচাচীর পাশ কাটিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল।

জিনা ছুটল পেছনে।

'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার,' ডাক্তার বললেন। 'কিন্তু রাজি হচ্ছেন না উনি।'

একেক লাফে দুটো করে সিঁড়ি টপকে উঠতে লাগল জিনা, কিশোর তার পেছনে পড়ে গেছে।

চুপসে যাওয়া মস্ত একটা পুতুলের মত বিছানায় নেতিয়ে পড়েছে মিস মারভেল। জিনার গলা শুনে ফিরে তাকাল।

'খালা, আর চিন্তা নেই,' জিনা বলল। 'জিহাভোর শয়তানী ফাঁস হয়ে গেছে। একটা ঠগবাজ, খুনী। পুলিশ খুঁজছে এখন তাকে।'

নড়ল না মিস মারভেল।

হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল জিনা। 'ভাবনা-চিন্তা একেবারে বাদ দাও। তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।'

জিনার হাতে হাত রাখল মহিলা। ফিসফিস করে বলল, 'জিনা নেকলেসটা...'

এক ঝটকায় সরে এল জিনা। 'না! দেব না! কি বলছি, শুনছ না? জিহাভো একটা ঠগবাজ খুনী। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে জেলে ভরবে পুলিশ। কারও আর কিচ্ছু করতে পারবে না সে।'

'ওর বিরুদ্ধে কিছু করেছিস!' তাজা আতঙ্ক ফুটল মিস মারভেলের চেহারায়। 'জিনা, ও আমাকে দুষবে!'

'যত্তোসব!' খালার কব্জি ধরে টানল জিনা। 'হয়েছে ওঠো।'

জিনার বাহুতে হাত রাখল কিশোর। 'ছেড়ে দাও।' তাকে নিয়ে হলে এল সে। 'এভাবে খালাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে লাভ হবে না,' বোঝাল কিশোর। 'দেখছ না, জিহাভো জেলে যাবে শুনে আরও ভয় পেয়ে গেছে? একটাই উপায় আছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।'

'কি ভাবে?'

'ভূত ছাড়াতে হবে।'

'জনাব কিশোর পাশা, মাথামুথা ঠিক আছে তো তোমার?'

ওঁর ভূত ছাড়াতে হবে,' জিনার কথা শুনতেই পায়নি যেন কিশোর। 'অভিশাপ তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ওঝা ডাকব। এক ওঝা কাউকে বাণ মারলে সেটা ছাড়ানোর জন্যে আরেক ওঝা দরকার। বাংলাদেশে অহরহ ঘটছে এসব। চাচা বলতে বলতে একেক সময় খেপে ওঠে।'

হতাশ ভঙ্গিতে দেয়ালে হেলান দিল জিনা। 'বাংলাদেশ এখান থেকে অনেক দূর! ওঝা কোথায় পাব?'

'পাব, পাব,' হাত তুলল কিশোর। 'বোকা মানুষ দুনিয়ার সব দেশেই আছে। আমার তো ধারণা, লস অ্যাঞ্জেলেসে আরও বেশি আছে। পাগলও বেশি এখানে। বোকা মানুষ বেশি যেখানে, সেখানে ঠগবাজও বেশি। আমি জানি, কোথায় ওঝা পাওয়া যাবে।'

নিচে নামল কিশোর। উদ্বিগ্ন মেরিচাচীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে রবিন আর মুসা। গম্ভীর মুখে পায়চারি করছেন ডাক্তার।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'রুকসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রফেসর, পুরো নাম কি যেন?'

'জন এ. স্মিথ।'

'হ্যাঁ, জন স্মিথ,' রান্নাঘরে এসে ঢুকল কিশোর। জানালা দিয়ে তাকাল পাহাড়-উপত্যকার দিকে। রবিন আর মুসাও ঘরে ঢুকল।

'প্রফেসরকে দরকার?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ। ওঝা দরকার একজন। কিভাবে কি করতে হবে, প্রফেসর স্মিথ ভাল বলতে পারবেন।'

অনুসন্ধান-এ ফোন করল কিশোর। 'প্রফেসর জন এ. স্মিথের নাম্বারটা বলবেন, প্লীজ?...হ্যাঁ হ্যাঁ, রুকসটন ইউনিভারসিটি।'

কাগজ কলম নিয়ে রবিন তৈরি। জোরে জোরে নম্বরগুলো বলল কিশোর, রবিন লিখে নিল। 'থ্যাংক ইউ' বলে লাইন কেটে দিল কিশোর। 'এখন তাঁকে পেলে হয়।' আবার ডায়াল ঘোরাল সে। 'ডাক্তার স্মিথ আছেন?'

খানিকক্ষণ নীরবতা। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে কিশোর। ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই বলল, 'প্রফেসর? স্যার, আমি কিশোর পাশা, রকি বীচ থেকে বলছি। একটা সাহায্য করতে পারেন? টেলিফোনে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। একজন মহিলাকে, মানে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আমরা...'

চুপ করে শুনল কিশোর। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, খুব অসুস্থ।'

আবার চুপ। শুনে বলল, 'গতকাল, স্যার। প্যাকেটে করে একটা সাপের মূর্তি পাঠানো হয়েছে।' আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে ওপাশের কথা শুনে বলল, 'পারকার হাউস। মহিলার নাম মিস মারভেল।' আবার চুপচাপ। 'থ্যাংক ইউ, স্যার, থ্যাংক ইউ;' বলে প্রফেসরকে পারকার হাউসের ঠিকানা দিয়ে রিসিভার রেখে দিল।

'আসছেন,' রবিন আর মুসার কৌতূহল নিরসন করল কিশোর। 'সঙ্গে করে ওঝা নিয়ে আসবেন, অভিশাপ দূর করার জন্যে।'

'খাইছেরে,' বিড়বিড় করল মুসা। 'আল্লাই জানে কি হবে! ভুডুর ওস্তাদ নিশ্চয়?'

'এলেই জানা যাবে।'

দরজা খুলে উঁকি দিলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, কি করছিস?'

'ডাক্তারকে পেয়েছি, চাচী।'

'অউ, গুড! যাক, বাঁচা গেল। চেনা ডাক্তারের কথা হয়তো শুনবে মহিলা।'

'দেখা যাক, কি হয়। তিনি আসছেন।'

'গুড। আমি গিয়ে বসি জিনার খালার কাছে। আর এই, শোনো তো, একজন গিয়ে ওই ঘোড়াটাকে বাঁধো!' জানালা দিয়ে দেখলেন মেরিচাচী। 'ঝাড়-টাড় সব নষ্ট করে ফেলবে!'

চাচীর পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে জিনা। বলল, 'আমিই যাচ্ছি।'

'জিনা,' কিশোর ডেকে বলল, 'ডাক্তার আসছেন।'

'পেয়েছ তাহলে! খুব ভাল!'

ডাক্তার চলে গেলেন। মেরিচাচী গেলেন মিস মারভেলের ঘরে। বারান্দায় সিঁড়িতে পা রেখে বসল ছেলেরা। খানিক পরেই ফিরে এল জিনা। 'কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশি দেরি হবে না,' কিশোর বলল।

সত্যিই দেরি হলো না, গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল। এসে থামল গাড়িবারান্দায়। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে লাফিয়ে নামল একজন লোক। 'কিশোর প্যাশাআ!'

অবাক হয়ে লোকটার দিকে চেয়ে আছে চার ছেলে-মেয়ে।

'জিনা,' লোকটা বলল, 'আমি সতিই দুঃখিত! জানতাম না, এতখানি গড়াবে!'

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আপনি!'

'আমি ডক্টর জন স্মিথ।'

হাঁ হয়ে গেছে জিনা। 'আপনি...আপনি গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন, মিস্টার

ফোর্ড!'

ওপরের ঠোঁটে আঙুল বোলালেন প্রফেসর। হাসলেন। 'ওটা নকল গোঁফ ছিল। ফোর্ড নামটাও বানানো। আমি আসলে ডক্টর জন এ. স্মিথ, রুকসটন ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপলাজির প্রফেসর।'

একুশ

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মূর্তিটা দেখলেন প্রফেসর। 'চমৎকার কাজ! এজিনিসে ভয় না পেলে আর কিসে পাবে?'

'সত্যিই কি কাজ হয়?' মুসা জানতে চাইল।

সাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর। 'যার বিরুদ্ধে করা হলো সে না জানলে কিছুই হবে না। ভয় পেল কি, মরল!'

'আপনি খালাকে ভাল করতে পারবেন?' জিনা বলল। 'বোঝাতে পারবেন, তার ওপর থেকে অভিশাপ দূর হয়েছে?'

'না, আমি পারব না। আমাকে কি ওঝার মত দেখাচ্ছে?'

দেখাচ্ছে না, স্বীকার করল জিনা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত পোশাক। 'তোমার খালা আমাকে বাড়ির কাজের লোক হিসেবে দেখেছেন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে বালি পরিষ্কার করতে দেখেছেন, আমি বললে কি বিশ্বাস করবেন? না। এ-জন্যেই আউরোকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। গাড়িতে বসে আছে। কি কি করতে হবে, বুঝিয়ে দিয়েছি তাকে, করতে পারবে।'

'তিনি কি ওঝা?' জানতে চাইল কিশোর।

'জিপসি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন প্রফেসর। 'ভূতে পাওয়া এরকম আরও অনেককেই ভাল করেছে। আঁচিল সারাতে পারে, ভবিষ্যৎ বলতে পারে, শত্রুর পিঠে মাথা গজিয়ে দিতে পারে...'

'দূর! তাই কি হয়?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'নিজের চোখেই দেখবে,' হাসলেন প্রফেসর। 'যাই, ওকে নিয়ে আসি।'

মহিলাকে নিয়ে এলেন প্রফেসর। বৃদ্ধা, গালের চামড়া কোঁচকানো। মাথায় কয়েকটা রঙিন রুমাল বেঁধেছে, তাতেও পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি লম্বা জটা। ব্লাউজ ফেকাসে নীল, সবুজ গাউন পায়ের পাতা ঢেকে দিয়েছে। কাপড়-চোপড়ে কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ, বালি নেই, তবু মনে হয় বালিতে ঢাকা। ঘন কাঁচাপাকা ভুরুর নিচে গভীর কালো উজ্জ্বল দুটো চোখ।

মূর্তিটা তুলে নিল মহিলা। 'এটাই?'

'হ্যাঁ,' বললেন প্রফেসর।

'হাহ্!' অবজ্ঞা দেখাল আউরো। 'এই মেয়ে, এই, তোমরাও,' ছেলেদের দিকে হাত তুলল সে, 'এসো আমার সঙ্গে। যা যা বলব, করবে। টুঁ শব্দ করবে না। বুঝেছ।'

'বুঝেছি,' কিশোর বলল।

'মেয়েমানুষটা কোথায়?'

'ওপরে,' দোতলা দেখাল জিনা।

'চলো,' মূর্তিটা হাতে নিয়েই সিঁড়ির দিকে এগোল আউরো।

সিঁড়ির মাথায় দেখা হয়ে গেল মেরিচাচীর সঙ্গে। 'আরে, এ-কি! এই পাগল ধরে এনেছে কেন! আরে, এই কিশোর…'

'ঠিকই আছে, চাচী,' দু'হাত তুলল কিশোর, 'ডক্টর স্মিথই নিয়ে এসেছেন ওকে।'

'ডক্টর স্মিথ? কখন এলেন? কই, আমাকে ডাকলি না কেন? এসব হচ্ছে কি?'

'পরে বলব,' প্রফেসরের দিকে ফিরে বলল কিশোর, 'আমার চাচী।'

সালাম জানালেন প্রফেসর।

মাথাটা সামান্য একটু নুইয়ে আবার কিশোরের দিকে ফিরলেন মেরিচাচী। 'পরে-টরে না, আমি এক্ষুণি জানতে চাই কি হচ্ছে এসব!'

'এই বেটি, সরো!' ধমক লাগাল আউরো।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন মেরিচাচী।

প্রমাদ গুণল তিন গোয়েন্দা। বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে ওঝা!

'বলছি, সরো, আউরোও গলা চড়াল। 'আমার জরুরী কাজ আছে! শিগগির সরো,' নইলে পরে পস্তাবে বলে দিচ্ছি!'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত দুজনের চোখে চোখ আটকে থাকল। তারপর তিন গোয়েন্দাকে অবাক করে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন মেরিচাচী।

জিনার সঙ্গে মিস মারভেলের ঘরে ঢুকল আউরো, পেছনে তিন গোয়েন্দা। ওঝার ওপর ভক্তি বেড়েছে। দুর্ব্যবহার করে মেরিচাচীকে কুপোকাৎ করে দেয়া…আরিব্বাপরে!

চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পরে আছে মিস মারভেল। তার পায়ের কাছে এসে ডাকল আউরো। 'অই, ভূতের বাসা! শুনছ? চাও!'

চোখ পিটপিট করে তাকাল মিস মারভেল, শিউরে উঠে গায়ের চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিল।

'বেটির মাথার তলায় বালিশ দাও,' জিনাকে আদেশ দিল আউরো। 'ওরও দেখা দরকার।'

'এই যে, দেখো!' মূর্তিটা উঁচু করে ধরল আউরো। 'শয়তানের বাহন।'

আবার কেঁপে উঠল মিস মারভেল। 'বীলিয়াল।' বিড়বিড় করল। 'বীলিয়ালের দূত!'

'হাহ্!' অবজ্ঞায় মুখ বাঁকাল আউরো। 'অমন কত দূত আছে আমার। যে কোন একটা পাঠালেই বীলিয়ালের অস্তিত্ব বিনাশ করে দিয়ে আসবে!' ঘুরে এসে মূর্তিটা বাড়িয়ে ধরল ওঝা। 'ধরো! এটা হাতে নাও!'

'না, না, আমি পারব না।' দু'হাত নাড়তে লাগল মিস মারভেল।

'একশোবার পারবে,' কড়া গলায় ধমক দিল আউরো। খপ করে মিস মারভেলের একটা হাত তুলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা আঙুলে গুঁজে দিল মূর্তিটা। 'বাঁচতে চাও? ধরো শক্ত করে!'

এই প্রথমবার মিস মারভেলের চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে গেল, আশার

আঁলো। মূর্তিটা ধরল শক্ত করে।

ঢোলা গাউনের অসংখ্য পকেটের একটা থেকে সবুজ কাপড়ের থলে বের করল আউরো। ভারি গলায় একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল, 'সবুজ বসন্তের প্রতীক! জীবনের রঙ!' থলেটা মিস মারভেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'দাও, সাপটা ঢুকিয়ে দাও এর মধ্যে।'

আউরোর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে থলের ভেতরে মূর্তিটা রেখে দিল মিস মারভেল।

'ব্যস,' তাড়াতাড়ি থলের মুখ শক্ত মোটা সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলল আউরো। জিনাকে বলল, 'দরজা বন্ধ করো। মোম জ্বালো! এই মেয়ে, নড়তে-চড়তে পারো না!'

মোমের অভাব নেই ঘরে। সবুজ, নীলচে-লাল, লাল, শাদা, কালো, যত রঙের পাওয়া যায়, সব আছে।

'লাল মোম জ্বালো,' বলল আউরো। 'লাল মানে শক্তি।'

মোম জ্বলল।

'খবরদার! কেউ কথা বলবে না!' হুঁশিয়ার করে দিল আউরো।

কেউ বলল না, আউরো ছাড়া। ভারি কেমন এক গলায় মন্ত্র পাঠ শুরু করল সে, ভাষাটা বিচিত্র, এক বর্ণও বুঝতে পারল না আর কেউ। সবুজ থলেটা মোমের আলোর দিকে উঁচু করে ধরল, একবার জোরে, একবার আস্তে, একবার ফিসফিস করে, তারপরই নাকি সুরে, কি সব বকবক করল, সে-ই জানে!

মাথা সামনে পেছনে তালে তালে দোলাচ্ছে ওঝা, বিড়বিড় করতে করতেই ঝট করে সোজা হয়ে গেল হঠাৎ। গুঙিয়ে উঠে বন্ধ করে ফেলল চোখের পাতা, গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। হাতের থলে ছাড়েনি।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে মিস মারভেল। আউরোর মুখ ফাঁক, গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে নানা রকম বিচিত্র শব্দ। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে শুরু হলো গান, সেই মহাসর্পের গান! ভাল করে দেখল কিশোর। উঁহু! আউরোর মুখ থেকে আসছে না আওয়াজ! সারা ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বেসুরো সুর, দুর্বোধ্য শব্দ। জবাই করা ছাগলের মত ঝাঁকুনি খাচ্ছে আউরোর দেহ। হঠাৎ গড়াতে শুরু করল সে সারা ঘরে। একের পর এক রুমাল খুলে পড়ছে মাথা থেকে, হুঁশই নেই যেন। লম্বা জটাগুলোকে মনে হচ্ছে খুলি আঁকড়ে থাকা এক ঝাঁক বিষাক্ত সাপ!

গান বাড়ছে, জোরালো হচ্ছে, আরও জোরালো। তীক্ষ্ণ, বাতাস চিরে কান ফুঁড়ে যেন ঢুকে যাচ্ছে মগজে।

বিছানায় সোজা হয়ে বসেছে মিস মারভেল। বালিশের দরকার পড়ছে না আর।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে গেল আউরোর শরীর। মেঝের ঠিক মাঝখানে এসে চিত হয়ে পড়েছে। চোখ খোলা, ছাতের দিকে চেয়ে আছে, প্রাণ নেই যেন।

'কিশোর!' দরজায় করাঘাত হলো। 'এই কিশোর, দরজা খোল! হচ্ছে কি ভেতরে! খোল!'

গুঙিয়ে উঠল আউরো। উঠে বসল। থলেটা এখনও হাতে ধরা, এত কিছুতেও ছাড়েনি। সেটার দিকে চেয়ে বলল, 'দেখেছি ওকে। কালো আলখেল্লা পরা এক লোক, ফেকাসে চেহারা, খুব বিপদে পড়েছে। সাপের প্যাঁচে আটকা পড়েছে সে।'

'কিশোর, খুললি না এখনও!' চেঁচিয়ে চলেছেন মেরিচাচী।

উঠে দাঁড়াল আউরো। মিস মারভেলের কাছে গিয়ে থলেটা বাড়িয়ে ধরল, 'খুলে দেখো।'

কাঁপা হাতে বাঁধন খুলে থলের ভেতরে হাত ঢোকাল মিস মারভেল। বিস্ময় ফুটল চোখে। মূর্তিটা নেই।

'বলেছি না, বীলিয়ালের চেয়ে আমার প্রেত ক্ষমতাশালী?' এই প্রথম হাসল আউরো। 'যে পাঠিয়েছে, তাকেই কামড়াতে গেছে মহাসর্প। বীলিয়ালকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, জিহাভোকেই আক্রমণ করেছে এখন সে। তোমার আর কোন ভয় নেই।'

গিয়ে দরজা খুলে দিল আউরো। কোমল গলায় ডাকল মেরিচাচীকে, 'এসো, মেয়ে, এসো। আর ভয় নেই। ভূত ভেগেছে।'

বাইশ

'আশ্চর্য!' জিনা বলল। 'গতরাতে পুরো এক বাটি স্যুপ খেয়েছে খালা। ঘুমানোর আগে দুধ আর বিস্কুট খেয়েছে। আজ সকালে উঠেই ডিম খেয়েছে দুটো। এই তো, এক ঘণ্টাও হয়নি, খিদে পেয়েছে বলে চিল্লাচিল্লি লাগিয়েছে আবার!'

টোস্টার থেকে দুই টুকরো টোস্ট তুলে নিল জিনা। তাতে মাখন মাখাতে মাখাতে বলল, 'মেরিচাচী না থাকলে কি যে করতাম! জান বেঁচেছে আমার!'

হাসল কিশোর।

'আরও দু'একদিন যদি থাকতেন,' ট্রে-তে টোস্টের প্লেট রাখল জিনা, আর এক গ্লাস দুধ।

'দরকার পড়লেই আবার চলে আসবে,' কিশোর বলল। 'ইয়ার্ডে মেলা কাজ পড়ে আছে। চাচীর ধারণা, নিজে হাজির না থাকলে, খালি ফাঁকি দেবে বোরিস আর রোভার।' একটু চুপ থেকে বলল, 'ও হ্যাঁ, সকালে ক্যাপ্টেন ফ্লেচার এসেছিলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ চীফ।'

'কোন খবর?' কিশোরের দিকে ফিরল জিনা।

'বোমা এনেছিল যে, লোকটা এখন জেলে,' রবিন জানাল।

'ওর মত লোকের উপযুক্ত জায়গা!'

'ক্যাপ্টেন বললেন,' মুসা জানাল, 'দু'এক ঘা খেতেই মুখ খুলে গেছে লোকটার। হড় হড় করে বলে দিয়েছে সব। ভ্যারান্ড আর রড ধরা পড়েছে। হাসলারকে কিছু বলেনি পুলিশ, সে সত্যিই জানত না, বোমা মেরে টারনারের দোকান উড়িয়ে দেয়ার তাল করেছে ডাক্তার জিহাভো।'

'জিহাভো কই? ধরা পড়েনি?'

'না, ওই একটাই বাকি,' কিশোর বলল।

একটা চেয়ারে বসে পরল জিনা। 'জিহাভো ধরা পড়েনি!'

'টরেনটি ক্যানিয়নের বাড়িতে পায়নি তাকে পুলিশ। সব কিছু ফেলে পালিয়েছে, এমনকি গাড়িটাও ফেলে গেছে। ক্যাপ্টেনের ধারণা, এতক্ষণে সে পগার পার, একেবারে ক্যানাডায়।'

চেয়ারের পায়ায় গোড়ালি ঠুকতে শুরু করল জিনা। 'তোমার কি ধারণা?'

'এখনও তুমি আমাদের মক্কেল। জিহাভো এভাবে পালিয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস হয় না।'

'ঠিক বলেছ,' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

চেয়ারেই পাঁই করে ঘুরে গেল জিনা। যার যার জায়গায় পাথর হয়ে গেল যেন ছেলেরা।

হলের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছে ডক্টর জিহাভো। সেরাতে যেমন দেখেছিল, তেমনি দেখাচ্ছে লোকটাকে, সেই একই পোশাক। তবে কাপড়গুলো এখন ময়লা, কোঁচকানো, ধুলো লেগে আছে। হাতে একটা পিস্তল।

'আমি একটা গাধা!' বিড়বিড় করে নিজেকে গাল দিল জিনা। 'দরজা খুলে রেখেছি! যে খুশি ঢুকে পড়তে পারে।'

ক'দিন ধরে তো এ-বাড়ির দরজা খোলা দেখছি, একা তোমার দোষ না,' লোকটা বলল। 'বেশি দোষ তোমার ওই মাথামোটা খালাটার।'

'বাহ্, খবর-টবর ভালই রাখেন,' কিশোর বলল। 'দেখলেন কোত্থেকে? ওই পাহাড়ের মাথায় লুকিয়ে বসেছিলেন?'

'তোমার বুদ্ধি আছে, খোকা,' কিশোরের দিকে চেয়ে মাথা সামান্য নোয়াল জিহাভো। 'ঠিকই ধরেছ। একটা গুহা আছে, ওখানেই লুকিয়ে থেকেছি। বাজে জায়গা!'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না! আচ্ছা, টরেনটি ক্যানিয়ন থেকে পালালেন কি করে?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'ড্যারাড় আর রডকে তো পুলিশ ধরে ফেলল।'

'বাগানের পেছনে ছিলাম। পুলিশের গাড়ি দেখলাম।'

'ব্যস, অমনি দেয়াল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লেন ঝোপে, না?' রবিন বলল। 'বন্ধুদেরকে বিপদে রেখে।'

'কথায় আছে না, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!' হাসি হাসি ভাবটা হঠাৎ দূর হয়ে গেল জিহাভোর চেহারা থেকে। 'ওই মাথামোটা মেয়ে মানুষটা কোথায়? নিশ্চয় দোতলায়?' সিঁড়ির দিকে পিস্তলের ইঙ্গিত করে বলল, 'চারজনই ওঠো। আমি পেছনে থাকছি।'

'যাব না,' গ্যাট হয়ে বসে রইল জিনা।

'বোকামি কোরো না,' মুসা বলল। 'ওর হাতে পিস্তল!'

'আমি কেয়ার করি না। খালার সঙ্গে আর দেখা করতে দিচ্ছি না আমি ওকে, যথেষ্ট করেছে।' আস্তে করে উঠে দাঁড়াল জিনা। কোমরে দু'হাত রেখে মুখোমুখি হলো জিহাভোর। 'আমি জানি, তুমি কি চাও। ওই নেকলেসটা। ওটা নেই এখানে, কাজেই, যেতে পারো এবার।'

'তাহলে কোন ব্যাংকে কিংবা জুয়েলারের দোকানে আছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল জিহাভো। 'মিস মারভেল ফোন করে ওটা আনাতে পারবে।'

'না ওটা...'

'জিনা!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'বলো না!'

জিনার ওপর থেকে চোখ সরে গেল জিহাভোর, নীরবে এক মুহূর্তে দেখল কিশোরকে, তারপর আবার জিনার দিকে ফিরল।

'ব্যাংকে নেই, না?' জিহাভো বলল। 'জুয়েলারের দোকানেও না? তাহলে কোথায়? এত দামী একটা জিনিস কোথায় থাকতে পারে?' হাত নেড়ে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল ছেলেদেরকে। তারপর এসে দাঁড়াল জিনার একেবারে সামনে। 'তুমি জানো। কোথায়?'

পিছিয়ে গেল জিনা। 'জানি না।'

'নিশ্চয় জানো,' হঠাৎ বাঁ হাতে জিনার কাঁধ খামচে ধরল জিহাভো। 'কোথায়?'

'হাত সরাও!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ছাড়ো! ছাড়ো ওকে।'

'আমি বলব না!' জিনাও চেঁচাল। 'বলব না!'

'বলবে,' কাঁধ ধরে জিনাকে ঝাঁকাতে শুরু করল লোকটা।

'ছাড়ো বলছি! নইলে ভাল হবে না!' রবিনও চেঁচিয়ে উঠল। পিস্তলের জন্যে সামনে বাড়তে সাহস করছে না।

গ্যারেজ থেকে ঘোড়ার উত্তেজিত চিহিঁহিঁহিঁ শোনা গেল। জিনা বিপদে পড়েছে, কি করে জানি টের পেয়ে গেছে কমেট।

'আরে! কি ব্যাপার!' ভুরু কোঁচকালো জিহাভো।

'ঘোড়ার ডাক চেনো না?' খেঁকিয়ে উঠল জিনা।

'চিনি, নিশ্চয় চিনি! আনমনে মাথা দোলাল জিহাভো। 'সারাদিন ঘোড়া নিয়েই থাকো, দিনের মধ্যে অসংখ্য বার গ্যারেজে ঢুকতে দেখেছি তোমাকে...ওখানেই বেঁধে রাখো, না?'

চুপ করে রইল সবাই।

'গ্যারেজ!' বলে উঠল জিহাভো। 'হ্যাঁ, গ্যারেজেই আছে! ঘোড়াটার অগোচরে কেউ সরাতে পারবে না ওটা। ভাল বুদ্ধি করেছ!'

ঝটকা দিয়ে কাঁধ ছাড়িয়ে নিল জিনা।

'বেরোও!' আদেশ দিল জিহাভো। 'সবাই!'

আবার ডেকে উঠল ঘোড়া।

'বেরোও!' ধমকে উঠল জিহাভো। 'কোথায় রেখেছ হারটা, দেখাও!'

'না!' চোখে পানি এসে গেছে জিনার।

'যা বলছে করো, জিনা,' কিশোর বলল। 'তোমার শরীর বুলেট প্রুফ না।'

'হ্যাঁ, দেখাও,' রবিনও বলল, 'নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না ও।'

'সেটা দেখা যাবে,' পিস্তল নাচাল জিহাভো।

পেছনের আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। গ্যারেজের দরজা ফাঁক হয়ে আছে। গিয়ে টেনে পুরো খুলে দিল কিশোর।

'কোথায় ওটা?' ভুরু নাচাল জিহাভো।

জবাব দিল যেন কমেট, বিরাট মাথাটা ঝাঁকিয়ে জিনার দিকে চেয়ে ডেকে

উঠল।

গ্যারেজের ভেতরে চেয়ে আছে জিহাভো। 'কোথায় আছে! গামলায় নয়, ঘাসের মধ্যে নয়, তাহলে খেয়ে ফেলতে পারে ঘোড়া। তাহলে? ওট বিন···হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা বিনের টিনে!'

স্থির হয়ে গেল জিনা।

'তাহলে ওট বিনেই আছে!' জিনার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে জিহাভো। 'টিনে।'

চারজনকেই গ্যারেজে ঢোকার হুকুম দিল জিহাভো। পেছনে ঢুকল সে। 'এবার বের করো,' জিনাকে বলল, শীতল কণ্ঠস্বর! 'চালাকির চেষ্টা করলে ঘাড় ভেঙে দেব।'

আস্তে করে হাত বাড়াল মুসা, তার দিকে পেছন ফিরে রয়েছে জিহাভো। ঘোড়ার বাঁধন খুলতে শুরু করল সাবধানে।

'বের করো!' ধমকে উঠল জিহাভো। জিনার এক হাত ধরে মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের ওপর।

'উহ্, উহ্, ব্যথা পাচ্ছি! ছাড়ো!' ককিয়ে উঠল জিনা।

গিঁট খুলে দিয়ে সরে গেল মুসা। ধীরে ধীরে মাথার সঙ্গে কান লেপটে ফেলছে আপালুসা।

'কমেট, ধরো!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

লাফিয়ে পেছনের দু'পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেল কমেট। চেঁচিয়ে উঠল প্রচণ্ড রাগে।

জিনার হাত ছেড়ে দিয়ে এক লাফে সরে দাঁড়াল জিহাভো। 'খবরদার !' পিস্তল তুলল সে ঘোড়ার দিকে।

'না, না!' বলতে বলতেই জিহাভোর হাতে থাবা মারল জিনা।

বদ্ধ জায়গায় গুলি ফোটার বিকট আওয়াজ হলো। মনে হলো, ধসে পড়বে গ্যারেজটা। কারও কোন ক্ষতি করল না বুলেট, মেঝেতে বাড়ি খেয়ে পিছলে গিয়ে বিঁধল দেয়ালে, আস্তরণ খসিয়ে দিল খানিকটা জায়গার।

কমেটের সামনের পা খটাস করে আবার মেঝেতে পড়েছে। মাথা দোলাল সামনে। মুগুর দিয়ে বাড়ি মারল যেন কেউ জিহাভোকে। উড়ে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালের সঙ্গে। কিন্তু পিস্তল ছাড়ল না হাত থেকে। আবার তুলতে শুরু করল গুলি করার জন্যে।

এক লাফে কাছে গিয়ে দাঁড়াল কমেট। বড় বড় দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল পিস্তল ধরা হাত। চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে অস্ত্রটা ছেড়ে দিল জিহাভো। খটাস করে মেঝেতে পড়ল পিস্তল। কমেটের পায়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে চট করে ওটা তুলে নিয়ে এল কিশোর।

'জিনা!' চেঁচিয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ঘোড়াটাকে সরাও!'

ছুটে গিয়ে ঘোড়ার গলা পেঁচিয়ে ধরল জিনা। 'হয়েছে, মেয়ে, এবার ছাড়ো। শান্ত হও।'

কামড় ছাড়ল ঘোড়া।

ধপ করে গ্যারেজের কোণে বসে পড়ল মহাগুরু, ক্লান্ত, আহত, বিধ্বস্ত। কাটা

জায়গা চেপে ধরল আরেক হাতে। হাঁপাচ্ছে। কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোচ্ছে গলা দিয়ে।

'চুপচাপ বসে থাকো,' পিস্তল তুলে ধরেছে কিশোর। 'নিশানা মোটেই ভাল না আমার, তবে এত কাছে থেকে মিস করব না। বাই চান্স বুকে কিংবা কপালে লেগে যেতে পারে।'

নীরবে আহত হাত চেপে ধরে বসে রইল জিহাভো।

'আমি যাই,' দরজার কাছে চলে গেছে রবিন, 'ক্যাপ্টেনকে ফোন করতে হবে। পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যাবেন।'

'অত তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে, বোলো,' খুশি খুশি গলায় বলল কিশোর। 'কমেটের সামনে দিয়ে পালাতে পারবে না।'

জিনা হাসল। বিচিত্র শব্দ করল কমেট।

'হাসল না তো!' জিনার দিকে তাকাল মুসা। 'সেদিনই মনে হয়েছিল আমার, ঘোড়া কামড়ায়। মেরিচাচী বলল, না! ভাগ্যিস কাছে যাইনি!' ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল মুসা, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা।

তেইশ

'এসো, এসো,' তিন গোয়েন্দাকে দেখেই ডাকলেন হলিউডের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। 'তোমাদের জন্যেই বসে আছি। বসো।'

বিশাল টেবিলে পড়ে আছে এক গাদা খবরের কাগজ, তার ওপাশে পরিচালকের গলার ওপরের অংশ শুধু দেখা যাচ্ছে। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে বোমা বিস্ফোরণের খবর পড়েছি। জানলাম, রকি বীচের তিনজন কিশোর ছিল তখন ওখানে, আর একটা মেয়ে। সন্দেহ হলো, তোমরা ছাড়া কেউ না। তাই সেক্রেটারিকে বলেছি তোমাদের ডাকতে।'

মোটা একটা ফাইল বাড়িয়ে দিল রবিন। 'ঠিকই অনুমান করেছেন, স্যার, আমরাই ছিলাম।'

'কোন কেস?' ফাইল খুলতে শুরু করলেন চিত্র পরিচালক।

নীরব ঘর, মাঝে মাঝে শুধু ফাইলের পাতা ওল্টানোর শব্দ, গভীর মনোযোগে পড়ছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। অবশেষে মুখ তুললেন, 'সব নেই এখানে।'

'বাকিটুকু বলেনি কিশোর পাশা,' রবিন জানাল।

'কি মানুষ ওরা!' নাক কোঁচকালেন চিত্র পরিচালক। 'কিশোর ধোঁয়ার ওপরে সাপের ছবি কি করে তৈরি করল, বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার,' মাথা নোয়াল কিশোর। 'সিনেমা প্রোজেক্টর। রঙিন একটা খেলনা সাপের ফিল্ম তৈরি করেছে। আগুনে ক্যামিকেল পুড়িয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে তাতে ফেলেছে সাপের ছবি। এর জন্যে স্পেশাল গ্লাস ব্যবহার করেছে ওরা। ধোঁয়ার পর্দার মধ্যে দর্শকদের মনে হয়েছে, জ্যান্ত সাপ দেখেছে।' একটু থেমে বলল, 'আমাদেরকেও বোকা বানিয়ে ফেলেছিল। পরে ভালমত চিন্তাভাবনা করতেই বুঝে গেছি আসল ব্যাপারটা।'

'আর গান?'

'ওটা ভ্যারাডের কাজ। প্রথমে ভেবেছি, টেপরেকর্ডার ব্যবহার করেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম, যন্ত্র নয়, নিজেই শব্দটা করেছে। ভেনট্রিলাকুইজম। শব্দ আর সুর ব্যবহারের বাহাদুরি আছে তার, স্বীকার করতেই হবে। বিকট গান প্রোজেক্টরের ঝিরঝিরও ঢেকে দিয়েছে। আউরোও এই ব্যাপারে ওস্তাদ।'

'সে-ও ভেনট্রিলাকুইস্ট?'

'হ্যাঁ, স্যার। ডক্টর স্মিথের কাছে টেপ করা আছে ভ্যারাডের বিকট গান, সেটা শুনে শুনে প্র্যাকটিস করে নিয়েছে আউরো। মিস মারভেলের চিকিৎসা করার সময় ব্যবহার করেছে।

'আউরো খুব চালাক। মিস মারভেলকে কিভাবে যে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল! আমি শিওর, তার গাউনের অন্য পকেটে আরেকটা সবুজ থলে ছিল। গড়াগড়ি করার সময় হাত সাফাই করে কোন এক ফাঁকে সাপভরা থলেটা পকেটে চালান করে দিয়ে, খালি থলেটা বের করে নিয়েছে।'

'ওঝাদের পুরানো কৌশল,' বললেন চিত্র পরিচালক। 'তা, ডক্টর স্মিথের এত আগ্রহ কেন মিস মারভেল আর প্রেতসাধকের ব্যাপারে, জিজ্ঞেস করেছ?'

'কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানসিক রোগীদের ওপর একটা বই লিখতে যাচ্ছেন তিনি,' বলল কিশোর। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে নাকি আজকাল বড় বেশি ছড়িয়ে পড়েছে এসব, লোককে হুঁশিয়ার করে দিতে চান। তাই, ব্ল্যাক ম্যাজিকের গন্ধ পেলেই ছুটে যান তিনি সেখানে, ঝুঁকিও নিতে হয় অনেক সময়। সাধকরা বাইরের লোককে বৈঠকে ঢুকতে দেয় না, ফলে লুকিয়েচুরিয়ে কাজ সারতে হয় ডক্টরকে। ওরা কি করে না করে, দেখেন, দরকার মনে করলে, তাদের কথাবার্তা, মন্ত্র, গান টেপ করে নেন, পরে গবেষণার জন্যে।'

'ওই কারণেই মিস মারভেলের প্রতি তার আগ্রহ?'

'হ্যাঁ। এতবড় বাড়ি পারকারদের, কাজের লোকও নেই, সুযোগ পেয়ে গেলেন ডক্টর। তাই কাজের লোকের ছদ্মবেশে কাছে কাছে থাকতে চেয়েছেন তিনি। আমরা মাঝখান থেকে গিয়ে পড়ে ভণ্ডুল করে দিয়েছি সব।'

'ও না থাকলে বিপদে পড়তে,' বললেন চিত্র পরিচালক। 'গুলি খেতে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' রবিন বলল। 'তবে মুসা যেদিন দেয়াল থেকে পড়ল, সেদিন বোধহয় ছিলেন না উনি।'

হাসলেন পরিচালক। 'ঠিক। তবে মুসা না থাকলে তোমরাও জিহাভোর হাত থেকে মুক্তি পেতে না। অন্তত নেকলেসটা তো যেতই। ও-ই বুদ্ধি করে কমেটের বাঁধন খুলে দিয়েছিল।'

হাসি ফুটল মুসার মুখে।

'হ্যাঁ, একটা ব্যাপার,' হাত তুললেন পরিচালক। 'ওই গ্যারেজের ওপরে বাসা ভাড়া নিতে গেল কেন ডক্টর? তার তো ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারই আছে?'

'রকি বীচ থেকে বাসাটা কাছে, তাই,' বলল কিশোর। 'জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বললেন, ওখান থেকে যখন খুশি চলে আসতে পেরেছেন পারকার হাউসে।'

'আউরোকে জোগাড় করল কোত্থেকে?'

'আউরো তাঁর স্ত্রী। জিপসি. ওঝাদের কাজকারবার দেখে দেখে অভ্যস্ত মহিলা। তাই ছদ্মবেশ নিতে আর অভিনয় করতে কোন অসুবিধে হয়নি।'

'হুম! আচ্ছা, ডক্টর জিহাভোর আসল পরিচয় জানা গেছে?'

'গেছে. স্যার,' জবাব দিল মুসা। 'নাম্বার ওয়ান ক্রিমিনাল, আসল নাম হগ রিমার। চুরি. জালিয়াতি. বাটপাড়ি. পকেট মারা, সব ব্যাপারে ওস্তাদ। ভ্যারাড আর রড তার সহকারী. অনেক দিন থেকেই। সব ক'জনের নাম আছে পুলিশের খাতায়। মেকসিকো আর নিউ ইয়র্কের পুলিশ অনেকদিন থেকে খুঁজছে ওদের। টাকার জন্যে সব করতে পারে ব্যাটারা. এমনকি খুনও।'

'হুঁ। জিনার খালার খবর কি?'

'ভাল অনেকটা। শিগগিরই নাকি আউরোর সঙ্গে আবার দেখা করতে যাবেন। চিকিৎসা করাতে.' রবিন জানাল।

'এসব মানুষ নিয়ে ভয়। লোককে অযথা বিপদে ফেলে দেয়।'

'হ্যাঁ, মিস পলের পা ভাঙার জন্যে তিনি কিছুটা হলেও দায়ী। তবে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে, যে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন! জিনাকে পাঠিয়ে র‍্যামন ক্যাসটিলোর ক্রিস্টাল বলটা কিনিয়েছেন, ওটা উপহার পাঠিয়েছেন মিস পলকে।'

'ভাল। জিনার কি খবর?'

'হোস্টেলে চলে যাবে, শিগগিরই। গেলে বাঁচি। ওর তো মুখের ঠিক-ঠিকানা নেই, আর এত মিছে কথা বলতে পারে! ওদিকে শুঁটকি টেরিরও আসার সময় হলো, কোন দিন রেগেমেগে গিয়ে তাকে আমাদের গোপন পথগুলোর খবর জানিয়ে দেবে, কে জানে!'

'খুব জেদি মেয়ে। এরা কিন্তু একদিক থেকে ভাল হয়। দলে টানতে পারো যদি, দেখো, বিপদের সময় তোমাদের জন্যে দরকার পড়লে প্রাণ দিয়ে দেবে। নিয়ে এলে না কেন ওকেও?'

'আসার সময় দেখলাম, ঘোড়া নিয়ে সৈকতে চলেছে, তাই আর ডাকলাম না,' কিশোর বলল।

'এই সুযোগে ঘোড়ায় চড়াটা শিখে নাও না তার কাছে? কাজে লাগবে, দেখো, পরে।'

'আমি বাদ, স্যার,' দু'হাত দু'দিকে নাড়ল মুসা। 'আরিব্বাপরে, যে কামড় মারে! আর লাথি!'

মুসার কথার ধরনে হেসে ফেললেন স্বভাব গম্ভীর মানুষটাও।

'আজ তাহলে উঠি, স্যার?' কিশোর উঠে দাঁড়াল।

'মুসা,' মিটিমিটি হাসছেন পরিচালক। 'আইসক্রীম?'

উঠে দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়ল আবার মুসা। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'তা স্যার, আনাতে পারেন!'

নিষ্পাপ সুন্দর হাসিতে ভরে গেছে মিস্টার ক্রিস্টোফারের কুৎসিত মুখটা। ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন।

রক্তচক্ষু

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে আরেকটি ব্যস্ত দিন। ট্রাক থেকে মাল নামাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ছোট অফিসের বাইরে একটা লোহার চেয়ারে বসে তাদের কাজ দেখছেন মেরিচাচী।

'কিশোর,' ডেকে বললেন তিনি, 'মূর্তিগুলো ওই টেবিলটায় রাখিস। দেখিস, ভাঙে না যেন। ভালই কাটতি হবে ওগুলোর, মনে হচ্ছে।'

একসঙ্গে অনেক পুরানো মাল নিলামে কিনেছেন রাশেদ পাশা, এক ট্রাক রেখে গেছেন, আরও আনতে গেছেন বোরিস আর রোভারকে নিয়ে।

পুরু করে ক্যানভাস বিছিয়ে তার ওপর যত্ন করে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে মূর্তিগুলো। আবক্ষ মূর্তি, শুধু বুক থেকে ওপরের অংশটুকু।

ট্রাকে উঠে মূর্তিগুলো দেখছে তিন গোয়েন্দা। অবাক হয়ে ভাবছে, এগুলো কার দরকার? কে কিনতে আসবে? নিয়ে গিয়ে করবেটা কি? মোট তেরোটা মূর্তি, বহুদিন অযত্ন অবহেলায় পড়ে থেকে রঙ চটে গেছে, ধুলো জমেছে পুরু হয়ে।

চার কোণা বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিগুলো, প্রতিটির আলাদা আলাদা নাম খোদাই করা রয়েছেঃ 'জুলিয়াস সিজার, অকটেভিয়ান, দান্তে, হোমার, ফ্র্যানসিস বেকন, শেকসপিয়ার,' জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'সব দেখছি বিখ্যাত লোক।'

'অগাসটাস অভ পোল্যাণ্ড,' রবিন পড়ল। 'অচেনা। কখনও শুনিনি।'

'লুথর,' বিসমার্ক,' আঙুল তুলে দুটো মূর্তি দেখাল মুসা। 'এসব নামও শুনিনি।'

'কিন্তু থিওডর রুজভেল্ট-এর নাম তো শুনেছ,' কিশোর বলল। 'কিংবা ওয়াশিংটন, ফ্র্যাংকলিন আর লিংকন?'

'নিশ্চয়,' মুসা বলল। 'এসো, ওয়াশিংটনকে দিয়েই শুরু করি।' নিচু হয়ে জর্জ ওয়াশিংটনকে তুলে নিল। 'আউফ! কি ভারি।'

'মুসা, সাবধান!' ডেকে বললেন মেরিচাচী। 'পায়ের ওপর ফেলো না, দেখো!'

'আমি নিচে নামছি, তারপর দিও,' লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামল কিশোর।

দু'হাতে মূর্তিটা জাপটে ধরে হাঁটু গেড়ে বসল মুসা। সাবধানে নামিয়ে দিল কিশোরের ছড়ানো বাহুতে। টলে উঠল কিশোর, বাঁকা হয়ে গেল পেছন দিকে। কোনমতে বয়ে এনে টেবিলে ফেলল আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্টকে। কপালের ঘাম মুছল।

'চাচী,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর, 'আমরা পারব না। একটা ফেলে দিলে যাবে পঞ্চাশ ডলার। তার চেয়ে বোরিস আর রোভার আসুক।'

'ঠিক,' মাথা ঝোঁকালেন মেরিচাচী, 'থাক। আসুক ওরা। তোরা জিরিয়ে নে-

গে. যা।'

বেশিক্ষণ জিরাতে পারল না তিন গোয়েন্দা. গেট দিয়ে আরেকটা বড় ট্রাক ঢুকল। গাড়ি চালাচ্ছে রোভার, পাশে বসে আছেন রাশেদ পাশা। ছোটখাট মানুষ, প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর ইয়া বড় গোঁফ। ট্রাকের পেছনে মালের বোঝার ওপর আরাম করে বসে আছে বোরিস।

প্রথম ট্রাকটার কাছে এনে দ্বিতীয়টাকে রাখল রোভার। তাড়াহুড়ো করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। ট্রাকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রয়েছে অনেকগুলো পুতুল. দরজিরা পোশাক তৈরি করতে যে ডামি ব্যবহার করে. ওই জিনিস। স্বাভাবিক উচ্চতার মেয়েমানুষের সমান ডামিগুলো [illegible] দিয়ে তৈরি. গলার ওপরে আর কিছু নেই. এক কোপে মুণ্ডুটা ফেলে দেয়া হয়েছে যেন. পা-ও নেই. দাঁড়িয়ে আছে একটা ধাতব দণ্ডের ওপর। পুরানো আমলের জিনিস. এগুলো আজকাল আর বিশেষ ব্যবহার হয় না।

বোকা হয়ে মূর্তিগুলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মেরিচাচী। চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ, 'আরে! এগুলো কি এনেছ! মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? এক ট্রাক পুরানো ডামি! হায় হায় হায় হায়! সব পয়সা পানিতে ফেলে এসেছ!'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' শান্ত কণ্ঠে বললেন রাশেদ পাশা। কম পয়সায় পেলে যে কোন বাতিল মাল কিনতে তিনি আগ্রহী। জানেন, কোনটাই পড়ে থাকে না ইয়ার্ডে। বিক্রি হয়ে যায়ই। কিশোরের দিকে ফিরলেন। 'তোর কি মনে হয়?'

'আমার তো ধারণা বিক্রি হয়ে যাবে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'আরচারি ক্লাবের ওরাই এসে কিনে নিয়ে যাবে, তীর ছোঁড়া প্র্যাকটিস করার জন্যে।'

'হুঁম্‌ম্‌!' ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন রাশেদ চাচা। 'নিতে পারে। ভাবো, আরও ভেবে দেখো। কাদের কাছে বিক্রি করা যাবে, ভেবে বের করো। তোমার কথা ঠিক হলে ফাইভ পারসেন্ট কমিশন তোমার।...তা, হ্যাঁরে, মূর্তিগুলোর ব্যাপারে কি মনে হয়? খুব ভাল জিনিস কিনেছি, না?'

'প্রথমে বুঝিনি ওগুলো দিয়ে কি হবে,' জবাবটা দিলেন মেরিচাচী। 'অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বের করেছি। বিজ্ঞাপন দেব। বাগানে সাজাতে পারবে লোকে। ফুলের ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মন্দ লাগবে না।'

'খামোখাই তো রেগে যাও,' সুযোগ পেয়ে গলার জোর বাড়ল রাশেদ চাচার, 'আসলে, সব জিনিসই কাজে লাগে।'

'তাই বলে ও ডামিগুলো কোন কাজে লাগবে না!'

লাগবে, লাগবে। কিশোর ঠিক একটা উপায় বের করে ফেলবে, দেখো। এই, রোভার, বোরিস, মূর্তিগুলো নামিয়ে ফেলো। দেখো, ভাঙে-টাঙে না যেন। চলটা উঠলেও আর কেউ কিনতে চাইবে না। সাবধানে নামাও।'

ছায়ায় গিয়ে বসলেন রাশেদ পাশা, পাইপ বের করে ধরালেন। দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের ওপর চোখ। দুজনেই বিশালদেহী, গায়ে ভীষণ জোর। ভারি মূর্তিগুলোকে এমনভাবে নামাচ্ছে, যেন ওগুলো তুলার পুতুল।

'পাহাড়ের মাথায় বিরাট এক পুরানো বাড়িতে ছিল মূর্তিগুলো,' বললেন রাশেদ চাচা। 'বাড়ি না ওটা, আস্ত এক দুর্গ! মালিক নেই, মারা গেছে। পুরানো জিনিসপত্র সব বেচে দিয়েছে, আমি যাওয়ার আগেই সব সাফ। মূর্তিগুলো অকাজের ভেবে কেউ নেয়নি। আর কিছু বই। একটা পুরানো সূর্যঘড়ি আর গোটা কয়েক চেয়ার পেয়েছি, বাগানে বসার চেয়ার। কিনে ফেললাম।'

মেরিচাচীর সঙ্গে কথা বলছেন চাচা। এই-ই সুযোগ, চুপচাপ ওখান থেকে সরে চলে এল তিন গোয়েন্দা, নিজেদের ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল।

সামনে লম্বা ছুটি, কি করে কাটাবে, সেই আলোচনায় বসল ওরা।

'কি করি?' মুসা বলল। 'চলো, মরুভূমিতে চলে যাই একদিন। পুরানো পোড়ো শহর দেখব।'

'তার চেয়ে সাবান কোম্পানির প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাক,' প্রস্তাব রাখল রবিন। 'জিততে পারলে হাওয়াই থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।'

'আমি, ভাবছি...,' কথা শেষ করতে পারল না কিশোর, তার আগেই মাথার ওপরের লাল আলোটা জ্বলতে-নিভতে শুরু করল।

'ফোন এসেছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'নিশ্চয় কেউ কোন সমস্যায় পড়েছে,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চেহারা।

দুই সুড়ঙ্গের পাইপের মুখের ঢাকনা সরিয়ে ফেলেছে মুসা ইতিমধ্যে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল তার ভেতর। মোটা একটা গ্যালভানাইজড পাইপকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জঞ্জালে ঢাকা একটা মোবাইল ট্রেলারের তলায়। ট্রেলারের ভেতরে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার।

পাইপের শেষ মাথায় আরেকটা ঢাকনা সরিয়ে ট্রেলারের ভেতর ঢুকল মুসা। তার পেছনে অন্য দুজন।

থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। 'হাল্লো! কিশোর পাশা।' টেলিফোন লাইনের সঙ্গে রক্ত স্পীকারের সুইচ অন করে দিল।

'ধরে থাকো, প্লীজ,' ভেসে এল একটা নারীকণ্ঠ। 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার কথা বলবেন।'

মিস্টার ক্রিস্টোফার! তারমানে আরেকটা রহস্যময় কেস!

'কিশোর,' গমগম করে উঠল চিত্র পরিচালকের ভারি কণ্ঠ, 'ব্যস্ত? আমার সামনে একজন বসে আছে। তোমাদের সাহায্য চায়। করতে পারবে?'

'নিশ্চয়, স্যার। সানন্দে। কি সাহায্য চায়?'

'কেউ একজন মূল্যবান কিছু রেখে গেছে তার জন্যে। কি জিনিস, কোথায় আছে, কিছুই জানে না সে। যদি কাল সকাল দশটায় আমার অফিসে আসো, ও থাকবে ওখানে।'

দুই

'দারুণ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'নতুন কেস! সময় কাটবে এবার!'

'মূল্যবান জিনিস রেখে গেছে!' ভ্রূকুটি করল রবিন। 'কি জিনিস জানে না! কোথায় আছে, তা-ও না! জটিল ব্যাপারই মনে হচ্ছে!'

'জটিল হলেই তো ভাল,' কিশোর বলল। 'কাজ করে মজা পাওয়া যাবে।'

'একটা গাড়ি পেলে ভাল হত,' আফসোস করল মুসা। 'এত বড় স্টুডিওতে ওই পুরানো পিকআপ নিয়ে যেতে খারাপ লাগে, ফকির ফকির মনে হয়।'

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানিতে ফোন করছি। রোলস রয়েসটা নিয়ে কাল সকালে হাজির হয়ে যাবে হ্যানসন।' ডায়াল শুরু করল সে।

এক সময় বিজ্ঞাপনের বাজি জিতে সোফারসহ একটা গাড়ি তিরিশ দিন ব্যবহারের জন্যে পেয়েছিল কিশোর। বিশাল এক রোলস রয়েস, পুরানো ধাঁচের রাজকীয় গাড়ি, ক্লাসিক্যাল চেহারা। চৌকো, বাক্সের মত দেখতে মূল শরীরটা কুচকুচে কালো। চকচকে পালিশ, মুখ দেখা যায়। মাঝে মাঝে সোনালি রঙের কাজ। প্রকাণ্ড দুটো হেডলাইট।

'হাল্লো!' বলল কিশোর। 'ম্যানেজার সাহেব আছেন? প্লীজ, দিন।...ম্যানেজার সাহেব? আমি কিশোর পাশা। আগামীকাল সকাল সাড়ে ন'টায় রোলস রয়েসটা দরকার, হ্যাঁ হ্যাঁ, শোফারসহ।'

'অসম্ভব!' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল বিস্মিত হয়েছে ম্যানেজার। 'তোমার তিরিশ দিন সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছে,' মুসা বলল। 'আরও কত তিরিশ দিন পেরিয়ে গেছে। দেবে কেন?'

মুসার কথায় কানই দিল না কিশোর। 'ম্যানেজার সাহেব, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আমার হিসেবে তিরিশ দিন পেরোতে এখনও অনেক দেরি।'

'কি বলছ!' মুসা অবাক। 'ভুল তো তুমিই করেছ!'

মুসার দিকে চেয়ে হাত নাড়ল কিশোর, চুপ করার নির্দেশ।

'তুমি ভুল করছ, খোকা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ম্যানেজার।

'ম্যানেজার সাহেব,' কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব ফোটাল কিশোর, 'শিগগিরই অন্য কথা বলবেন। আমি বিশ মিনিটের মধ্যে আসছি, সামনা-সামনি আলোচনা হবে।'

'আলোচনার কিচ্ছু নেই!' রুক্ষ হয়ে উঠল ম্যানেজারের কণ্ঠ। 'আসতে চাইলে এসো, কিন্তু কোন লাভ হবে না।'

'থ্যাংক্যু,' বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর। 'চলো। শহরতলীতে যাব।'

'কিন্তু ম্যানেজার ঠিকই বলেছে!' প্রতিবাদ করল মুসা। 'তিরিশ দিন সেই কবে শেষ...'

'সব সময় তিরিশ দিন পেরোলেই তিরিশ দিন হয় না,' রহস্যময় শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনার দিকে এগোল সে।

'কিন্তু...'

'খামোকা তর্ক করছ, মুসা,' রবিন বাধা দিল। 'ও যা ভাল বুঝছে, করুক না।

যদি গাড়িটা আবার পাই আমরা, ক্ষতি কি?'

সাইকেল নিয়ে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সৈকতের ধার ঘেঁষে চলে গেছে পথ, ঢুকেছে গিয়ে রকি বীচের একেবারে অন্তরে। বাঁয়ে উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে গাঢ় নীল প্রশান্ত মহাসাগর। দিগন্তের কাছে অনেকগুলো বিন্দু, সব মাছধরা নৌকা। ডানে আকাশ ফুঁড়ে উঠে যাওয়ার তাল করছে যেন সান্তা মনিকা পর্বতমালা, রুক্ষ, বাদামী।

প্রধান সড়কের এক মোড়ে রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানির বিশাল অফিস। সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে রেখে ভিতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা, আগে আগে হাঁটছে কিশোর, দ্বিধাজড়িত পায়ে তাকে অনুসরণ করছে মুসা আর রবিন। ওরা ঠিক জানে, বিফল হয়ে ফিরতে হবে।

অফিসেই রয়েছে ম্যানেজার। লাল চেহারা, কড়া মানুষ, সেটা চেহারাতেই স্পষ্ট। তিন গোয়েন্দাকে দেখে ভারি ভুরু কোঁচকাল। গম্ভীর।

'তিরিশ দিন গাড়ির ব্যবহারের কথা ছিল,' কোনরকম ভূমিকা করল না ম্যানেজার, 'করেছ। আবার কি চাই? গুণতে জানো না?'

'জানি, স্যার,' নরম হয়ে বলল কিশোর। 'আর খুব নিখুঁতভাবে গোণার চেষ্টা করি।' পকেট থেকে নোটবুক বের করে তার ভেতর থেকে বের করল একটা খাম। খাম থেকে ছোট একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজের টুকরো বের করে মেলল। জোরে জোরে পড়ল, 'রাজকীয় রোলস রয়েস ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ! সোফারসহ অন্যান্য সব খরচ-খরচা কোম্পানির। তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ব্যবহার করা যাবে গাড়িটা, যদি ছোট্ট একটা কাজ করতে পারেন। জারে ক'টা সীমের বীচি আছে আন্দাজ করে বলতে হবে। রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানি।'

ভুরু নাচাল ম্যানেজার। 'ঠিকই তো আছে। কথার বরখেলাফ করেছি আমরা? তিরিশ দিনের জন্যে গাড়িটা দেয়া হয়েছে তোমাকে, যখন ডেকেছ, পেয়েছ। দিনে-রাতে যখন খুশি।'

'লেখাটা আরেকবার ভাল করে দেখলে ভাল হত না, স্যার?' অনুরোধ করল কিশোর। 'লেখা হয়েছে, তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ব্যবহার করা যাবে।'

'গোলমালটা কোথায় দেখলে?' রেগে যাচ্ছে ম্যানেজার। 'চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, এটা তো সবাই জানে।'

'ঠিক বলেছেন,' সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরল কিশোর। 'যেটা সবাই জানে, সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলার দরকার কি? উল্লেখ করার কোন দরকার ছিল? বললেই চলত, তিরিশ দিনের জন্যে গাড়িটা পাওয়া যাবে।'

'ইয়ে...মানে...,' তোতলাতে শুরু করল ম্যানেজার, একটু যেন ঘাবড়ে গেছে। 'মানে, আমি পরিষ্কার করে সব বলতে চেয়েছিলাম।

'তা চেয়েছেন,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু আমার কাছে অন্যরকম লাগছে। আমি ধরে নিচ্ছি চব্বিশ ঘণ্টা করে তিরিশ দিন, তার মানে তিরিশ গুণন চব্বিশ। এখন আমার হিসেবে,' আবার নোটবই খুলল সে, 'আমি গাড়িটা ব্যবহার করেছি মোট সাতাত্তর ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট, মানে তিন দিনের কিছু বেশি। তাহলে, আরও

প্রায় সাতাশ দিন থেকে যাচ্ছে।'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। কিশোরের কথা উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। অযৌক্তিক কিছু বলছে না সে।

কথা হারিয়ে ফেলেছে ম্যানেজার। রাগে লাল চেহারা আরও লাল হয়ে উঠেছে।

'অসম্ভব!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ও-রকম কিচ্ছু বলিনি আমি! ওটা একটা কথা হলো নাকি?'

'সে জন্যেই তো, স্যার,' শান্ত রয়েছে কিশোর, 'যা বোঝানো দরকার ঠিক তাই বলা উচিত। কথা বড় খারাপ জিনিস, একটু এদিক ওদিক হলেই...। এই যে, দেখুন না, এখানে আপনি বোঝাতে চেয়েছেন...'

'না, আমি চাইনি!' গর্জে উঠল ম্যানেজার। 'আমার সব চেয়ে ভাল গাড়িটা তোমাকে সারাজীবনের জন্যে দিয়ে দেব ভাবছ! বিজ্ঞাপনে কি লেখা আছে না আছে, কেয়ার করিনি আমি। তিরিশ দিন বলেছি, তিরিশ দিনের জন্যে দিয়েছি। সময়সীমা শেষ। যাও।'

'কিন্তু আমরা তো ছিলামই না রকি বীচে,' প্রতিবাদ করল এবার রবিন। 'তিরিশ দিন কি করে ব্যবহার করলাম? কোন রকম ফাঁক না দিয়ে তিরিশ দিন ব্যবহার করতে হবে, এটাও তো লেখেননি। এ-ও তো ধরে নিতে পারি: বছরে একদিন করে আগামী তিরিশ বছর পাব আমরা গাড়িটা। নাকি।'

এই নতুন আঘাতে থতমত খেয়ে গেল ম্যানেজার। 'না...তা...!' মাথা কাত করল সে। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আর দু'বার গাড়িটা পাবে তোমরা। তবে কথা দিতে হবে, এরপর আর কখনও জ্বালাতে আসবে না। দু'বার, ঠিক আছে?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। খুব নিরাশ হয়েছে যেন। 'ঠিক আছে, কি আর করা? আপনাদের গাড়ি, জোর করে তো আর নিতে পারব না। রাজি, দু'বারেই রাজি। রবিন, চলো যাই।' ম্যানেজারের দিকে ফিরল আবার সে। 'কাল সকাল সাড়ে ন'টায় চাই একবার। পাওয়া যাবে?'

'যাবে। যাও।'

চুপচাপ বেরিয়ে হোঁসস্ করে শ্বাস ফেলল মুসা। 'রাজি হলে কেন? ব্যাটা আটকে গিয়েছিল, চাপ দিলেই কাজ হয়ে যেত।'

'না-ও হতে পারত,' কিশোর বলল। 'হয়তো কোর্টে নালিশ করতে বলত আমাদেরকে। বিচারে ঠকে যেতাম আমরা। তিরিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা করে ওই তিরিশ দিনকেই বোঝায়।'

'কিন্তু মাত্র দু'বার ব্যবহার করলেই বা কি, আর না করলেই বা কি?'

'তাই বা কম কিসে? গাড়িটা তো আর আমাদের সম্পত্তি না।' সুর করে বলে উঠল কিশোর, 'সামনে যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক।' চরণদুটো ইংরেজিতে আবার অনুবাদ করে বলল সে।

'তারমানে যা পেলাম, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলছ?' মুসা বলল।

'হ্যাঁ। কে জানে, নতুন কোন উপায় বেরিয়েও যেতে পারে। হয়তো আরও অনেক দিন অনেক বার গাড়িটা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েও যেতে পারি আমরা। আগামীকাল মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, প্যাসিফিক স্টুডিওতে পুরানো পিকআপ নিয়ে যেতে হচ্ছে না, এতেই খুশি আমি। ভাবছি, কি রসহ্য ওখানে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে!'

তিন

'এসো, এসো,' তিন গোয়েন্দাকে দেখেই ডাকলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'পরিচয় করিয়ে দিই।' বিশাল টেবিলের ধারে চেয়ারে বসা এক কিশোরকে দেখালেন তিনি। 'ও অগাস্ট অগাস্ট, ব্রিটিশ। অগাস্ট, এই আমাদের তিন গোয়েন্দা। ও কিশোর পাশা, বাড়ি বাংলাদেশ। ও মুসা আমান, আদিবাস ছিল আফ্রিকায়, এখন আমেরিকার নাগরিক। আর এ হলো রবিন মিলফোর্ড, এ-ও খাঁটি আমেরিকান নয়, আইরিশ রক্ত রয়েছে, তারমানে তোমার আর আমার বাড়ির কাছের লোক।'

এক এক করে চেয়ার টেনে বসল তিন গোয়েন্দা। উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিল ইংরেজ কিশোর। লম্বা তাল পাতার সেপাই, পাতলা চুল খুব লম্বা করে রেখেছে। চোখা উঁচু নাকের ঠিক মাঝখানে বসে আছে হর্নরিমড গ্লাসের চশমা। 'তোমাদেরকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।' একে একে হাত মেলাল তার সমবয়েসী তিন কিশোরের সঙ্গে। 'বন্ধুরা আমাকে গাস বলে ডাকে, অগাস্টের সংক্ষেপ আরকি, তোমরাও তাই ডাকবে।'

আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল অগাস্ট। 'আশা করছি, তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমার দাদার ভাই, মানে আমার আরেক দাদা, হোরাশিও অগাস্ট, এই কিছুদিন আগে মারা গেছে। তার উকিল আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে, চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিও না,' মাথা নাড়লেন চিত্র পরিচালক। 'অথচ হোরাশিও অগাস্টের ধারণা, তার নাতি সেটা বুঝতে পারবে। অগাস্ট, ওদেরকে দেখাও চিঠিটা।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে সেটা থেকে একটা কাগজ নিয়ে সাবধানে ভাজ খুলল অগাস্ট। কাঁপা হাতের লেখা রয়েছে তাতে। 'নাও,' কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে চিঠিটা। 'দেখো, কিছু বুঝতে পারো কিনা।'

দু'পাশ থেকে রবিন আর মুসাও ঝুঁকে এল চিঠিটার ওপর।

লেখা রয়েছেঃ

'আমার নাতি, অগাস্ট অগাস্ট,

'অগাস্ট তোমার নাম, অগাস্ট তোমার খ্যাতি, অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য পাহাড়-প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না; তোমার জন্ম তারিখের ছায়াতেই ওর অস্তিত্ব।

'গভীরে খোঁড়ো; আমার কথার অর্থ শুধু তোমার জন্যেই। স্পষ্ট করে বলতে পারছি না, তাহলে অন্যেরা বুঝে ফেলবে। ওটা আমার, ওটার জন্যে মূল্য দিয়েছি, ওটার মালিক হয়েছি, অথচ ওটার ভয়ে অস্থির আমি।

'তবে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, অর্ধশতাব্দী পর নিশ্চয় ওটার পঙ্কিল ক্ষমতা দূর হয়েছে। কিন্তু তবু ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করার উপায় নেই; ওটা হয় কিনতে হবে, কিংবা কারও কাছ থেকে উপহার পেতে হবে, কিংবা খুঁজে বের করতে হবে।

'সাবধান থেকো। সময় খুব মূল্যবান। ওটা আর আমার সব ভালবাসা তোমাকে দিয়ে গেলাম।-হোরাশিও অগাস্ট।'

'বাবারে বাবা!' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'চিঠি বটে!'

ইংরেজি না তো, গ্রীক!' বিড়বিড় করল মুসা। 'পঙ্কিল ক্ষমতা মানে কি?'

'হতে পারে, খারাপ কোন ক্ষমতা,' রবিন বলল। 'হয়তো ক্ষতি করার ক্ষমতা বা ওই জাতীয় কিছু বোঝানো হয়েছে।'

চুপচাপ চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে আছে কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে, তারমানে গভীর ভাবনা চলছে তার মাথায়। আস্তে করে কাগজটা আলোর দিকে তুলে ধরল, লুকানো সাংকেতিক লেখা আছে কিনা খুঁজছে।

'নেই, কিশোর,' বললেন পরিচালক, 'প্রথমেই ও-কথা ভেবেছি। স্টুডিওর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। অদৃশ্য কালি দিয়ে গোপন কিছু লেখা হয়নি। চিঠিটাই লেখা হয়েছে সাঙ্কেতিক ভাষায়। যে উকিল এটা অগাস্টের কাছে পাঠিয়েছে, সে জানিয়েছে, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে নাকি চিঠিটা লিখেছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। উকিলের হাতে চিঠি দিয়ে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, সময় এলে যাতে এটা তাঁর নাতির কাছে পাঠানো হয়। তারমানে, যা কিছু বলার এই চিঠিতেই বলেছেন হোরাশিও। তো, কিছু বুঝলে?'

'ইয়ে,' সাবধানে বলল কিশোর, 'একদিক থেকে, বলতে গেলে চিঠির মানে খুব পরিষ্কার।'

'পরিষ্কার!' কোথায় রয়েছে ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তুমি বলছ পরিষ্কার! আমার কাছে ওটা অমাবস্যার অন্ধকার!'

শুনলই না যেন কিশোর। ধ্যানমগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে চিঠিটার দিকে। হঠাৎ মুখ তুলল। 'একটা ব্যাপার একেবারেই স্পষ্ট, মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট এই চিঠির মানে তার নাতি ছাড়া আর কাউকে বুঝতে দিতে চাননি। কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছেন তিনি, গত পঞ্চাশ বছর ধরে। মহামূল্যবান কিছু একটা। আর কেউ জানলে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে, সেই ভয়ে নিজের নাতিকেও খুলে বলতে পারেননি কোথায় রেখেছেন জিনিসটা। এটুকু পরিষ্কার।'

'হ্যাঁ, তা বটে,' মাথা দোলাল মুসা। 'কিন্তু বাকিটা কাদা-পানির মতই ঘোলা।'

'হয়তো,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'কিছু কথার গভীর মানে আছে। বাকি কথাগুলো একেবারেই ফালতু, লোককে বিপথে সরানোর জন্যে। গোড়া থেকেই শুরু করিঃ অগাস্ট তোমার নাম।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল অগাস্ট, 'আর অগাস্ট আমার খ্যাতি,' সেটাও এক অর্থে ঠিক। অদ্ভুত নামের জন্যে স্কুলে প্রায়ই টিটকারি শুনতে হয় আমাকে, স্কুলের সবাই

একডাকে চেনে।'

'বুঝলাম,' রবিন বলল। 'কিন্তু অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য, এর মানে কি?'

'আমিও তাই ভাবছি,' কিশোর বলল। 'এক হতে পারে, অগাস্ট মাসের মধ্যে অগাস্ট তার জিনিসটা খুঁজে পাবে, এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু অগাস্ট না বলে অগাস্টে তোমার সৌভাগ্য বললেই ঠিক হত না?'

'হুম্‌ম্! ভাল কথা ধরেছ,' বললেন চিত্র পরিচালক। 'এমনও হতে পারে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে যা এসেছে কলমের মাথায়, লিখে ফেলেছেন।'

মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। 'উঁহু! তা হতেই পারে না। ভেবেচিন্তে খুব সাবধানে লেখা হয়েছে। এখনও ঠিকমত মানে বুঝতে পারছি না আমরা, তাই উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে।'

'আর দু'দিন পরেই আমার জন্মদিন,' অগাস্ট বলল, 'ছ' তারিখে। অগাস্টের গোড়াতে জন্মেছি বলেই আমার নাম অগাস্ট রেখেছে আমার বাবা। বলেঃ অগাস্টে জন্মে যে অগাস্ট, তার নামও হবে অগাস্ট। দাদার লেখা কিংবা বাবার কথার সঙ্গে আমার জন্মদিনের কোন সম্পর্ক নেই তো?'

কথাটা ভেবে দেখল কিশোর।

'জানি না,' বলল সে। 'হতে পারে, তোমার জন্মদিন খুব কাছে বলেই চিঠিতে লেখা হয়েছে? সময় খুব মূল্যবান।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল যেন মুসা। 'এই ঘোর রহস্যের কিনারা মাত্র দু'দিনে! তাহলেই হয়েছে!'

'তুমি থামো তো,' বিরক্ত হয়ে বলল রবিন, 'ওকে বলতে দাও।'

চিঠির দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'দ্বিতীয় বাক্যটাঃ পাহাড়-প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না, তোমার জন্ম তারিখের ছায়াতে-ই ওর অস্তিত্ব। প্রথম অর্ধেকটা বলছে, কিছুতেই পিছিয়ে আসবে না, কিন্তু শেষ অর্ধেকটা? নাহ্, বোঝা যাচ্ছে না।'

'আসলে, আমার জন্মের একটা ছায়া আছে,' অগাস্ট বলল, 'কালো ছায়া বলতে পারো। আমাকে জন্ম দিয়েই মারা যায় আমার মা। এটাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছে দাদা।'

'হয়তো,' কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ, 'তবে খাপে খাপে মিলছে না। পরের বাক্যটাঃ গভীরে খোঁড়ো, আমার কথার অর্থ শুধু তোমার জন্যেই। তারমানে, এই মেসেজ শুধু তোমার জন্যেই, ভালমত ভেবেচিন্তে এর মানে বের করো। কিন্তু গভীরে খোঁড়ার মানে কি? তারপরের বাক্যঃ স্পষ্ট করে বলতে পারছি না, তাহলে অন্যেরা বুঝে ফেলার ভয় আছে। এটা খুব পরিষ্কার কথা।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন পরিচালক। 'কিন্তু তারপরের বাক্যটা? ওটা আমার, ওটার জন্যে মূল্য দিয়েছি, ওটার মালিক হয়েছি, অথচ ওটার ভয়ে অস্থির আমি। এর কি মানে?'

'মিস্টার হোরাশিও বলেছেন,' কিশোর বলল, 'জিনিসটা তাঁর সম্পত্তি, ওটা নাতিকে দেয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু কোন কারণে জিনিসটার ব্যাপারে তাঁর একটা ভয়ও আছে, দারুণ ভয়!'

জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'তবে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, অর্ধশতাব্দী পর নিশ্চয় ওটার পঙ্কিল ক্ষমতা দূর হয়ে গেছে। কিন্তু তবু ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করার উপায় নেই, ওটা হয় কিনতে হবে, কিংবা কারও কাছ থেকে পেতে হবে, কিংবা খুঁজে বের করতে হবে।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল সে। 'কিছু বুঝেছ?'

মুসা বলল, 'মিস্টার হোরাশিও বলছেন, জিনিসটা পঞ্চাশ বছর ধরে আছে তাঁর কাছে। এতদিনে ওটা বিশুদ্ধ হয়ে গেছে, লোকের ক্ষতি করার ক্ষমতা হারিয়েছে।'

'তাহলে ওটাকে বিপজ্জনক কেন মনে করেছেন মিস্টার হোরাশিও?' রবিন প্রশ্ন রাখল। 'কেন বলছেন ঃ ওটাকে জোর করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করা যাবে না? কেন সাবধানে থাকার জন্যে হুঁশিয়ার করছেন গাসকে? আরও একটা ব্যাপার, সময়ের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। কেন? সাবধানেও থাকতে বলছেন, একই সঙ্গে তাড়াহুড়োও করতে বলছেন।'

'শেষ লাইন,' কিশোর পড়ল, 'ওটা আর আমার সব ভালবাসা তোমাকে দিয়ে গেলাম।' মুখ তুলল সে। 'মেসেজ শেষ। কিছু কিছু বোঝা গেল, কিন্তু শুরুতে যে অন্ধকারে ছিলাম, সে-অন্ধকারেই রয়েছি।'

'অমাবস্যার অন্ধকার, আগেই বলেছি,' মুসা বিড়বিড় করল।

'মিস্টার হোরাশিও অগাস্টের সম্পর্কে ভালমত জানা দরকার,' অগাস্টের দিকে ফিরল কিশোর। 'গাস, তোমার দাদা কেমন মানুষ ছিলেন?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল ইংরেজ কিশোর। 'কখনও দেখিনি। পরিবারের "রহস্যময়" লোক সে। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, এক সওদাগরী জাহাজে চেপে পাড়ি জমিয়েছিল দক্ষিণ সাগরে। কিছু দিন পর একটা চিঠি এল তার, তারপর নিয়মিত কয়েকটা। শেষে হঠাৎ করেই একদিন চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরিবারের সবাই ধরে নিল, জাহাজ ডুবে কিংবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে হোরাশিও। অনেক দিন পর আবার তার খবর পেয়ে চমকে উঠল আমার বাবা। হলিউডের এক উকিলের কাছ থেকে চিঠি এলঃ জনাব হোরাশিও অগাস্ট এই ক'দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর নাতি অগাস্ট অগাস্টের জন্যে কিছু তথ্য আর সম্পদ রেখে গেছেন। বাবার চিঠির সঙ্গেই এই সাংকেতিক চিঠিটা ছিল।'

'চিঠি পেয়েই ইংল্যাণ্ড থেকে চলে এসেছ?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'যত তাড়াতাড়ি পেরেছি,' অগাস্ট জানাল। 'প্লেনে এলে আরও অনেক আগে আসতে পারতাম। কিন্তু টাকা নেই বাবার। অনেক চেষ্টা করে শুধু একজনের জাহাজ ভাড়া জোগাড় করেছে, তাই আমি একা এসেছি। কয়েক হপ্তা লেগেছে আসতে। চিঠিটা পেয়েছি প্রায় দু'মাস আগে।'

'এসেই নিশ্চয় উকিলের সঙ্গে দেখা করেছ?'

মাথা নাড়ল অগাস্ট। 'এসে ফোন করেছি, কিন্তু উকিল তখন শহরের বাইরে, তাই দেখা করতে পারিনি। আজ করার কথা। আমেরিকায় কাউকে চিনি না আমি। আংকলকে ছাড়া,' মিস্টার ক্রিস্টোফারকে দেখাল অগাস্ট, 'বাবাও বিশেষ কাউকে চেনে না। সব শুনে আংকলই তোমাদের কথা বললেন, তোমাদের সাহায্য চাইতে

বললেন।'

'মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'তোমার সঙ্গে আমাদেরও উকিলের কাছে যাওয়া দরকার। তোমার দাদার ব্যাপারে জানা খুব জরুরী। কোন না কোন সূত্র পেয়ে যেতে পারি।'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা কাত করলেন পরিচালক। 'গাস, ওরা তোমাকে সাহায্য করবে। আর আমি তো আছিই। তো, এখন যাও, তোমাদের কাজ শুরু করো গিয়ে। আমারও জরুরী কয়েকটা কাজ আছে।' একটা ফাইল টেনে নিলেন তিনি।

ছেলেদেরকে দেখেই রাজকীয় রোলস রয়েস থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী ইংরেজ শোফার, হ্যানসন। দরজা খুলে ধরল।

পকেট থেকে আরেকটা চিঠি বের করল অগাস্ট। তাতে হলিউডের সেই উকিলের নাম আর ঠিকানা রয়েছে। শহরতলীর একটা ঠিকানা, উকিলের নাম রয় হ্যামার। কোথায় যেতে হবে হ্যানসনকে বলল কিশোর। নিঃশব্দে ছুটে চলল বিশাল রোলস রয়েস।

নানারকম আলোচনা চলল চার কিশোরের মাঝে। বেশিরভাগ প্রশ্ন করছে অগাস্ট, আমেরিকা, বিশেষ করে হলিউডের ব্যাপারে জানতে চাইছে সে, জবাব দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

চওড়া রাস্তা ছেড়ে সরু একটা গলিপথে গাড়ি নামিয়ে আনল হ্যানসন। পুরানো ধাঁচের ছোট একটা পুরানো বাড়ির সামনে এসে থামল।

'হুমম!' বাড়িটার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে নামল গাড়ি থেকে। 'বেশি পুরানো। উকিল সাহেব বাড়িতেই অফিস করে, মনে হচ্ছে।'

দরজার পাশে বেলের সুইচের গা ঘেঁষে বসানো হয়েছে একটা নেম প্লেট। তাতে লেখাঃ

রয় হ্যামার
অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল
বেল বাজিয়ে ঢুকে পড়ুন

বোতাম টিপল কিশোর। বেলের শব্দ শোনা গেল। নির্দেশ দেয়া আছে, কাজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সে, তার পেছনে অন্য তিনজন।

বসার ঘরটাকে অফিস বানিয়েছে হ্যামার। বড় একটা টেবিল, অনেকগুলো বুক শেলফে মোটা মোটা আইনের বই, আর কয়েকটা ফাইল কেবিনেট, তাতে ফাইল। একটা কেবিনেট খোলা, টেবিলে অগোছালো ভাবে পড়ে রয়েছে একটা ফাইল, কাগজপত্র এলোমেলো। টেবিলের পাশে উল্টে পড়ে আছে একটা চেয়ার। উকিল নেই ঘরে।

'কিছু একটা ঘটেছে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'গোলমাল!' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মিস্টার হ্যামার! মিস্টার হ্যামার! কোথায় আপনি?'

সাড়া নেই। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ছেলেরা।

আবার ডাকল কিশোর।

এইবার সাড়া মিলল। অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এল চাপা জবাব, ভাল

করে কান না পাতলে শোনাই যেত না।

'বাঁচাও! বাঁচাও! আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!'

চার

'আমাকে বাঁচাও!' আবার শোনা গেল চাপা কণ্ঠ। 'আমি মরে যাচ্ছি!'

'ওই যে!' উল্টো দিকের একটা দেয়াল আলমারির দরজা দেখাল মুসা. দুটো বুক শেলফের মাঝখানে দরজাটা। স্প্রিং লক লাগানো, পাল্লা ভেজিয়ে দিলে আপনাআপনি লেগে যায় এই তালা, ভেতর থেকে খোলা যায় না। নব ধরে মোচড় দিল মুসা, টান দিতেই হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা।

আলমারির মেঝেতে বসে রয়েছে ছোট্ট একজন মানুষ. হাঁ করে জোরে জোরে দম নিচ্ছে। সোনালি ফ্রেমের চশমায় সুতো বাঁধা, এক কান থেকে ঝুলছে চশমাটা। টাইয়ের নট ঢিলে, ঘাড়ের ওপর উঠে গেছে, বাঁকা হয়ে আছে টাই। সাদা চুল এলোমেলো।

'আহ্, বাঁচালে আমাকে!' ফিসফিস করে বলল লোকটা। 'ধন্যবাদ! ধরো, তোলো আমাকে, প্লীজ!'

আলমারির অপরিসর জায়গা থেকে লোকটাকে বের করে আনল মুসা আর রবিন, দাঁড়াতে সাহায্য করল।

উল্টে থাকা সুইভেল চেয়ারটা তুলে জায়গামত রাখল কিশোর। চেয়ারটা সোজা করেই ক্ষণিকের জন্যে স্থির হয়ে গেল, বিস্ময় ফুটল চেহারায়।

'আশ্চর্য!' আপনমনেই বিড়বিড় করল সে।

ধরে ধরে এনে লোকটাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল ছেলেরা। গভীর ভাবে কয়েকবার শ্বাস টানল সে। কাঁপা হাতে টাই ঠিক করল, চশমা বসাল নাকে।

'ঠিক সময়ে এসে পড়েছ!' গলা কাঁপছে এখনও তার। 'আরেকটু দেরি করলেই…!' শিউরে উঠল সে।

'আপনি নিশ্চয় মিস্টার রয় হ্যামার,' বলল রবিন।

এক এক করে চার কিশোরের ওপরই নজর বোলাল লোকটা। মাথা ঝোঁকাল। 'হ্যাঁ।' চোখ পিটপিট করল। 'কিন্তু তোমরা?'

'আমি অগাস্ট অগাস্ট, স্যার,' এগিয়ে এসে পরিচয় দিল ইংরেজ কিশোর। 'আজ আপনার সঙ্গে দেখা করার ডেট দিয়েছেন।'

'ও, হ্যাঁ,' আবার মাথা ঝোঁকাল উকিল। 'এরা তোমার বন্ধু, না?'

'এতে আমাদের পরিচয় পাবেন, স্যার,' তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল কিশোর।

'গোয়েন্দা!' কার্ডটা পড়ে অবাক হয়েছে হ্যামার।

'আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে ওরা,' অগাস্ট বলল।

'তাই?' আবার চোখ পিটপিট করল উকিল। আরেকবার তাকাল কার্ডটার দিকে। 'সুন্দর! খুব সুন্দর!'

চুপ করে রইল গোয়েন্দারা। অগাস্টও।

'তাহলে তোমরা গোয়েন্দা!' বিড়বিড় করল উকিল। 'খুব ভাল খুব ভাল। যার যা হওয়ার ইচ্ছে, ছোটবেলা থেকে সে পথে যাওয়াই ভাল।...হায় হায়!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আসল কথাই ভুলে গেছি! ব্যাটারা, ব্যাটারা আমাকে আটকে রেখেছিল!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল উকিল। চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে খোলা কেবিনেটটার ওপর দৃষ্টি আটকাল। 'হায় হায়! আমার ফাইল, গোপন কাগজপত্র! হারামজাদা আমার ফাইল ঘেঁটেছে। কি জানি নিল! আর এটা এখানে কেন!' টেবিলের ফাইলটার দিকে আঙুল তুলল সে। 'আমি তো রাখিনি!'

ফাইলের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উকিল, দ্রুত পাতা উল্টে চলল, দেখছে, কোন কাগজটা নেই।

'তোমার দাদার ফাইল এটা,' অগাস্টকে বলল হ্যামার। 'বিশ বছর ধরে ওঁর উকিল ছিলাম। ওঁর সম্পর্কে যত কাগজপত্র, সব এই ফাইলে রেখেছি। এটার প্রতি আগ্রহ হবে কেন!... মেসেজ,' চেঁচিয়ে উঠল উকিল, 'মেসেজটা নিয়ে গেছে!'

অগাস্টের দিকে তাকাল হ্যামার। 'তোমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছি, তার নকল! নিয়ে গেছে!...লেখাটা আগাগোড়াই অবশ্য অর্থহীন মনে হয়েছে আমার কাছে। তবু একটা কপি করে রেখেছিলাম। কেবিনেটে রেখেছি ফাইল, এর চেয়ে সাবধান আর হয় কি করে লোকে! কিন্তু দেখলে তো, গেল চুরি হয়ে!'

'কি হয়েছিল, স্যার, খুলে বলবেন?' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। 'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে!'

কাগজগুলো গুছিয়ে ঠিকঠাক করে ফাইলটা আবার কেবিনেটে রাখল উকিল। ড্রয়ার ঠেলে লাগিয়ে তালা আটকে দিল। তারপর বসল আবার চেয়ারে।

রয় হ্যামারের বক্তব্যঃ ডেস্কে বসে কাজ করছিল সে, এই সময় কোন রকম সাড়া না দিয়ে দরজা খুলে একটা লোক এসে ঘরে ঢুকল। মাঝারি উচ্চতা, কালো পুরু গোঁফ, চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। উকিল মুখ খোলার আগেই দুই লাফে কাছে চলে এল আগন্তুক, থাবা দিয়ে হ্যামারের নাকের ওপর থেকে চশমা ফেলে দিল, ধাক্কা দিয়ে তাকে চেয়ারসহ উল্টে ফেলল মেঝেতে, তারপর টেনে নিয়ে গিয়ে ভরল আলমারিতে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল, আপনাআপনি লেগে গেল অটোমেটিক তালা।

প্রথমে, দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে হ্যামার, চেঁচামেচি করে, সাহায্য চায়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারল, শক্তি আর আলমারির ভেতরের অক্সিজেন ক্ষয় করছে বৃথাই। বাড়িতে কোন চাকর-বাকর কিংবা আর কেউ নেই যে তার চিৎকার শুনবে। তাই চুপ করে গেল।

কয়েক মিনিট পর বাইরে বেরোনোর দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনল উকিল, বুঝল, তার আক্রমণকারী বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার আলমারির দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করল সে, খোলার চেষ্টা করল। শেষে হাল ছেড়ে দিল।

'কি আর করব, মেঝেতেই বসে পড়লাম!' বলল হ্যামার। 'জানি, আলমারির ভেতর যে বাতাস রয়েছে, তাতে আরও কয়েক ঘণ্টা টিকব। কপাল ভাল হলে কেউ

না কেউ এসে পড়তে পারে। ঈশ্বরের দয়া, তোমরা এলে।'

'কটা সময় এটা ঘটেছিল?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'শিওর না,' জবাব দিল উকিল। 'এই ধরো,' হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। নয়টা সতেরো বেজে বন্ধ হয়ে আছে কাঁটা তারমানে দেড় ঘন্টার ওপরে।'

'আমার ঘড়ি!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ব্যাটা যখন ধাক্কা দিয়ে ফেলল আমাকে, নিশ্চয় চোট লেগেছে! গেছে নষ্ট হয়ে।'

'তারমানে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'যে-ই এই কাজ করেছে, দুঘণ্টা সময় পেয়েছে হাতে। পালানোর। কোথায় আছে এখন কে জানে! এমন কিছু লক্ষ্য করেছেন? এমন কিছু, যা লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারে!'

'না। এতই চমকে গিয়েছিলাম, কিছুই খেয়াল করতে পারিনি। তাছাড়া সময়ও দেয়নি সে আমাকে। পুরু গোঁফ, আর ভারি চশমা! ও হ্যাঁ, চশমার কাচের ওপাশে তার চোখ যেন জ্বলছিল!'

'না, এতে চলবে না,' মুসার কণ্ঠে নিরাশা।

'না, চলবে না,' কিশোরও একমত হলো। 'আচ্ছা, এ ঘরে এমন কিছু দেখেছেন, যেটা অস্বাভাবিক ঠেকছে?'

পুরো অফিস ঘরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল উকিল। 'না, তেমন কিছুই তো না। মনে হচ্ছে, আমাকে আলমারিতে ভরেই সোজা ফাইল কেবিনেটের দিকে গেছে, কেবিনেট খুলে ফাইল বের করেছে, যা দরকার নিয়ে চলে গেছে। ব্যস।'

'হুঁম্‌ম্‌!' বিড়বিড় করল কিশোর, আপনমনেই বলল, 'তারমানে, কি খুঁজছে, জানা ছিল তার। জানা ছিল, ঠিক কোথায় ওটা পাওয়া যাবে! কয়েকটা কেবিনেটের এতগুলো ড্রয়ারের মধ্যে ঠিক ড্রয়ারটাই খুলল, ঠিক ফাইলটা বের করে আনল! অসংখ্য ফাইল, এত সহজে কি করে তা সম্ভব। তাছাড়া মেসেজটা ফাইলে আছে, তা-ই বা জানল কি করে সে?'

চোখ পিটপিট করল আবার উকিল। 'ইয়ে···মানে···কি জানি!'

'মিস্টার হোরাশিও মেসেজটা লেখার সময় আর কেউ কাছে ছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা নোয়াল হ্যামার, 'ওঁর দু'জন চাকর-চাকরাণী। ওরা স্বামী-স্ত্রী। বুড়ো-বুড়ি। মিস্টার অগাস্টের চাকরি করেছে অনেক বছর। বাড়িঘর দেখাশোনা, বাগান পরিষ্কার, বাজার, রান্নাবাড়া, প্রায় সব কাজই করেছে। বুড়োটার নাম হ্যারি, হ্যারিসন। মনিবের মৃত্যুর পর স্যানফ্রানসিসকোতে চলে গেছে ওরা। মেসেজটার কথা হয়তো শুনেছে ওরা, তারপর যে-ই মনিব মরেছে, তাঁর নাতিকে ফাঁকি দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'কিংবা কথায় কথায় অন্য কাউকে বলেছে ওরা,' মুসা সন্দেহ করল। 'হয়তো সেই তৃতীয়জন অনুমান করেছে, মিস্টার হ্যামারের কাছে মেসেজের কপি আছে! নিতে এসেছে।'

'তা-ও হতে পারে,' উকিল বলল। 'ওরা হয়তো ভেবেছে, মিস্টার হোরাশিও গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে। সাংকেতিক চিঠিতে মূল্যবান কিছুর কথা লেখা থাকলেই

লোকে ধরে নেয়, গুপ্তধন, কিংবা চোরাই টাকা। সেগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। সত্যি কথা কি, মিস্টার হোরাশিও খুব গরীব অবস্থায় মারা গেছেন। তাঁর বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা ছিল অন্যের কাছে, সেই লোকটা এখন বাড়ি দখল করে নিয়েছে। বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করে দোকানের বকেয়া বিল দিয়েছি, অনেক টাকা বাকি ফেলে গিয়েছিলেন হোরাশিও।'

'কিন্তু মেসেজ বলছে, মূল্যবান কিছু আমার জন্যে রেখে গেছে দাদা,' অগাস্ট প্রতিবাদ করল। 'এমন কিছু, কোন কারণে সেটাকে ভয় পেত সে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার শুরু করল উকিল। 'কি জিনিস, আমিও জানি না, আমাকেও বলেনি। কথায় কথায় অনেকবার বলেছেনঃ রয়, আমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো না তুমি, জানার চেষ্টাও করো না, আমি গোপনই রাখতে চাই। আমার নামেও গোলমাল আছে। আর হ্যাঁ, বাদামী চামড়া, কপালে উলকি দিয়ে তিনটে বিন্দু আঁকা রয়েছে, এমন কোন মানুষকে যদি কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দেখো, বুঝবে তুমুল ঝড় আসছে!

'আজব লোক ছিলেন মিস্টার ওয়েসটন…ইয়ে, মিস্টার হোরাশিও। অদ্ভুত, কিন্তু ভাল মানুষ। তাঁর গোপন ব্যাপার নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি, বলার জন্যে তাঁকে চাপাচাপি করিনি।'

'মিস্টার হোরাশিওর আরেক নাম ওয়েসটন ছিল?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, হেনরি ওয়েসটন নামেই হলিউডে পরিচিত ছিলেন। আমিও ওই নামই জানতাম। মৃত্যুর আগে আমাকে ডেকে আসল নাম বললেন, নাতির নাম-ঠিকানা জানালেন, নইলে চিঠি পাঠাতে পারতাম না।'

কেবিনের দিকে নজর ঘুরে গেল কিশোরের, সেই ড্রয়ারটার দিকে তাকাল, যেটাতে মিস্টার হোরাশিও অগাস্টের ফাইল রেখেছে উকিল।

'মিস্টার হ্যামার,' ড্রয়ারটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর, 'ভুল ড্রয়ারে রাখেননি তো ফাইলটা? অগাস্টের আদ্যাক্ষর এ, কিন্তু ওয়েসটনের বেলায়? নাকি ফাইলে নাম বদলে অগাস্টই লিখেছেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে সাবধান থাকি আমি, কাগজপত্র নিখুঁত রাখার চেষ্টা করি।'

'কিন্তু ওই লোকটা জানল কি করে? কেন সে ওয়েসটন খুঁজতে ডাবলিও লেখা ড্রয়ার খুলল না?'

'কি জানি,' ছাতের দিকে তাকাল উকিল। 'হয়তো, হয়তো হ্যারিসনরা কোনভাবে আসল নাম জেনে ফেলেছিল…ও, হ্যাঁ। একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের।'

উঠে গিয়ে 'এ' লেখা ড্রয়ারটা খুলে এক টুকরো কাগজ বের করল হ্যামার। একটা পেপার কাটিং। দৈনিক লস অ্যাঞ্জেলেস। এক খুঁতখুঁতে রিপোর্টার সন্দেহ করে বসেছিল, মিস্টার ওয়েসটনকে রহস্যময় লোক মনে হয়েছিল তার। খোঁজখবর শুরু করল। একদিন আমার কাছে এসে হাজির, তখন হোরাশিও মারা গেছেন, তাঁর আসল নাম গোপন করার আর কোন মানে দেখলাম না। বলে দিয়েছি

রিপোর্টারকে। হোরাশিওর অতীত জীবন সম্পর্কে সামান্য যা জানি, তা-ও বলেছি। কাগজে বেরিয়েছে, যে কেউ জেনে যেতে পারে তাঁর আসল নাম।'

কাগজের টুকরোটা কিশোরের হাতে দিল উকিল।

অন্য তিনজন ঘিরে এল কিশোরকে, কাগজের লেখা দেখতে।

ছোট অক্ষরে আকর্ষণীয় হেডলাইন ঃ ডায়াল ক্যানিয়নের নির্জন বাড়িতে রহস্যময় লোকটির মৃত্যু!

দ্রুত লেখাটা পড়ে ফেলল কিশোর। জানা গেল, বিশ বছর আগে হেনরি ওয়েসটন ছদ্মনাম নিয়ে হলিউডে এসেছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। তার আগে অনেক বছর কাটিয়েছেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে। ওখানে থাকতেই প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। তরুণ বয়েস তখন, দক্ষিণ সাগর থেকে শুরু করে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি জমিয়েছেন, বোধহয় ব্যবসার খাতিরেই।

হলিউডের উত্তরে নির্জন পাহাড়ী এলাকায় জায়গা কিনে মস্ত বাড়ি বানিয়েছিলেন হোরাশিও অগাস্ট। লোকালয় থেকে দূরে থেকেছেন যেন ইচ্ছে করেই। এত বড় বাড়ি দেখাশোনার জন্যে লোক রেখেছিলেন মাত্র দুজন। কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না তাঁর। পুরানো ঘড়ি আর বই সংগ্রহের বিচিত্র নেশা ছিল তাঁর, বিশেষ করে ল্যাটিন ভাষায় লেখা বই। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের ওপর ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা, ডয়েলের লেখা সমস্ত বইয়ের যতগুলো সংস্করণ পেয়েছেন, সবগুলোর কপি জোগাড় করেছেন তিনি। ছেলেবেলায় ইংল্যাণ্ডে থাকতে একবার বিখ্যাত ওই লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল হোরাশিওর, তারপর থেকেই তাঁর অন্ধভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ভক্ত হয়েছিলেন কোনান ডয়েলের অসামান্য সৃষ্টি গোয়েন্দা শার্লক হোমসের।

যতদূর জানা যায়, শান্তিতেই ডায়াল ক্যানিয়নের বাড়িতে বিশ বছর কাটিয়েছেন হোরাশিও অগাস্ট নামের রহস্যময় লোকটি! অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন, কিন্তু কিছুতেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি তাঁকে। নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে মরার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর, সে-জন্যেই হাসপাতালে যেতে চাননি। যা-ই হোক, শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়েছে মানুষটির।

লম্বা, সুদর্শন এক সুপুরুষ ছিলেন হোরাশিও অগাস্ট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, একটা ছবিই নেই তাঁর, বাড়ি থেকে যেমন বেরোতে চাইতেন না, ছবি তোলার ব্যাপারে ছিল তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা। তাঁর একমাত্র আত্মীয় থাকে ইংল্যাণ্ডে। ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেটে লিখেছেন ঃ হোরাশিও অগাস্টের শরীরে অজস্র কাটা দাগ। তরুণ বয়েসের অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের চিহ্ন বোধহয় ওই ছুরিতে কাটা দাগগুলো।

হোরাশিও অগাস্টের রহস্যময় অতীত রহস্যেই ঢাকা পড়ে আছে, বিশেষ কিছুই জানা যায়নি।

'আরিব্বাপ!' ফোঁস্ করে শ্বাস ফেলল মুসা। 'সত্যিই রহস্যময় লোক!'

'ছুরির দাগ!' বিড়বিড় করল অগাস্ট। 'অভিযান প্রিয়! চোরাচালানী ছিলেন না তো?'

'কারও ভয়ে যে লুকিয়েছিলেন,' রবিন বলল, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথমে ওয়েসট ইনডিজে গিয়ে লুকিয়েছিলেন, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে লুকিয়েছেন ডায়াল ক্যানিয়নে। লস অ্যাঞ্জেলেস আর হলিউডের হাজার রকম লোকে ভিড়ে সহজেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবেন, আশা করেছিলেন হয়তো।'

'বোধহয় পেরেছেনও,' রবিনের কথার পিঠে বলল কিশোর, 'নিজের বিছানায় শান্তিতেই চোখ বুজতে পেরেছেন। কিন্তু কেন এই ঘরকুণো মন? কার ভয়ে? বাদামী চামড়া, কপালে তিনফোঁটাওয়ালা লোকটাই বা কে?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। 'মনে পড়েছে! দশ বছর আগে, সেই ধোঁয়াটে শৈশবে...,' নাকমুখ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা চালাল সে। 'এক রাতে, সবে বিছানায় গিয়ে শুয়েছি। হঠাৎ নিচে কথা শুনলাম, কার সঙ্গে জানি উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে বাবা। বলল, 'কতবার বলব, চাচা কোথায় আছে জানি না! অনেক আগেই শুনেছি মারা গেছে! কোটি টাকা দিলেও সে কোথায় আছে বলতে পারব না!

'বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বসার ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বাবা আর অচেনা একটা লোক। নিচু গলায় কিছু বলল লোকটা, শুনতে পেলাম না। জবাবে জোরে জোরে বলল বাবা ঃ তোমার কাছে কোনটা কত জরুরী ওসব জানার দরকার নেই আমার! রক্তচক্ষুর নাম জীবনেও শুনিনি! চাচাও কখনও লেখেনি ওটার কথা। এখন বেরোও, আমি ঘুমাব।

'মাথা নুইয়ে বাবাকে বাউ করল লম্বা লোকটা, তারপর হ্যাট তুলে নেয়ার জন্যে ঘুরল। এই সময় ওপরে তাকাতেই আমার দিকে চোখ পড়ল তার, কিন্তু আমাকে দেখেও যেন দেখল না। হ্যাটটা তুলে নিয়ে আরেকবার বাবাকে বাউ করে বেরিয়ে গেল। বাবা কখনও ওর কথা আমাকে বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি, লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের কথা শোনা বাবা একদম পছন্দ করে না।

'জানো,' কণ্ঠস্বর খাদে নামাল অগাস্ট, 'ওই লোকটার রঙ ছিল বাদামী, কপালে তিনটে ফোঁটা। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি উলকি দিয়ে আঁকা হয়েছিল।'

'অউ!' বিচিত্র শব্দ করে উঠল রবিন। 'তোমার বাবার কাছে তোমার দাদার খোঁজ চেয়েছিল তিন-ফোঁটা!'

'বাবা মিথ্যে বলেনি। সত্যিই জানত না তখন দাদা কোথায় আছে।'

'রক্তচক্ষু!' আনমনে বলল কিশোর। 'মিস্টার হ্যামার, ওরকম কিছুর কথা কখনও বলেছিলেন মিস্টার হোরাশিও?'

'না,' মাথা দোলাল উকিল। বিশ বছর ধরে তাঁকে চিনতাম। কখনও ওই শব্দ উচ্চারণ করেননি। ইস্‌স্‌, রিপোর্টার ব্যাটার কাছে মুখ খুলে ভুলই করেছি! তখন কি আর জানতাম... ভেবেছি, মৃত লোকের আর কি এমন ক্ষতি করবে সে? একটা কথা অবশ্য বলিনি ওকে, শেষ দিকে কেমন জানি সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকতেন হোরাশিও। শত্রুরা যেন ঘিরে রেখেছে তাঁকে, তাঁর ওপর চোখ রাখছে। আমাকেও অবিশ্বাস করতেন তখন। কল্পিত শত্রুদের কাছ থেকে কি জানি লুকিয়ে রাখতে

চেয়েছেন।' অগাস্টের দিকে তাকাল হ্যামার। 'তারপরই তোমার কাছে সাংকেতিক চিঠি পাঠালেন তিনি।'

'হুঁ!' বলল কিশোর, 'মিস্টার হোরাশিওর কথা আপনার কাছে জানতে এসেছিলাম, জেনেছি। একবার ডায়াল ক্যানিয়নে যেতে চাই। কি বলেন? ওখানে নতুন কিছু জানতে পারব?'

'আমার মনে হয় না,' উকিল বলল। 'একেবারে খালি বাড়ি। বললামই তো, ধার শোধ করার জন্যে তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র বেচে দিয়েছি। বই, আসবাবপত্র, সব। যে লোকের কাছে বাড়ি বাঁধা ছিল, তিনি তিন-চার দিনের মধ্যেই বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করবেন। নতুন বাংলো তুলবেন ওখানে।

'তবে, তোমরা যেতে চাইলে, যাও। কিছু পাবে কিনা জানি না। গতকাল পর্যন্ত কয়েকটা বই ছিল, আর কয়েকটা মূর্তি, আবক্ষ মূর্তি। বিখ্যাত লোকদের মূর্তি। গতকাল ওগুলো এক স্যালভেজ ইয়ার্ডের মালিকের কাছে নিলামে বেচে দিয়েছি...'

'আবক্ষ মূর্তি!' বোলতা হুল ফোটাল যেন কিশোরের গায়ে। 'মিস্টার হ্যামার, আমরা যাই। যা জানার জেনেছি। থ্যাংক ইউ।'

দরজার দিকে রওনা দিল কিশোর। অবাক হয়ে তাকে অনুসরণ করল মুসা, রবিন আর অগাস্ট।

ঘষে ঘষে রোলস রয়েসের কালো উজ্জ্বল শরীরকে আরও চকচকে করে তুলছে হ্যানসন, গাড়িটাকে ভালবাসে সে।

'হ্যানসন, জলদি বাড়ি চলুন!' তাড়া দিল কিশোর। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন!'

নিঃশব্দে রকি বীচের দিকে ছুটল গাড়ি। গতিবেগ ইচ্ছেমত বাড়ানোর উপায় নেই, ট্রাফিক আইনে গতিবেগ বেঁধে দেয়া আছে।

'হঠাৎ এত তাড়া কেন, কিশোর?' আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলল মুসা।

'রক্তচক্ষু!' মুচকি হাসল গোয়েন্দাপ্রধান।

'কী!' ভুরু কুঁচকে গেল মুসার।

মিটিমিটি হাসছে কিশোর। 'রহস্য ভেদ।'

হাঁ হয়ে গেছে অগাস্ট। 'সত্যি বলছ!'

'মনে তো হয়,' কিশোর জবাব দিল। 'তোমার দাদার শার্লক হোমস প্রীতি আর আবক্ষ মূর্তিতেই রয়েছে রহস্যের সমাধান।'

'তুমিই জানো কি বলছ।' গোঁ গোঁ করে করে উঠল মুসা। 'শার্লক হোমস...আবক্ষ মূর্তি...সাংকেতিক চিঠির সঙ্গে কি সম্পর্ক?'

'পরে খুলে বলব,' কিশোর বলল। 'আপাতত একটা লাইন নিয়েই আলোচনা করা যাক। অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য?'

'কি সৌভাগ্য?' শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল মুসা।

অগাস্টও খিছুই বুঝতে পারছে না।

কিন্তু রবিন বুঝে ফেলল। 'আবক্ষ মূর্তি...রাশেদ চাচা যেগুলো কিনে এনেছেন! ওয়াশিংটন...লিংকন...আর, আর অগাসটাস অভ পোল্যাণ্ড...'

'অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য!' উত্তেজিত হয়ে পড়ল অগাস্ট। 'অগাস্ট... অগাসটাস! তারমানে অগাসটাসের মূর্তির ভেতরে কিছু লুকানো রয়েছে!'

'আমি শিওর,' কিশোর বলল। 'খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। শার্লক হোমস পড়তে ভালবাসতেন তোমার দাদা। কোনান ডয়েলের একটা গল্পের নাম ঃ দ্য অ্যাডভেঞ্চার অভ দ্য সিক্স নেপোলিয়নস, তাতে নেপোলিয়নের মূর্তির ভেতরে একটা মূল্যবান জিনিস লুকানো থাকে। ওটা পড়েই বুদ্ধি এসেছে মিস্টার হোরাশিও অগাস্টের মাথায়। সাধারণ একটা মূর্তির ভেতরে রক্তচক্ষু লুকানো আছে এটা কেউ ভাববে না। অগাসটাসকে বেছে নিয়েছেন, কারণ, এর সঙ্গে অগাস্ট নামের মিল রয়েছে।'

ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে গেল অন্য তিন কিশোর, তারপরই ফেটে পড়ল উল্লাসে।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেট দেখা গেল। গেটের সামনে এসে গাড়ি থামাল হ্যানসন। সে নেমে দরজা খুলবে কখন? তার আগেই ঝটকা দিয়ে দু'দিকের দরজা খুলে গেল, হুড়মুড় করে নেমে পড়ল চার কিশোর।

অফিসের কাছে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মূর্তিগুলো। সেদিকে চেয়েই দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেল কিশোর। গায়ের ওপর এসে পড়ল অন্য তিনজন, আরেকটু হলে ধাক্কা দিয়ে মাটিতেই ফেলে দিয়েছিল তাকে। ওরাও দেখল, বুঝল, কেন ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে কিশোর।

সকাল বেলায়ও যে টেবিলটাতে তেরোটা মূর্তি সাজানো ছিল, এখন সেখানে রয়েছে মাত্র পাঁচটা ঃ ওয়াশিংটন, ফ্র্যাঙ্কলিন, লিংকন, লুথার এবং থিওডর রুজভেল্ট।

অগাসটাস অভ পোল্যাণ্ড-এর মূর্তিটা নেই।

পাঁচ

পায়ে পায়ে এগোল চার কিশোর। টেবিলের ওপাশে অফিসের দেয়ালে বড় করে লেখা একটা নোটিশ টাঙানো ঃ মূর্তি দিয়ে বাগান সাজাতে চান? মাত্র পঞ্চাশ (৫০.০০) ডলার, প্রতিটি।

হতাশায় কালো হয়ে গেছে ছেলেদের মুখ।

কাচেঘেরা ছোট্ট অফিসে ডেস্কে বসে কি যেন পড়ছেন মেরিচাচী।

ঢোক গিলল কিশোর, গলা চড়িয়ে ডাকল, 'চাচী! আর মূর্তি কই?'

'বল তো কোথায়?' দরজায় বেরিয়ে এলেন চাচী, হাসি হাসি মুখ।

'বিক্রি হয়ে গেছে?'

'নিশ্চয়। আজ শনিবার, মনে নেই? শনিবারে সবচেয়ে বেশি কাস্টোমার আসে জানিসই তো। অনেকেই এসেছিল, চোখে পড়ল, পছন্দ হলো, আর কি রাখে? দামও কম। নিয়ে গেল।'

নিজের অজান্তেই মুখ বিকৃত করল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের লোকগুলো পাগল! আর শনিবার-রোববারে যেন বদ্ধ পাগল হয়ে যায়! কি করে, না করে তার ঠিক নেই! কিছু একটা যেন কিনতেই হবে, এমনকি পুরানো বাতিল মালের চত্বরেও

ভিড় জমে যায়। 'দুর্‌র্‌!' বিরক্তি চাপতে পারল না সে। 'চাচী, যারা নিল, ওদের নাম-ঠিকানা রেখেছ?' বলেই বুঝল, বোকার মত প্রশ্ন করে ফেলেছে।

'এই দেখো, দিন দিন জ্ঞান বাড়ছে! ওদের নাম-ঠিকানা রাখতে যাব কেন আমি? টাকা দিল, জিনিস নিয়ে চলে গেল। ওদেরকে আর কি দরকার আমার?'

'যারা নিয়েছে, তাদের চেহারা কেমন মনে আছে? অগাসটাস অভ পোল্যাণ্ডটা যে নিল?'

'কি ব্যাপার, বল তো কিশোর?' ভুরু কুঁচকে গেছে মেরিচাচীর। 'হঠাৎ ওই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন?'

চুপ করে রইল কিশোর।

কি বুঝলেন চাচী, কে জানে; বললেন, 'কালো স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসেছিল এক লোক, সে কিনেছে দুটো মূর্তি। মনে হলো, উত্তর হলিউডে থাকে সে। এক মহিলা নিয়েছে দুটো, মালিবুতে থাকে—জিজ্ঞেস করেছিলাম। লাল একটা সিড্যানে করে এসেছিল। বাকি চারটে কারা যে নিল, মনে করতে পারছি না। খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'চলো হে, ভেবে দেখি, এরপর কি করা যায়।'

ওয়ার্কশপে এসে ঢুকল ওরা। পাইপের মুখ থেকে লোহার পাত সরাতে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল অগাস্টের। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে তাকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

খুদে ল্যাবরেটরিটা দেখানো হলো মেহমানকে। ডার্করুম দেখাল অগাস্ট। 'সর্ব-দর্শন' পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখল, সাজানো গোছানো ছোট্ট অফিস আর সরঞ্জাম দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।

চেয়ারে বসল সবাই।

'এবার?' মুসা শুরু করল। 'এবার কি? অগাসটাসের মূর্তি গেল, সে সঙ্গে অগাস্টের জিনিসও। কোথায় কার বাগানে এখন শোভা বাড়াচ্ছে মূর্তিটা, কে জানে! লস অ্যাঞ্জেলেস আর তার আশেপাশে কম করে হলেও হাজারখানেক বাগান আছে, ওগুলোর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করা! এ-জীবনে হবে না!' হাত নাড়ল সে।

'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে,' নিরাশা গোপনের চেষ্টা করল অগাস্ট। 'ইস্‌স্‌, গতকালই যদি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতাম! আজ সকালে একেবারে···যাকগে। যা গেছে, সেটা নিয়ে ভেবে কিছু হবে না। এখন কি করা যায়? দাদা সময়ের ওপর জোর দিয়েছে, তারমানে বেশি সময়ও নেই আমাদের হাতে। তার দুর্ভাবনা ছিল, তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে জিনিসটা আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। গেলও তাই।'

'হয়তো চিরতরেই গেল,' অবশেষে মুখ খুলল কিশোর। 'কিন্তু এত সহজে পরাজয় মেনে নিতে পারব না। খুঁজে বের করবই।'

'কিভাবে?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'জানি না। ভাবতে হবে।'

'আচ্ছা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'এক কাজ করলেই তো পারি! ভূত-থেকে-ভূতে!'

'ভূত-থেকে-ভূতে!' চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন অগাস্টের। 'প্রেতজগতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি তোমাদের!'

'না,' হাসল রবিন। 'তবে কিশোর জগতের সঙ্গে আছে। এটা খুব ভাল আবিষ্কার, অবশ্যই কিশোরের। আচ্ছা, বলো দেখি, আশে পাশে কি আছে না আছে কারা বেশি খেয়াল করে? এই, নানারকম অদ্ভুত জিনিসপত্র?'

'কেন…,' বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল অগাস্ট। 'জানি না!'

'অবশ্যই বাচ্চারা,' মুসা বলল। 'বাচ্চাদেরকে বড়রা দেখেও দেখে না, ফলে বাচ্চারা এমন সব জায়গায় সহজেই ঢুকে যেতে পারে, যেখানে ঢোকা বড়দের জন্যে কঠিন। তাছাড়া, নানারকম জিনিসের দিকে বাচ্চাদের আকর্ষণ, এই যেমন, কুকুর, বেড়াল, কোন পাড়ায় নতুন কোন ছেলে বা মেয়ে এল, কোথায় কার বাগানে ফল পাকল, কোন বাগানে প্রজাপতি বেশি, এমনি সব ব্যাপার। বড়রা এসব খেয়ালই করে না।'

'বাচ্চারা একে অন্যকে সাহায্য করতে চায়, খুব খুশি হয়ে, নিঃস্বার্থভাবে,' মুসার কথার পিঠে বলল রবিন। 'আর রহস্যের গন্ধ পেলে তো কথাই নেই।'

'কিন্তু কজন বাচ্চাকে চেনো তোমরা?' অগাস্টের প্রশ্ন। 'এত বড় শহর। সবগুলো বাগান খুঁজতে হলে শহরের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকেই কাজে লাগাতে হবে। কি করে সম্ভব।'

'ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্যে,' হাসল মুসা। 'খুব সহজ। আমাদের সবারই অন্তত কয়েকজন করে বন্ধু আছে, সব ছেলেমেয়েরই থাকে। কিছু জানার দরকার হলে, আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে ফোন করব। তারা আবার তাদের বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করবে। সেই তারা আবার তাদের বন্ধদেরকে। এভাবে ছড়াতে থাকলে, অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, ভেবে দেখো। কোন বাগানে নতুন মূর্তি বসানো হয়েছে, জানাটা আর তত কঠিন মনে হচ্ছে?'

হাঁ করে আছে অগাস্ট।

'এখনও বুঝলে না?' আবার বলল মুসা। 'আচ্ছা ধরো, আমাদের তিন জনের,' রবিন আর কিশোরকে দেখাল মুসা, 'পাঁচজন করে বন্ধু আছে। তাদেরকে ফোন করে মূর্তির কথা জিজ্ঞেস করলাম আমরা। তারা হয়তো কিছু বলতে পারল না, কিন্তু তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে পারবে। ওরা আবার তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে। কি ঘটবে? দাবানলের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়বে পুরো লস অ্যাঞ্জেলেসে। কতগুলো ছেলেমেয়ে আছে এই শহরে? সবাই না হোক, তাদের অর্ধেকেও যদি একটা মূর্তি খুঁজতে শুরু করে…'

'হয়েছে, হয়েছে! আর বোলো না!' হাত নাড়তে শুরু করল অগাস্ট। 'বুঝতে পেরেছি! আরিব্বাপরে!' হিসেব শুরু করল সে। 'তোমরা তিনজনে পাঁচজন করে বললে হবে পনেরো জন, তারা বলবে পঁচাত্তর জনকে, সেই তারা আবার তিনশো পঁচাত্তর …পরের বারেই হাজার পেরোবে! সাংঘাতিক কাণ্ড!' শিস দিয়ে উঠল সে।

'এই পদ্ধতির নাম রেখেছি আমরা ভূত-থেকে-ভূতে,' গর্বের সঙ্গে বলল রবিন। 'সাংঘাতিক নাম। বড়দের সামনে বললেও ক্ষতি নেই, কিছুই বুঝবে না। বড়জোর হাসবে, বলবে, বাচ্চাদের খেয়াল!'

'তোমরা জিনিয়াস!' প্রশংসা না করে পারল না অগাস্ট। কিশোরের দিকে ফিরল। 'এখুনি ফোন করবে?'

'আজ শনিবার,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'বিকেলও হয়ে এসেছে। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই এখন বাইরে। ডিনারের আগে ফোন করে লাভ নেই। কয়েকটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হচ্ছে···'

'কিশোর!' মেরিচাচীর ডাকে বাধা পড়ল কথায়। ট্রেলারের ছাতে স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে আসছে শব্দ। 'এই কি-শো-র! কোথায় তোরা?'

ডেস্ক থেকে মাইক্রোফোন তুলে নিল কিশোর। ছাতে বসানো রয়েছে ছোট একটা শক্তিশালী স্পীকার, ভেতর থেকে বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইলে এটা ব্যবহার করে সে। আরও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। 'আমি এখানে, চাচী,' জবাব দিল সে। 'দরকার?'

'ওই দেখো, এবার স্পীকার লাগিয়েছে! জঞ্জালের ভেতর বসে যে কি করে ছেলেগুলো! পাগল হতে আর দেরি নেই! আরে অই কিশোর, ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে? পেটের খবর আছে, না নেই? খাবি-টাবি না?'

লাঞ্চ! প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। তাই তো! একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। অন্য ছেলেদেরও মনে পড়ল খাওয়ার কথা।

'আসছি, চাচী,' জবাব দিল কিশোর। 'সঙ্গে মেহমান আছে।'

'তখনই তো দেখেছি,' মেরিচাচী বললেন। 'ওকেও নিয়ে আয়। মাংসের বড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

কালো পুরু ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। আঙুল দিয়ে নিজের পেটেই চাঁটি দিল, তবলা বাজাল যেন। কিশোরের হাতে ধরা মাইক্রোফোনের ওপর ঝুঁকে বলল, 'বেড়ে ফেলুন গিয়ে, চাচী! আমরা এই এলাম বলে!'

'পাগল!' মেরিচাচীর সস্নেহ হাসি শোনা গেল।

সবার আগে ঢাকনা তুলে দুই সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল মুসা।

রাশেদ চাচা নেই, কি কাজে বাইরে গেছেন। হাতমুখ ধুয়ে এসে টেবিল ঘিরে বসে পড়ল ছেলেরা। মাংসের বড়া, রুটি, ডিমসেদ্ধ, আর কমলার রস দিয়ে লাঞ্চ সারা হলো।

'কিশোর,' এঁটো প্লেটগুলো সিংকে ফেলতে ফেলতে বললেন মেরিচাচী, 'আমি বাইরে বেরোব। রোভার গেছে তোর চাচার সঙ্গে, আমি বোরিসকে নিয়ে যাচ্ছি। ইয়ার্ডেই থাকিস, আমরা না ফিরলে যাসনে কোথাও।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করল কিশোর।

বেরিয়ে গেলেন মেরিচাচী।

আরেক গেলাস করে কমলার রস ঢেলে নিল ওরা।

'কিশোর,' গেলাসে চুমুক দিয়ে আবার নামিয়ে রাখল মুসা। 'মূর্তিটার ভেতরে কি জিনিস আছে?'

'রক্তচক্ষু।'

'কিন্তু ওই রক্তচক্ষুটা কি?' প্রশ্ন করল রবিন।

'ছোট কোন কিছু,' তার সামনের গেলাসটা আগে পিছে করছে কিশোর। 'নইলে মূর্তির ভেতরে রাখা যেত না। আর এত যত্ন করে যেহেতু লুকানো হয়েছে, নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু। নইলে এত কষ্ট করার কি দরকার ছিল? এখন প্রশ্ন, ওই মূল্যবান জিনিসটা কি? কোন ধরনের রত্ন? যার ঐতিহাসিক মূল্য আছে? তাই হওয়া উচিত। রত্নের নাম রাখার একটা ফ্যাশান ছিল আগে, এই যেমন গ্র্যাণ্ড মোঘল, স্টার অভ ইনডিয়া, পাশা অভ ইজিপ্ট, রক্তচক্ষুও সে-রকম কিছু। দূর প্রাচ্যের কোন দেশ থেকে হয়তো ওটা কিনেছিলেন মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট, তারপর কোন কারণে লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

'হুম!' বড় করে শ্বাস ফেলল মুসা। 'তোমার কথা ঠিক হলে...'

'চুপ!' বাধা দিল রবিন। 'লোক আসছে!'

চকচকে একটা সিড্যান গাড়ি, অফিসের বাইরে থামল। ড্রাইভিং সিটে ইউনিফর্ম পরা শোফার। পেছনের দরজা খুলে নামল লম্বা, পাতলা একটা লোক। টেবিলে রাখা অবশিষ্ট পাঁচটা মূর্তির দিকে তাকাল এক পলক।

লোকটার বাঁ হাতে পালিশ করা একটা কালো ছড়ি, অনেক বেতো রোগীর হাতে যেমন থাকে, ভর দিয়ে হাঁটার জন্যে। ছড়িয়ে ডগা দিয়ে আলতো খোঁচা দিল একটা মূর্তিকে, হাত বোলাল ওটার মসৃণ মাথায়। সন্তুষ্ট হতে পারছে না, চেহারাই প্রকাশ করে দিল। আঙুলের ডগায় লেগে যাওয়া ধুলো মুছল রুমালে, তারপর ঘুরল অফিসের দরজার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর। অন্যেরা যে যার জায়গায় বসে আছে। দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

ধোপদুরস্ত পোশাক পরা ঢেঙা লোকটার চামড়া বাদামী, কুচকুচে কালো চুল ছিল এক সময়, এখন ধূসর। আর কপালে তিনটে কালো ফোঁটা।

'এই যে, ছেলেরা,' চমৎকার ইংরেজি বলে তিন-ফোঁটা। 'মূর্তিগুলো,' ছড়ি তুলে দেখাল সে, চুপ করে গেল কিশোরকে তার কপালের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে।

মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরই বদলে গেল কিশোরের চেহারা। ঝুলে পড়ল নিচের ঠোঁট, গাল ফুলে গেল, সামান্য কুঁজো হয়ে গেল পিঠ। 'হ্যাঁ, স্যার, বলুন?' বকের মত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে গলা, আমূল বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। বোকা বোকা একটা ভাব।

'এগুলো ছাড়া আর আছে?' কেমন যেন শীতল কণ্ঠ লোকটার, মনে হয় দূর থেকে আসছে।

'আরও?' বুঝতে পারছে না যেন কিশোর।

'হাঁ, আরও মূর্তি? থাকলে দেখাও। জর্জ ওয়াশিংটন আর বেঞ্জামিন

ফ্র্যাঙ্কলিনকে দিয়ে চলবে না আমার। অন্য কাউকে দরকার।'

'এই-ই আছে,' কিশোর বলল। 'বাকিগুলো বিক্রি হয়ে গেছে।'

'আরও ছিল তাহলে?' কালো চোখের তারা ক্ষণিকের জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল লোকটার। 'নাম বলতে পারবে?'

'নাম···নাম!' মনে করার জন্যে চোখ বুজল কিশোর, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে। চোখ মেলল। 'অদ্ভুত সব নাম! হোম··· হোম···হোমার কি যেন! আগাস, হ্যাঁ হ্যাঁ, আগাসটুস জানি কোন জায়গার!'

'ও অমন করছে কেন?' রবিনের কানে কানে বলল মুসা।

'নিশ্চয় কারণ আছে,' ফিসফিস করে জবাব দিল রবিন। 'শোনো।'

'অগাসটাস!' চোখের পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তিন-ফোঁটার গোমড়া মুখ। 'অগাসটাসের একটা মূর্তি আমার দরকার! বাগানের জন্যে। ওটাও বিক্রি হয়ে গেছে?'

'গেছে,' মাথা কাত করল কিশোর।

'লোকটার নাম-ঠিকানা?' আদেশের সুরে বলল তিন ফোঁটা। 'ওর কাছ থেকে কিনে নেব।'

'নাম-ঠিকানা তো লিখে রাখি না!' হাত কচলে বলল কিশোর, যেন মস্ত অন্যায় করে ফেলেছে। 'কে যে নিল···'

'লিখে রাখো না!' কঠিন শোনাল লোকটার গলা। 'এখন থেকে রাখবে। দরকার পড়ে অনেক সময়।'

কিশোরও মনে মনে স্বীকার করল কথাটা।

'দেখো, নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে পারো কিনা,' বলল লোকটা। একশো ডলার বখশিশ দেব।'

'নাম-ঠিকানা লিখে রাখি না, স্যার,' আবার একই কথা বলল কিশোর। 'তবে, মাঝেসাঝে বাড়ি নেয়ার পর আর জিনিস পছন্দ হয় না কারও কারও, ফেরত নিয়ে আসে। আপনার কপাল ভাল হলে আসতেও পারে আগুসটাস। আপনার ঠিকানা রেখে যান।'

'ভাল বলেছ,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের চেহারায় কি খুঁজল লোকটা। 'তা রাখতে পারো।'

ছড়ির এক মাথায় লাগানো ফিতের ফাঁসে বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিল তিনফোঁটা, কনুইয়ের কাছে এনে ঝুলিয়ে রাখল। পকেট থেকে কার্ড আর কলম বের করে কিছু লিখে কার্ডটা বাড়িয়ে দিল কিশোরকে। 'নাও। এলেই ফোন কোরো। তুমি পাবে একশো ডলার, মূর্তিটার দাম আলাদা। হ্যাঁ, শুধু অগাসটাসের মূর্তি হলেই ফোন কোরো, আর কোনটা দরকার নেই।'

'আচ্ছা, স্যার,' ভোঁতা গলায় বলল কিশোর।

'ভুলে যাবে না তো?'

'মনে রাখার চেষ্টা করব, স্যার।'

'রাখলেই ভাল করবে!' ছড়ির ডগা দিয়ে মাটিতে হঠাৎ খোঁচা মারল তিন-

ফোঁটা। 'কাগজের টুকরো পড়ে নোংরা হয়ে আছে।'

ছড়ির ডগা কিশোরের দিকে ঠেলে দিল লোকটা।

চেঁচিয়ে উঠল অন্য তিন কিশোর।

ছড়ির আগা থেকে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে, তাতে গেঁথে রয়েছে কাগজের টুকরোটা। তীক্ষ্ণ ধার, পাতলা ঝকঝকে ছুরির ফলা ফুটখানেক লম্বা, চোখা মাথাটা কিশোরের বুক ছুঁই ছুঁই করছে।

'নোংরামি একদম দেখতে পারি না আমি,' বলল লোকটা, ইঙ্গিতে কাগজের টুকরোটা দেখাল। 'খুলে নিয়ে ঝুড়িতে ফেলো।'

আস্তে হাত বাড়িয়ে ছুরি থেকে কাগজটা খুলে নিল কিশোর।

ছড়ির হাতলের কাছে বোতাম রয়েছে, তাতে চাপ দিল লোকটা, ওর আঙুলের নড়া দেখেই বোঝা গেল। ঝট করে আবার ছড়ির খোড়লে ফিরে গেল ফলাটা। নিশ্চয় স্প্রিঙ-সিসটেমে কাজ করে। আবার সেই নিরীহ চেহারার ছড়ি হয়ে গেল মারাত্মক অস্ত্রটা।

'তাহলে বুঝতেই পারছ,' তীক্ষ্ণ হলো লোকটার গলা, 'ভুললে কি অবস্থা হবে? আমি আবার আসব। অগাসটাসের মূর্তি ফেরত এলেই ফোন করবে আমাকে।'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। টেবিলে রাখা পাঁচটা মূর্তির দিকে আরেকবার ফিরে চাইল, তারপর গটমট করে উঠল গাড়িতে।

চলে গেল চকচকে সিডান।

ছয়

গেট দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘুরল কিশোর। চেহারা ফেকাসে। হাতের কাগজটাকে দলা পাকিয়ে মুঠো করে রেখেছে।

'ওই লোকের সঙ্গে চালাকি চলবে না!' বলে উঠল মুসা। 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে পেটে!'

'আমাকে হুমকি দিয়ে গেল!' ঢোক গিলল কিশোর। দরজা দিয়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। 'সত্যিই বলেছ, ওর সঙ্গে চালাকি চলবে না। বুঝিয়ে দিয়ে গেল।'

'মনে হচ্ছে, এই লোকই দশ বছর আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিল,' অগাস্ট বলল। 'শিওর না, তবে ওই লোকটার মতই লাগল একে।'

'তোমাদের বাড়িতে যে এসেছিল, তার কপালেও তিনটে ফোঁটা ছিল,' রবিন বলল। 'এই লোকটাকেও দূর প্রাচ্যের লোক মনে হলো। হয়তো ভারতের কোন অঞ্চল থেকে এসেছে, কপালের ফোঁটা তিনটে হয়তো কোন গোত্র বা ধর্মের প্রতীক চিহ্ন।'

'কেন ওকে বললে অগাসটাসের মূর্তিটার কথা?' কিশোরের দিকে চেয়ে অনুযোগ করল মুসা। 'কাজটা বোধহয় ভাল হলো না!'

'না বললে বিপদে পড়তাম,' কিশোর চিন্তিত। গেলাস তুলে ঢকঢক করে গিলল কমলার রস, ভিজিয়ে নিল শুকনো গলা। 'ও জেনেশুনেই এসেছে। সেটাই

শিওর হয়ে নিলাম বলে দিয়ে। উকিল রয় হ্যামারের ফাইল থেকে চিঠির কপিও হয়তো ও-ই সরিয়েছে।'

'কিন্তু ওর চশমাও নেই, কালো গোঁফও নেই,' মনে করিয়ে দিল অগাস্ট।

'কাগজ চুরি করার জন্যে লোক ভাড়া করতে পারে,' রবিন বলল। 'যেভাবে যা-ই করুক, অগাসটাস ওর কাছে মূল্যবান। তারমানে, জানে'।'

'এখানে তথ্যের জন্যে এসেছিল,' কিশোর বলল। 'আমারও তথ্য দরকার। ও তেমন কিছু জেনে যেতে পারেনি, কিন্তু আমি জেনে নিয়েছি। লোকটার নাম-ঠিকানা রেখে দিয়েছি!'

তিন-ফোঁটার দেয়া কার্ডটা রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। সবাই ঝুঁকে এল, কি লেখা আছে দেখতে। ছাপানো রয়েছে ঃ

কালিচরণ রামানাথ

কাটিরঙ্গা, ভারত।

অদ্ভুত ঠিকানা! কাটিরঙ্গার কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই লেখা নেই। তার নিচে কলম দিয়ে লিখেছে হলিউডের একটা হোটেলের নাম আর ফোন নম্বর।

'ভারত!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'রবিন ঠিকই বলেছে! কোন খুনে গোত্রের লোক নয় তো তিন-ফোঁটা! তাহলে রক্তচক্ষু খোঁজায় ইস্তফা! শুনেছি, আফ্রিকার চেয়েও খারাপ জায়গা ভারত। ওখানে নানারকম হিংস্র উপজাতির বাস, ধর্মের জন্যে মানুষ বলি দেয় যখন-তখন! দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে ভস্ম করে দিতে পারে পুরোহিতরা, গলা কেটে মুণ্ডু আলাদা করে...'

'আরে দূর, কি যা-তা বলছ!' বাধা দিল কিশোর। 'ওসব বাজে কথা, লোকের বানানো গপ্পো।' রবিনকে বলল, 'তোমার কিছু কাজ বাড়ল, নথি।'

'তাই তো চাই,' রবিন বলল। 'কি কাজ?'

'রক্তচক্ষুর ব্যাপারে খোঁজ নেবে। লাইব্রেরিতে কোন বইয়ে দেখো তো, ওটার উল্লেখ আছে কিনা। আমার মনে হয়, রত্ন কিংবা মূল্যবান পাথরের ওপর লেখা রেফারেনস বইয়ে পেয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে,' মাথা নাড়ল রবিন। 'তো এখন যাই। লাইব্রেরিতে যাব আগে। ওখানে কাজ সেরে বাড়ি ফিরব।'

'যাও। ভূত-থেকে-ভূতে চালু করে দিও ডিনারের আগেই।'

সাইকেল নিয়ে চলে গেল রবিন।

'বরং বাদই দাও!' হঠাৎ বলল অগাস্ট। 'তোমাদেরকে কতখানি বিপদে ফেলছি, আমিও জানি না! অবস্থা বিশেষ ভাল ঠেকছে না! রয় হ্যামারের বাড়িতে ডাকাত পড়ল, তিন-ফোঁটা এসে তোমাকে হুমকি দিয়ে গেল। কিশোর, সামনে মহাবিপদ! তোমাদেরকে বিপদে ফেলার কোন যুক্তিই নেই, রক্তচক্ষুর কথা ভুলে বরং বাড়ি ফিরে যাই আমি। অগাসটাসকে খোঁজার দরকার নেই তোমাদের। পারলে তিন-ফোঁটা কিংবা কালো-গোঁফোই খুঁজে নিক, ওটা নিয়ে মারামারি করুকগে ওরা।'

'খুব ভাল কথা বলেছ,' সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল মুসা। 'কি বলো, কিশোর?'

কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধানের চেহারা দেখেই জবাব পেয়ে গেল সে। জটিল রহস্য সমাধান করতে দেয়া হয়েছে কিশোর পাশাকে, রক্তের গন্ধ পেয়েছে ব্লাডহাউন্ড, আর তাকে বিরত করা যাবে না।

'মাত্র তো শুরু করলাম, সেকেন্ড,' কিশোর বলল, 'এখনি কি? রহস্যই তো চাই আমরা, পেয়েছিও, এখন সেটার কিনারা না করেই পিছিয়ে যাব? কাজের কথায় আসি। কয়েকটা ব্যাপার অদ্ভুত ঠেকছে!'

'যেমন?'

'আলমারিতে নিজেই নিজেকে আটকে রেখেছিল রয় হ্যামার,' বোমা ফাটাল কিশোর।

বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না অগাস্ট। 'আটকে রেখেছিল! কেন?'

'সেটাই বুঝতে পারছি না।'

আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে মুসা। 'আলমারিতে কি করে আটকা পড়ল নিজে নিজে? চেহারা দেখে মনে হয়েছে, ঝড়ে পড়েছিল, ওই অবস্থাই বা করল কি করে নিজের?'

'দেখে যা মনে হয়, তাই হতে হবে এমন কোন কথা নেই,' এক আঙুল দিয়ে গাল চুলকালো কিশোর। 'ভাবো। নিজের মগজকে কাজে লাগাও।...উকিল বলেছে, দেড় ঘণ্টা ধরে আলমারিতে আটকে আছে, বলেনি?'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ।'

'বেশ। তাহলে তার কথামত, সে ওই দেড়টি ঘণ্টা খানিক পর পরই চেঁচিয়েছে, দরজায় ধাক্কা দিয়েছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু ওই রকম পরিস্থিতিতে একজন মানুষ সাধারণত কি করবে প্রথমে?'

'প্রথমেই চশমা ঠিক করবে!' চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। 'হয় নাকে বসাবে, কিংবা খুলে পকেটে রেখে দেবে। অন্ধকারে পকেটেই রাখে বেশিরভাগ লোকে। সুতো বেঁধে কান থেকে দেড় ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা...উঁহু! অসম্ভব!'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা চুলকালো মুসা। 'আরও একটা ব্যাপার, চশমা ঠিক করার পরেই টাই ঠিক করত। টেনেটুনে নট ঢিলা করত, সোজা করত টাইটা, যেভাবে বাঁকা হয়েছিল খুব অস্বস্তি লাগার কথা। কিশোর, ঠিকই আন্দাজ করেছ। ওই ব্যাটা চশমা আর টাই উল্টোপাল্টা করে রেখেছিল ইচ্ছে করেই, আমাদের বোকা বানানোর জন্যে।'

'রহস্যের সমাধান করতে হলে সমস্ত ব্যাপার খতিয়ে দেখতে হবে, খুঁটিনাটি কিচ্ছু বাদ দেয়া চলবে না,' কিশোর বলল। 'তোমাদের মতই আমিও প্রথমে বোকা বনেছিলাম। ...এসো, এখানে এসো। দুজনেই।' চেয়ার থেকে উঠে সরে দাঁড়াল সে। 'চেয়ারের গদিতে হাত দিয়ে দেখো। টেবিলেও হাত রাখো।'

কিশোর যে চেয়ারটায় বসেছিল, তার গদিতে হাত রেখে দেখল মুসা আর অগাস্ট। চেয়ারের সামনে টেবিলেরও খানিকটা জায়গায় হাত বোলাল।

'কি বুঝলে?' ভুরু নাচাল গোয়েন্দাপ্রধান।

'চেয়ারের গদি গরম,' বলল অগাস্ট। 'টেবিলও।'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। রয় হ্যামারের চেয়ার তুলতে গিয়েও এই একই ব্যাপার দেখেছি। চেয়ারের গদি গরম, বড়জোর মিনিট খানেক আগে ওতে বসেছিল কেউ। এরপর যখন ওর চশমা আর টাইয়ের কথা ভাবলাম, আর কোন সন্দেহ রইল না। বুঝে গেলাম কি ঘটেছে।

'আমাদেরকে আসতে দেখেছে সে, গাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছে। তাড়াতাড়ি চেয়ারটা উল্টে রেখে গিয়ে আলমারিতে ঢুকছে, চশমা আর টাই উল্টোপাল্টা করেছে। আমরা তার ঘরে ঢুকেছি, সাড়া পেয়েই শুরু করেছে চেঁচামেচি। দু'তিন মিনিটের বেশি আলমারিতে ছিল না সে।'

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ও-কাজ করতে গেল কেন?'

'আমাদের বিপথে নেয়ার জন্যে,' কিশোর বলল। 'বোঝানোর জন্যে, চিঠির কপি সত্যিই চুরি গেছে। আসলে মিছে কথা বলেছে।'

'তারমানে, চশমাধারী, কালো গোঁফওয়ালা, মাঝারি উচ্চতার কোন লোক নেই?' অগাস্টের প্রশ্ন।

'আমার তো তাই মনে হয়। সব হ্যামারের বানানো কথা। যা মনে হচ্ছে, তিন-ফোঁটা কালিচরণ রামানাথের টাকা খেয়েছে সে, কপিটা দিয়ে দিয়েছে তাকে। আমাদেরকে কি করে বোকা বানাবে, সেটাও হাতুড়ি মিয়ারই পরিকল্পিত।'

'হাতুড়ি মিয়া!' বুঝতে পারছে না অগাস্ট।

'হ্যামারের বাংলা হাতুড়ি, কাউকে সম্বোধন করতে মিয়া বলে আমাদের দেশে, অনেক ক্ষেত্রে টিটকারির ছলে।'

'অ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওই হাতুড়ি মিয়ারই যত শয়তানী। হুঁ, এখন বোঝা যাচ্ছে, তিন-ফোঁটা কার কাছে খবর পেল এখানে মূর্তিগুলো আছে। চিঠি পড়েই বুঝেছে সে, অগাস্টাসের মূর্তির ভেতর রয়েছে জিনিসটা।'

'ব্যাটা আবার আসবে বলে গেছে!' মুসা বলল। 'সঙ্গে করে না আরও কয়েকটা কয়েক-ফোঁটাকে নিয়ে আসে! যদি বিশ্বাস না করে আমাদের কথা? যদি ভাবে, অগাসটাসের মূর্তি কোথায় আছে আমরা জানি, তাকে মিছে কথা বলছি? শুনেছি, ভারতের লোকেরা নাকি কথা আদায়ের জন্যে খুব অত্যাচার করে মানুষের ওপর!'

'দেখো, অত্যাচার সব দেশেই আছে। আমেরিকানরা কম অত্যাচার করেছিল চীনাদের ওপর? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসী আর জাপানীরা কি করেছে? আজও ইহুদীরা যে অত্যাচার চালাচ্ছে প্যালেসটাইনীদের ওপর, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে! আর ইংরেজরা কি করেছিল?' অগাস্টের ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেল কিশোর। 'গাস, কিছু মনে কোরো না, আমি ইতিহাসের কথা বলছি। ভারত দখল করেছিল ওরা জোর করে, দু'শো বছর ধরে একটানা অকথ্য অত্যাচার, অনাচার চালিয়েছে, বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিল লর্ড ক্লাইভ আর তার চেলারা, ওদের তুলনায় ভারতের মানুষ ফেরেশতা...'

'হয়েছে, হয়েছে কিশোর, থামো!' দু'হাত তুলল মুসা। 'আমি মাপ চাইছি!'

'সরি!' লজ্জিত হলো কিশোর। 'উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ইনডিয়াকে কেউ খারাপ বললে সইতে পারি না। ওটা আমার দেশ…'

'বাংলাদেশ না?' অগাস্ট প্রশ্ন করল।

'বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান আগে একটাই দেশ ছিল, ক্লাইভের চেলাদের কাছে "ব্লাডি ইনডিয়া", ওরাই ভাঙনের বীজ বুনে এসেছে, ভাগাভাগি করে দিয়ে এসেছে একটা অখণ্ড সোনার দেশকে।…যাকগে, ওসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। সব দেশেই ভালমন্দ আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম…ফোন বেজে উঠল, বাধা পড়ল তার কথায়।

উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। 'হাল্লো। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড।'

'মিসেস প্যাশা আছেন?' মহিলাকণ্ঠ ভেসে এল। 'আমি মালিবু বীচ থেকে বলছি। মিসেস হ্যামলিন।'

'তিনি তো নেই, বাইরে গেছেন। জরুরী কিছু? আমাকে বলবেন? চাচী এলেই বলব।'

'ও, তোমার চাচী? গুড। কি নাম তোমার, খোকা?'

'কিশোর পাশা। কিশোর।'

'হ্যাঁ, কিশোর, গতকাল দুটো মূর্তি কিনেছিলাম তোমাদের ওখান থেকে। বাগানে সাজাব বলে।'

'সাজিয়েছেন?' সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর।

'না, পারলাম আর কই? ধুলোময়লা খুব বেশি ছিল, বাগানে ফেলে পাইপের পানি দিয়ে ধুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একেবারে নরম কাদা দিয়ে তৈরি। পয়লা চোটেই কান খসে গেল, তারপর চলটা উঠতে শুরু করল, ওগুলো ঘরে রাখার জিনিস, বাগানে বৃষ্টিতে চব্বিশ ঘণ্টাও টিকবে না। ভাবছি, ফেরত নেবে কিনা! বাগানে তো সাজাতে পারলাম না, তোমার চাচী অবশ্য তাই বলেছিল…'

'সরি, মিসেস হ্যামলিন, আমরা জানতাম না ওগুলো মাটির। পুরানো জিনিস কিনি তো, কোন্‌টা যে খারাপ পড়বে, ঠিক বোঝা যায় না। আপনি মূর্তি পাঠিয়ে দিন, পয়সা ফেরত নিয়ে যাবে। আচ্ছা, কার মূর্তি নিয়েছিলেন?'

'কার মূর্তি মানে?'

'মূর্তিগুলো তো সব বিখ্যাত লোকের, নামটা জানতে চাইছি।'

'অ। তা ঠিক বলতে পারব না। তবে পোল্যাণ্ড নামটা মনে আছে, পোল্যাণ্ডের কি যেন?'

'অগাসটাস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অগাসটার অভ পোল্যাণ্ড। আজব নাম! তা মূর্তিগুলো পাঠিয়ে দিতে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। কাল আমিই নিয়ে আসব।'

'আপনি আর কেন কষ্ট করবেন?' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'আমরাই বরং আসি, দোষটা তো আমাদেরই, টাকা ফেরত দিয়ে মূর্তি নিয়ে আসব। আজ

বিকেলেই আসি?'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়।'

'ঠিকানাটা দিন।'

ঠিকানা লিখে নিয়ে মিসেস হ্যামলিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। ফিরে তাকাল।

কৌতূহলে ফেটে পড়ছে মুসা আর অগাস্ট। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'অগাসটাস অভ পোল্যাণ্ডকে পাওয়া গেছে, হাসল কিশোর। 'বোরিস ফিরে এলেই যাব। নিয়ে আসব মূর্তিটা!'

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তিন-ফোঁটার কাছ থেকে খবরটা গোপন রেখো আল্লাহ্!'

মুসার কথার ধরনে হেসে ফেলল কিশোর আর অগাস্ট।

সাত

রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্ট-টাইম চাকরি করে রবিন, হাত খরচের টাকাটা এসে যায়, মা-বাবার কাছে চাইতে হয় না, তাছাড়া পছন্দসই জিনিস কেনার ব্যাপারও আছে। তবে সবচেয়ে বড় সুবিধে, ইচ্ছেমত যখন-তখন এসে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা যায়, লাইব্রেরিয়ানের অনুমতি নিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়, এখানে চাকরি না করলে এই সুবিধেটা পেত না।

অসময়ে রবিনকে লাইব্রেরিতে ঢুকতে দেখে অবাক হলেন না প্রৌঢ়া লাইব্রেরিয়ান মিস হকিনস। তবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে, রবিন? আজ তো তোমার ডিউটি নেই।'

'একটা তথ্য দরকার, আপা,' রবিন বলল। 'কয়েকটা বই দেখব।'

'আ, তাই বলি, অসময়ে আমাদের ছোট গোয়েন্দা এখানে কেন?' মিষ্টি করে হাসলেন মিস হকিনস। 'এসে ভালই করেছ, রবিন। আজ যা কাজ না! একটু সাহায্য করবে? না না, বেশি কিছু না, এই কয়েকটা বই একটু র‍্যাকে তুলে দেবে। পারবে?'

'নিশ্চয়, দিন,' এগিয়ে এল রবিন।

বইগুলোর অবস্থা দেখে পাঠকদের ওপর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রবিনের, এত অযত্ন করে! কোনটার মলাট ছিঁড়ে ফেলেছে, কোনটার সেলাই ছিঁড়ে যাওয়ায় ভেতরের পাতা বেরিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় এগুলো র‍্যাকে তোলা উচিত হবে না, এরপর টানাটানিতে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। বেশি ছেঁড়া বইগুলো তুলে নিয়ে হলের পেছনের ছোট একটা ঘরে চলে এল। সুচ-সুতো-ছুরি-কাঁচি-আঠা, সবই আছে এখানে। কাজে লেগে গেল সে। সেলাই করে, আঠা লাগিয়ে, মলাট জুড়ে দিয়ে আবার প্রায় নতুন করে ফেলল সে বইগুলোকে, গভীর মমতায় একবার হাত বোলাল ওগুলোর ওপর, তারপর এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল র‍্যাকে।

বাকি বইগুলো নিয়ে এল রবিন। স্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা

মোটা বই, নতুনই রয়েছে মলাট। নামটা দেখে চমকে উঠল। সেঃ ফেমাস জেমস অ্যাণ্ড দেয়ার স্টোরিজ। ঠিক এই ধরনের একটা বই-ই মনে মনে খুঁজছিল সে।

রবিনের চমকে ওঠা লক্ষ্য করলেন মিস হকিনস। 'কি ব্যাপার, রবিন?'

আনমনেই মাথা নাড়ল রবিন। বইটা তুলে নিয়ে এল মহিলার কাছে। 'এটার জন্যেই এসেছিলাম। টেবিলে পড়ে আছে!'

'আরে!' মিস হকিনসও চোখ কপালে তুললেন। 'আশ্চর্য! কয়েক বছর ধরে র‍্যাকে পড়ে আছে ওটা, ছুঁয়েও দেখে না কেউ! আজ একই দিনে দু'জনের দরকার পড়ল!'

'কে পড়ছিল, মনে আছে?'

'না। আজ এমনিতেই ভিড় বেশি, তাছাড়া কোন্ টেবিলে কে কি পড়ছে, এখানে বসে কি করে জানব!'

বোকার মত প্রশ্ন করে বসেছে সে—ভাবল রবিন। কে হতে পারে?

'আচ্ছা, লোকটার কি কালো গোঁফ ছিল?' আবার জিজ্ঞেস করল সে। 'চোখে হর্ন-রিমড চশমা? এই মাঝারি উচ্চতা...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরকম একটা লোক এসেছিল বটে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস হকিনস। 'তবে ও-ই এই বই পড়েছে কিনা...না না, ঠিক, ও-ই পড়েছে! আমাকে এ-ধরনের বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলা, সে-জন্যেই মনে করতে পেরেছি। চেনো নাকি ওকে?'

'না, শুনেছি।' বাকি বইগুলো র‍্যাকে তুলতে চলল সে। মনে ভাবনার ঝড়। কালো-গুঁফো এই বই পড়ছিল কেন? কি জানতে চেয়েছিল? লোকটা কে?

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বইটা নিয়ে এসে কোণের দিকে প্রায় নির্জন একটা টেবিলে বসল রবিন।

গভীর আগ্রহে বইয়ের বিশেষ বিশেষ জায়গা পড়ে চলল সে। পৃথিবীর বিখ্যাত সব রত্ন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর ইতিহাস, বিভিন্ন তথ্য। যেটাই ধরছে, ছাড়তে পারছে না। জোর করে শেষে 'হোপ' হীরার অধ্যায়, থেকে চোখ সরাল, পাতা উল্টে চলল। হঠাৎ করেই পেয়ে গেল রক্তচক্ষু, পুরো একটা অধ্যায় লেখা রয়েছে ওটার ওপর।

পায়রার ডিমের সমান একটা পদ্মরাগমণি। কখন, কোথায়, কিভাবে আবিষ্কার হয়েছে ওটা, কেউ জানে না। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে পাথরটার নাম জানে চীন, ভারত আর তিব্বতের মানুষ। রাজা-মহারাজা, সম্রাট, রানী, রাজকুমারী, বড় বড় সওদাগর, অনেকেই এর মালিক হয়েছে, কিন্তু কেউ ধরে রাখতে পারেনি বেশিদিন। কারও কাছ থেকে চুরি হয়েছে, কারও কাছ থেকে ছিনতাই, বেশ কয়েকজন খুনও হয়েছে ওটার জন্যে। শুধু তাই নয়, রাজায় রাজায় লড়াই বাধিয়েছে ওই চুনি, সিংহাসন ছাড়া করেছে রাজাকে, কাঙাল বানিয়ে বনবাসে পাঠিয়েছে। অন্তত পনেরো জনের রহস্যময় মৃত্যু ঘটেছে ওই পাথরের জন্যে।

মহামূল্যবান রক্তচক্ষু, অদ্ভুত নামকরণের কারণ, দেখতে ওটা মানুষের চোখের মত, রং রক্তলাল। মহামূল্যবান কেন হলো ওটা, জানা যায়নি, বরং উল্টোটাই

হওয়ার কথা। রক্তচক্ষু নিরেট নয়, মস্ত খুঁত আছে, ভেতরটা ফাঁপা তবু এর জন্যে পাগল মানুষ! কেন!

পড়তে পড়তে অধ্যায়ের শেষে চলে এল রবিন। লেখা রয়েছেঃ

'মূল্যবান অনেক পাথরই আছে, যেগুলো অভিশপ্ত, দুর্ভাগ্য বয়ে আনে মালিকের। বারবার হাত বদল হয়েছে ওগুলো, কেউ মরেছে, কেউ সাংঘাতিক অসুখে ভুগেছে ওগুলোর জন্যে, কারও বা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ওগুলোর মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে কেউই নিরাপদ ছিল না। হোপ হীরা ওসব পাথরের একটা, মানুষের ক্ষতি করেই চলছিল, শেষে ভয়ে ওটাকে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটকে দান করে দিয়ে বাঁচল ওটার শেষ মালিক। রক্তচক্ষু ও-রকম আরেকটা অভিশপ্ত পাথর। ওটার মালিক হয়ে দুর্ভাগ্যের কবল থেকে বেঁচেছে খুব কম লোকেই। শেষে ওটাকে ভারতের এক মহারাজ দান করে দিলেন ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম কাটিরঙ্গার "ন্যায়-বিচারের মন্দির"-এ (গ্রাম এবং মন্দিরের নামের ব্যাপারে মতান্তর আছে)।

'মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিয়োজিত রয়েছে একদল দুর্ধর্ষ পাহাড়ী উপজাতির লোক, ভয়ানক যোদ্ধা ওরা। দেব-মূর্তির কপালে খোচিত ছিল রক্তচক্ষু। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, পাপীকে ধরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আছে পাথরটার। কাউকে দোষী সন্দেহ হলে, তাকে নিয়ে আসা হত রক্তচক্ষুর সামনে। যাকে আনা হলো, সে পাপী হলে, জ্বলে উঠবে পাথরটা।

'অনেক বছর আগে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় রক্তচক্ষু। এখন কোথায় আছে, কেউ জানে না, অথচ আজও এর আশা ছাড়েনি মন্দিরের লোক, দুনিয়াময় খুঁজে বেড়াচ্ছে পাথরটা। গুজব রয়েছে, মন্দিরেরই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে পাথরটা বিক্রি করে দিয়েছে বিদেশী কারও কাছে। কেউ বলে পাথরটা এখন অপঘাতে মরা চোরের কবরে পড়ে রয়েছে, তার শুকনো হাড়গোড়ের মাঝে। কেউ বলে, না, কবরে নেই,অন্য জায়গায়, আবার একদিন উদয় হবে। পুরানো কিংবদন্তী বলে: পঞ্চাশ বছর মানুষের ছোঁয়া না পেলে রক্তচক্ষুর ক্ষতি করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে, অভিশাপ মুক্ত হয়ে যাবে, তখন কেউ ওটা খুঁজে বের করতে পারলে, উপহার পেলে, কিংবা ন্যায্য দামে কিনে নিলে তার আর ক্ষতি হবে না। তবে, চুরি কিংবা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া চলবে না, তাহলে যে নেবে তার ক্ষতি হবেই।

'কিছু রত্ন-সংগ্রাহক গোপনে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাথরটা। অভিশপ্ত হোক বা না হোক, পাথরটা তাদের চাই-ই। তবে ক্ষীণ একটা আশাও রয়েছে ওদের, হয়তো পঞ্চাশ বছরে শুদ্ধ হয়ে গেছে রক্তচক্ষু।'

'বাপরে!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। ওই পাথরের কাছ থেকে দূরে থাকাই উচিত!—মনে মনে বলল। কি ভেবে পাতা উল্টে বইটা কবে লেখা হয়েছে, দেখে নিল। বেশ কয়েক বছর আগের ছাপা। কয়েকটা প্রশ্ন ভিড় জমাল মনে। কতদিন আগে চুরি হয়েছে রক্তচক্ষু? সত্যিই ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে পাথরের? তা যদি হয়, পঞ্চাশ বছর পর কি আসলেই শুদ্ধ হয়ে যাবে রক্তচক্ষু।

চিন্তিত ভাবে বইটা নিয়ে র‍্যাকে রেখে দিল রবিন। একটা এনসাক্লোপীডিয়া

খুলে খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল কাটিরঙ্গা, কয়েক লাইন লেখা রয়েছে জায়গাটার ওপর। পাহাড়ঘেরা খুব দুর্গম অঞ্চল, অধিবাসীরা ভয়ংকর প্রতিহিংসা-পরায়ণ।

ঢোক গিলল রবিন নিজের অজান্তেই, গলা শুকনো। রক্তচক্ষু আর কাটিরঙ্গার ব্যাপারে যা যা জেনেছে, নোট লিখে নিল। ভাবছে। কিশোরকে ফোন করে জানাবে? না, তত তাড়াহুড়ো নেই। পরে জানালেও চলবে। তাছাড়া ডিনারের সময় হয়ে এসেছে। বাড়িতে বলে আসেনি, দেরি করলে মা বকবেন!

মিস হকিনসকে 'গুড-বাই' জানিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। বাড়িতে পৌঁছে দেখল, ডিনার তৈরি করছেন মা, বাবা বসে বই পড়ছেন, মুখে পাইপ।

ছেলের সাড়া পেয়েই মুখ তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এই যে, এসেছ। ভাবছ কি? মনে হচ্ছে, মস্ত কোন সমস্যায় পড়ে গেছ?'

'বাবা,' এগিয়ে এল রবিন, 'অগাসটাস অভ পোল্যাণ্ডের নাম শুনেছ? কে ছিলেন, জানো?'

'না,' মাথা নাড়লেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'অগাসটাস...অগাসটাস...অগাস্ট, হ্যাঁ, অগাস্ট নামটা জানি। কি করে হয়েছে, তা-ও জানি। তুমি জানো?'

রবিন জানে না। খুলে বললেন তাকে মিস্টার মিলফোর্ড। গায়ে পিন ফোটাল যেন কেউ, এমনিভাবে লাফিয়ে উঠল রবিন। প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল ফোনের কাছে।

কিন্তু কিশোরকে পাওয়া গেল না, জানালেন মেরিচাচী। আধ ঘন্টা আগে বোরিস আর মুসাকে নিয়ে মালিবু বীচে গেছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

'আমি আসছি,' রবিন বলল। 'এলে ওকে বলবেন। থ্যাংক ইউ,' ফোন রেখে দিল সে।

দরজার দিকে আবার রওনা দিতে যাবে, এই সময় মায়ের ডাক কানে এল। 'এই, তোমরা খেতে এসো, আমার হয়ে গেছে।'

বাধ্য হয়েই আবার ফিরতে হলো রবিনকে। বাবার কাছ থেকে যা জেনেছে, কিশোরকে জানানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গলায় বার বার খাবার আটকে যেতে লাগল তার।

মিসেস হ্যামলিনের বাড়ি খুঁজছে তখন কিশোর, মুসা আর অগাস্ট।

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল। বড় বাংলো টাইপের বাড়ি, চারপাশ ঘিরে রেখেছে বাগান।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন কিশোর। লাল ইঁটের পথ চলে গেছে সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগানের মাঝখান দিয়ে। বাড়ির দরজায় এসে বেল বাজাল কিশোর।

সুন্দর চেহারার একজন মাঝবয়েসী মহিলা দরজা খুলে দিলেন, পরনে হালকা পোশাক।

'আমি কিশোর পাশা, স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে এসেছি,' পরিচয় দিল কিশোর। 'মূর্তিগুলো কোথায়?'

'ও, এসো এসো, ওই যে ওখানে।'

গলা শুনেই বুঝল কিশোর, মিসেস হ্যামলিন।

পথ দেখিয়ে বাগানের কোণে এক জায়গায় ওদেরকে নিয়ে এলেন মহিলা। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যেন পড়ে আছে অগাসটাস অভ পোল্যাণ্ড, করুণ অবস্থা। নাক নেই, একটা কান খসে গেছে, শরীরের জায়গায় জায়গায় খাবলা দিয়ে ছাল-চামড়া-মাংস তুলে নেয়া হয়েছে যেন। কিন্তু ফ্র্যানসিস বেকন বহাল তবিয়তেই রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে, ওটাকে ধোয়া হয়নি, ধুলো জমে রয়েছে গায়ে আগের মতই।

'ফিরিয়ে দিতে খারাপই লাগছে,' মহিলা আন্তরিক দুঃখিত, 'খুব শখ করে এনেছিলাম। আসলে, বাগানে বসানোর জিনিস নয় এগুলো, ঘরে রাখার জন্যে বানিয়েছে। পানি লাগলেই শেষ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাববেন না,' আশ্বাস দিল কিশোর, 'ইয়ার্ডে প্রায়ই পুরানো মাল আসে। আপনার কথা মনে রাখব। বাগানে সাজানোর উপযুক্ত, পাথরের তেমন মূর্তি এলেই দিয়ে যাব আপনাকে,' অগাসটাসকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি সে। 'এই যে নিন, আপনার টাকা। নিয়ে যাই তাহলে মূর্তিদুটো?'

টাকাটা নিলেন মিস হ্যামলিন, গুণে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না, সায় জানিয়ে মাথা কাত করলেন।

দু'হাতে মূর্তিটাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে এগোল কিশোর, ভারের জন্যে তার শরীর বাঁকা হয়ে গেছে পেছন দিকে। মুসা তুলে নিল বেকনকে।

সাবধানে গাড়িতে মূর্তিদুটো নামিয়ে রাখল মুসা আর কিশোর। হাঁপাচ্ছে।

'আরিব্বাপরে!' ফোঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল মুসা। 'কি ভারির ভারি!'

অগাস্ট বসল পিকআপের কেবিনে, তার আর বোরিসের মাঝখানে সিটে রয়েছে মূর্তিদুটো। মুসা আর কিশোর উঠল পেছনে। গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস।

'তাহলে রক্তচক্ষুকে পেলাম?' বলল মুসা। 'তুমি এখনও শিওর, অগাসটাসের ভেতরেই পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ইয়ার্ডে ফিরেই আগে ভাঙতে হবে মূর্তিটা, না কি বলো?'

'রবিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। নইলে মন খারাপ হবে ওর।'

ইয়ার্ডের অফিসে মেরিচাচীর সঙ্গে বসে কিশোরদের অপেক্ষা করছে রবিন। সময় যেন দাঁড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে তার। ইতিমধ্যে দু'জন খরিদ্দার এসেছে, ছোটখাট জিনিস কিনেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে আবার।

গেটে গাড়ির শব্দ হতেই ঝট করে ফিরল রবিন। নিরাশ হলো। না, পিকআপ নয়, কালো একটা সিড্যান ঢুকছে। আরে, সিড্যানের জোয়ার এল নাকি! আর কোন গাড়ি আসতে পারে না! অফিসের সামনে এসে থামল গাড়িটা। একজন লোক নামল। দেখেই চমকে উঠল রবিন। মাঝারি উচ্চতা, কালো চুল, হর্ন-রিমড চশমা, আর অবশ্যই কালো গোঁফ!

কালো গুঁফো! এখানে!

'গুড ইভনিং,' অফিসের দরজা থেকেই বলল লোকটা, মেরিচাচীর দিকে তাকিয়ে, ফ্যাসফেঁসে গলা। অফিসের বাইরে টেবিলে রাখা পাঁচটা মূর্তির দিকে

আঙুল তুলল। 'খুব ভাল জিনিস। বিখ্যাত সব লোক! আর আছে, না এই কটাই?'

'এই কটাই,' মেরিচাচী বললেন। একটা কথা আগেই বলে দিচ্ছি, বাগানে বসানোর জন্যে নেবেনে না। পানি লাগলেই নষ্ট হয়ে যায়, এই একটু আগে একজন অভিযোগ করেছে। ওগুলো ফেরত আনতে পাঠিয়েছি। মনে হয়, বাকিগুলোর ব্যাপারেও অভিযোগ আসবে শিগগিরই।'

মেরিচাচীর কণ্ঠ আর চেহারা দেখেই বুঝল রবিন, বেচারীর মন খারাপ। জিনিস বিক্রি করে আবার ফেরত নেয়া যে কোন ব্যবসায়ীর জন্যে কষ্টকর। তাছাড়া পুরানো জিনিস, খারাপ বলে ফেরত দিচ্ছে লোকে, এরপর বিক্রি হবে কিনা, তার ঠিক নেই। অনেকগুলো টাকা পানিতে যাবে, মেরিচাচীর খারাপ লাগারই কথা।

'তাই?' আগ্রহী মনে হলো কালোগুঁফোকে। 'দুটো আসছে, বাকিগুলোও আসতে পারে বলছেন? তাহলে তো খুব ভাল। এসব জিনিস সংগ্রহ করা আমার নেশা, এই পাঁচটা নিচ্ছি, বাকিগুলোও নেব, যদি আসে। আর কাউকে দেবেন না, প্লীজ!'

'দাম জানেন?' মেরিচাচী বললেন।

'কত?'

'পঞ্চাশ ডলার করে একেকটা।'

'রাজি।'

'যেগুলো ফেরত আসবে, ওগুলোর অবস্থা কেমন থাকবে জানি না। ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে আসতে পারে।'

'কুছ পরোয়া নেই। আমি নেব,' বলতে বলতেই পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করল। সাড়ে তিন'শ ডলার গুণে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল। সাতটার দাম। এখানে পাঁচটা, আর যে দুটো আসছে তার জন্যে।'

'অবাক হয়েছেন মেরিচাচী। বোকা নাকি লোকটা! টাকাগুলো নিতে দ্বিধা করছেন। শেষে বললেন, 'আগেই বলে দিচ্ছি, খারাপ জিনিস। পরে আমাকে দুষবেন না, ফেরত নিয়ে আসতে পারবেন না।'

'আনব না, নিন, টাকা নিন। যেগুলো ফেরত আসবে, সব নেব। আর কাউকে দেবেন না।'

টাকাগুলো নিয়ে ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বললেন চাচী, 'দেব না। বসুন, অন্য দুটো এসে পড়ল বলে। আমার ছেলে গেছে আনতে।' বাইরের লোকের কাছে কিশোরকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেন মেরিচাচী।

'গুড!' একটা চেয়ার টেনে বসল লোকটা। 'খুব ভাল মূর্তি, জানেন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সত্যি বলতে কি, ম্যাডাম, দাম আপনি খুব কমই নিয়েছেন। আরে, হ্যাঁ, বসে থাকি কেন?' আবার উঠে দাঁড়াল লোকটা। 'মূর্তিগুলো এই সুযোগে গাড়িতে তুলে ফেললেই তো পারি।' বেরিয়ে গেল সে।

উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে রবিনের চেহারা। বেচাকেনা শেষ, টাকাও নিয়ে ফেলেছেন মেরিচাচী। কথা দিয়ে ফেলেছেন, সবগুলো মূর্তি দেবেন লোকটাকে। এখন কি করা? কিশোর যে দুটো আনতে গেছে, ওগুলোর মধ্যে অগাসটাসও থাকতে

পারে। সেক্ষেত্রে? আইনত এখন ওটাও কালো গুঁফোর জিনিস। অস্থির হয়ে উঠল সে।

ব্যাপারটা মেরিচাচীর চোখ এড়ালো না। 'আরে, রবিন! এমন করছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?'

'আগেই আপনাকে বলা উচিত ছিল, চাচী,' অনেক চেষ্টায় যেন কথা বেরোল রবিনের মুখ দিয়ে। 'অগাস্টের খুব ইচ্ছে ছিল, একটা মূর্তি কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে। হাজার হোক, তার দাদার জিনিস...'

'আগেই বলা উচিত ছিল,' মেরিচাচীর মুখ কালো হয়ে গেল। 'এখন তো আর সম্ভব নয়। কথা দিয়ে ফেলেছি ভদ্রলোককে...। ওই যে, কিশোর এসেছে...'

শেষ মূর্তিটা সবে গাড়িতে তুলেছে কালো-গুঁফো, এই সময় অফিসের কাছে এসে থামল পিকআপ। ঘোঁউউউ করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

গাড়ির পেছন থেকে লাফিয়ে নামল কিশোর আর মুসা। তাড়াহুড়ো করে এসে দাঁড়াল কেবিনের দরজার কাছে। দরজা খুলে গেল। বোরিস নামল, এক এক করে বের করল মূর্তিদুটো। বেকনকে নিল মুসা, কিশোর অগাসটাসকে। চেপে ধরে রেখেছে বুকের সঙ্গে, নইলে পড়ে যাবে।

দুজনের কেউই প্রথমে দেখতে পেল না কালো-গুঁফোকে।

লোকটা এসে দাঁড়াল ছেলেদের সামনে। 'দাও, আর তোমাদের কষ্ট করার দরকার নেই। আমিই তুলতে পারব।' অগাসটাসের দিকে হাত বাড়াল। 'এগুলো কিনে নিয়েছি।' মূর্তিটাকে দু'হাতে চেপে ধরে টান মারল সে।

আট

মূর্তি ছাড়ল না কিশোর। লোকটাও টানছে। চেঁচিয়ে উঠল রাগে, 'এই ছেলে, ছাড়ছ না কেন? বললাম না, কিনে নিয়েছি?'

'দিয়ে দে, কিশোর,' ডেকে বললেন মেরিচাচী।

'চাচী!' মূর্তিটাকে আরও শক্ত করে ধরে প্রতিবাদ করল কিশোর। 'অগাস্টকে এটা দেব কথা দিয়েছি আমি!'

'দিয়ে দে, বাবা, আমি জানতাম না! ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফেলেছি!'

'কিন্তু ওনার চেয়েও অগাস্টের এটা বেশি দরকার!' ভারি মূর্তি, তার ওপর টানাটানি, আর ধরে রাখতে পারছে না কিশোর। 'ওর কাছে এটা বাঁচা-মরার সামিল!'

'কি বলছিস! একটা মাটির মূর্তি বাঁচা-মরার সামিল!' রাগ করলেন মেরিচাচী। 'তোদের মাথা খারাপ হয়েছে! দিয়ে দে ওটা। নইলে বদনাম হয়ে যাবে। লোকে বলবে, কথা দিয়ে কথা রাখে না পাশারা!'

'দাও!' গর্জে উঠল কালো-গুঁফো। হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারল।'

চাচীর কথায় এমনিতেই ঢিল দিয়ে ফেলেছিল কিশোর, আচমকা টানে খসে গেল হাত থেকে, সামলাতে পারল না লোকটা, মূর্তি নিয়ে উল্টে পড়ল। সে-ও ধরে

রাখতে পারল না ভারি জিনিসটা, পড়ে গেল হাত থেকে, ভেঙে খান খান হয়ে গেল।
ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল ছেলেরা।
মেরিচাচী দূরে রয়েছেন, তাই দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু চার কিশোর পরিষ্কার দেখছে। লাল উজ্জ্বল একটা পাথর, পায়রার ডিমের সমান বড়, অগাসটাসের ভাঙা মাথার ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে।
নিশ্চল হয়ে গেছে যেন ছেলেরা।
হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কালো-গুঁফো। দেখতে পেল পাথরটা, সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে তুলে নিয়েই পকেটে ভরল।
অফিসের দরজায় বেরিয়ে এসেছেন মেরিচাচী, সেদিকে ফিরল সে। বলল, 'আমার দোষেই পড়েছে। আর হ্যাঁ, আর কোন মূর্তির দরকার নেই আমার। চলি।'
গাড়িতে উঠে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দ্রুত চলে গেল।
ইয়ার্ডের গেট দিয়ে সিড্যানটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল ছেলেরা হতাশ দৃষ্টিতে।
'গেল!' প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'নিয়ে গেল রক্তচক্ষু! কিন্তু তখন না আলোচনা হলো, কালো-গুঁফো বলতে কেউ নেই? রয় হ্যামারের কল্পনা? তাহলে ও কে?'
'ভুল একটা কিছু হয়েছে,' সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে কিশোরের পিঠ, চোখে মুখে রাজ্যের হতাশা।
'আজ লাইব্রেরিতে গিয়েছিল কালো-গুঁফো,' রবিন বলল। 'আমি যাওয়ার আগে। রক্তচক্ষুর ব্যাপারে তথ্য খুঁজেছে সে।'
'এমন কাণ্ড ঘটবে ভাবিইনি!' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'জিনিসটা পেয়েও রাখতে পারলাম না, ছুঁতেই পারলাম না। সরি, গাস।'
'তোমার কি দোষ?' সান্ত্বনা দিল অগাস্ট। 'খামোখা মন খারাপ কোরো না।'
'আমি এতই শিওর ছিলাম যে কালো-গুঁফো নেই...,' বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।
মেরিচাচী বললেন, 'ঠিকই, তোর কোন দোষ নেই। তুই তো ছেড়েই দিয়েছিলি, ও ধরে রাখতে পারেনি। ওর দোষ। টুকরোগুলো ফেলে দিয়ে আয়। কিন্তু বাকি টাকাটা ফেরত নিল না...'
'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'
ফিরে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'আরিব্বাবা, অনেক বেজেছে! তোরা বসবি নাকি, না বন্ধ করে দেব?'
'বসব,' কিশোর বলল। 'তবে বেশিক্ষণ না।'
'গেট খোলাই থাক তাহলে। আরও একআধজন কাস্টোমার এসেও পড়তে পারে।'
মাথা কাত করে সায় জানাল কিশোর।
অফিস থেকে বেরিয়ে ছিমছাম ছোট্ট সুন্দর দোতলা বসতবাড়ির দিকে রওনা

দিলেন মেরিচাচী।

নীরবে ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়ে এল চার কিশোর, গোয়েন্দা প্রধানের নির্দেশে একটা টেবিলে রাখল। টুকরোগুলো পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। 'দেখো, দেখো,' মাথার ভাঙা টুকরোয় একটা ডিম-আকারের গর্ত, 'এর মধ্যেই ছিল রক্তচক্ষু।'

'ছিল, এখন আর নেই,' নিরাশ হয়ে পড়েছে রবিন। 'গুঁফোর হাত থেকে ওটা আর কোনদিন আনা যাবেও না।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে বটে,' পরাজয় মেনে নিতে পারছে না কিশোর পাশা। 'ভালমত ভাবলে উপায় বেরিয়েও যেতে পারে। চলো, ওয়ার্কশপে গিয়ে বসি। অযথা অফিস খোলা রেখে লাভ নেই। আজ আর কেউ আসবে না। ওখানে গিয়ে আলোচনা করব।

ওয়ার্কশপে এসে বসল ছেলেরা।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'রক্তচক্ষুর ব্যাপারে কি কি জেনেছ?'

নোট বের করে পাথরটার রক্তাক্ত ইতিহাস পড়ল রবিন। জানাল কাটিরঙ্গার প্রতিশোধ-পরায়ণ ভীষণ উপজাতির কথা।

'মারছে রে! 'খাইছে আর সেরেছের মত এই শব্দটাও কিশোরের কাছ থেকেই শিখেছে মুসা। 'শুনেই লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে! পাথরটা গেছে, ভালই হয়েছে। মরুকগে এখন কালো-গুঁফো।'

'কিন্তু, লোকে এটাও বলে ঃ পঞ্চাশ বছর কেউ না ছুঁলে শুদ্ধ হয়ে যাবে পাথরটা,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'যদি পঞ্চাশ বছর হয়ে গিয়ে থাকে? কিছুই হবে না গুঁফোর।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল মুসা। 'কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি নাও হতে পারে।'

'হুঁম্‌ম!' ধীরে ধীরে মাথা দোলাল অগাস্ট। জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'বুঝতে পারছি, কেন দাদা ওটাকে ভয় পেত। কেন লুকিয়ে রেখেছিল মূর্তির মধ্যে। পঞ্চাশ বছর যাতে ওটাকে কেউ না ছুঁতে পারে। সময় গেলে ওটা অভিশাপমুক্ত হয়ে যাওয়ার পর বের করে বিক্রি করে দিত। কিন্তু সময় পায়নি দাদা, তাই আমার জন্যে রেখে গেছে আমি শিওর, রক্তচক্ষু শাপমুক্ত হয়ে গেছে।'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু লাভ নেই। গুঁফোর হাত থেকে কি করে বের করে আনব ওটা, জানি না।'

'ভূত-থেকে-ভূতে!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কালো-গুঁফোর সন্ধানে লাগিয়ে দিই। ওর খোঁজ পাওয়া গেলেই···ইয়ে, গেলেই···,' গেলে কি করবে, সেটা আর বলতে পারল না সে।

'গেলেই,' বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর, 'ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা যেত পাথরটা। কিন্তু নথি, জানো, এই শহরে কালো গোঁফওয়ালা লোক কত আছে? শয়ে শয়ে। তাছাড়া ওটা যে লোকটার সত্যিকারের গোঁফ, তাই বা জানছি কি করে? নকলও হতে পারে।'

'হুঁ!' চুপসে গেল রবিন।

দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুলল অগাস্ট, 'আর কোন ভরসাই নেই!'

আবার নীরবতা। এমনকি কিশোর পাশাও কোন উপায় বের করতে পারছে না।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টা।

'বেল!' লাফিয়ে উঠল রবিন। 'কাস্টোমার!'

'যাই, আমি দেখি,' ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল কিশোর, অফিসের দিকে চলল। তাকে অনুসরণ করল অন্য তিনজন।

খোলা জায়গায় বেরিয়েই খরিদ্দারকে দেখতে পেল ওরা। কালো চকচকে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কালো ছড়ি।

'খাইছে!' ফিসফিস করল মুসা। 'তিন-ফোঁটা!'

'এই যে, ছেলেরা,' মিষ্টি করে হাসল লোকটা। 'ওগুলো দেখলাম পরীক্ষা করে,' ছড়ি তুলে ভাঙা টুকরোগুলো দেখাল সে। 'নিশ্চয়ই অগাস্টাস অভ পোল্যাণ্ডের। ওটা এলেই আমাকে টেলিফোন করার কথা বলেছিলাম, ভুলে গেছ?'

'করতাম, স্যার,' কিশোর বলল। 'কিন্তু তার আগেই ভেঙে গেল।'

'কিভাবে?' আবার হাসল তিন-ফোঁটা, ভয়ঙ্কর হাসি, নাদুস-নুদুস হরিণশিশু দেখেছে যেন ক্ষুধার্ত বাঘ। 'ভাঙা মাথায় একটা গর্তও দেখেছি, ডিমের আকার। ওখানে কিছু লুকানো ছিল মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, স্যার, ছিল,' আবার বোকার অভিনয় শুরু করেছে কিশোর, কণ্ঠস্বর ভোঁতা। 'এক কাস্টোমার টানাহেঁচড়া শুরু করেছিল, আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। ফেলে দিয়ে ভেঙেছে। তারপর কি জানি একটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। ভাল করে দেখতে পারিনি।'

চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবল তিন-ফোঁটা। 'লোকটা কালো গোঁফ ছিল? আর ভারি চশমা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার, হ্যাঁ!' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

নীরবে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করল অন্য তিন কিশোর।

'আর,' আবার বলল লোকটা, 'ও যা নিয়ে গেল সেটা কি এ-রকম?' পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে টেবিলে ছুঁড়ে দিল সে।

লাল একটা পাথর! —

রক্তচক্ষু! রক্তচক্ষু!

চমকটা সামলে নিতে কিশোরেরও সময় লাগল। ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, ও-রকমই।'

'আঁম্‌ম্‌!' ছড়িতে ভর রেখে দাঁড়াল তিন-ফোঁটা। 'রক্তচক্ষুর নাম শুনেছ? শুনেছ, ওটা নিলে কি সাংঘাতিক অভিশাপ নেমে আসে? এমন কি যে ছোঁয়, সে-ও রেহাই পায় না?'

জবাব দিলে কি হবে, বুঝতে পারছে না কেউ, তাই চুপ করে রইল। অবাক হয়ে ভাবছে পাথরটা তিন-ফোঁটার দখলে এল কিভাবে! বড় জোর ঘণ্টাখানেক আগে এটা নিয়ে পালিয়েছিল কালো-গুঁফো।

'একটা জিনিস দেখাচ্ছি,' ছড়ি তুলে বোতাম টিপে দিল তিন-ফোঁটা। সড়াৎ করে বেরিয়ে এল বারো ইঞ্চি লম্বা ছুরি। ফলাটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকাল। 'নোংরা!' পকেট থেকে রুমাল বের করে ছুরি মুছল সে। লাল আঠালো পদার্থ লেগে গেল তাতে।

'রক্ত লেগে থাকলে ইস্পাত নষ্ট হয়ে যায়,' তিন-ফোঁটার হাসি হাসি মুখ, ভাবভঙ্গি আর বলার ধরন ভয়ংকর। 'সে যাকগে...' ছুরির ফলায় ঠেকিয়ে পাথরটা টেবিলের মাঝখান থেকে টেনে আনল সে। তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল কিশোরের দিকে। 'দেখো! ভাল করে দেখো।'

হাতে নিয়ে পাথরটা চোখের সামনে ধরল কিশোর। অন্য তিনজন ঘিরে এল তাকে, ওরাও দেখতে চায়। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না ওদের।

'কই, কিছুই তো দেখছি না!' কিশোর বলল।

'দাও,' পাথরটা নিয়ে ছুরি দিয়ে পোঁচ মারল তিন-ফোঁটা। আবার ওটা কিশোরের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'এবার দেখো।'

হালকা একটা দাগ পড়েছে পাথরের গায়ে।

'আঁচড়!' কিশোর বলল। 'আঁচড় লেগেছে! কিন্তু চুনি তো ইস্পাতের চেয়ে শক্ত বলেই জানতাম! দাগ কাটল কিভাবে!'

'ঠিকই জানো,' খুশি হয়েছে তিন-ফোঁটা। 'তারমানে চেহারা দেখে যা মনে হচ্ছে, তা তুমি নও। ভীষণ চালাক ছেলে তুমি কিশোর পাশা, বোকার অভিনয় ছাড়ো। বিকেলে বুঝিনি। একটু আগে তোমার স্বাভাবিক চেহারা দেখলাম, তারপর হঠাৎ করেই অভিনয় শুরু করলে। যাকগে, এবার বলো তো, এই আঁচড় লাগার মানে কি?'

আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সহকারী গোয়েন্দার মুখে। ধরা পড়ে গিয়েছে, আর অভিনয় করে লাভ নেই। পাথরটার দিকে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত, নীরবে। হঠাৎ মুখ তুলল। 'এটা আসল পাথর নয়। নকল, ছাঁচে ফেলে বানানো হয়েছে প্লাসটিক দিয়ে।'

'চমৎকার!' প্রশংসা করল তিন-ফোঁটা। 'ঠিক বলেছ। আর হ্যাঁ, যা ভাবছ, তাই, কালো-গুঁফোর কাছ থেকেই নিয়েছি এটা। আসল রক্তচক্ষু এখনও লুকানোই রয়েছে। আমার ধারণা, অগাস্টাসের আরেকটা মূর্তি কোথাও আছে। তোমরা যেগুলো বিক্রি করেছ, তার মধ্যেও থাকতে পারে। আমি চাই, আমার হয়ে খুঁজে বের করো ওটা।'

এক এক করে চার কিশোরের মুখেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল তিন-ফোঁটা।

'আমি বলছি, অগাস্টাসের মূর্তি খুঁজে বের করবে!' গর্জে উঠল সে হঠাৎ, হাসি হাসি ভাব চলে গেছে। 'নইলে...,' বোতাম টিপে ছুরির ফলা আবার খোলসের ভেতর ঢুকিয়ে নিল সে। 'থাক, তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে, বলার আর দরকার নেই। বুঝতে পারছ। মূর্তিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে আমাকে।'

শান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠল সে। চলে গেল। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল ছেলেরা।

'ব্যাটা···ব্যাটা, নিশ্চয় কালো-গুঁফোকে খুন করেছে!' নীরবতা ভাঙল মুসা। 'হায় আল্লাহ্, এত তাড়াতাড়ি কি করে জানল সে, গুঁফো পাথর নিয়ে পালিয়েছে?'

'রহস্য জমাট বাঁধছে,' সূক্ষ্ম খুশির আমেজ কিশোরের কণ্ঠে। 'মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট নকল পাথর কেন রাখলেন অগাসটাসের ভেতরে? আসল ভেবে নকলটাকে লুকিয়ে রাখেননি তো? নাকি ইচ্ছে করে জেনে শুনেই আরেকটা পাথর লুকিয়েছেন, ফাঁকি দেয়ার জন্যে? আসলটা তাহলে কোথায়? অন্য কোন মূর্তির ভেতরে? তেরোটার মধ্যে আর কোন অগাস্টাস নেই, তাহলে···'

'আছে!' বিস্ফোরিত হলো যেন রবিনের কণ্ঠ, 'আছে!'

ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। অন্য দুজনও অবাক।

'ভুলেই গিয়েছিলাম,' বলল রবিন, 'এসেছি সেটা বলার জন্যেই, কিন্তু এমন সব কাণ্ড ঘটতে শুরু করল! বাবা বলল কথাটা। অকটেভিয়ান! রোমের সম্রাট ছিলেন, তাঁর আরেক নাম অগাসটাস। নিশ্চয় অকটেভিয়ানের মূর্তির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন গাসের দাদা। অগাস্ট নামকরণ হয়েছে অকটেভিয়ানের কারণেই। ওই মূর্তিটাই এখন খোঁজা দরকার।'

নয়

'রক্তচক্ষুর কথা ভুলে যাওয়াই ভাল!' বিড়বিড় করল মুসা। 'পনেরো জন মরেছে, সঙ্গে আরও চারটে ছেলে যোগ হতে বাধা কি?'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' অগাস্ট একমত হলো। 'রক্তচক্ষু পেলেও ও এখন নেব কিনা জানি না। ভয় করছে!'

'কালো-গুঁফোর পরিণতি দেখো,' সায় পেয়ে গলার জোর বাড়ল গোয়েন্দা সহকারীর। 'নকলটা নিয়ে গেল, তাতেই এক ঘণ্টার বেশি টিকল না! আল্লাই জানে, আমাদের কি হবে!'

রবিন নীরব, কিশোরের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে আছে।

'পাথরটা খুঁজে পাইনি এখনও,' অবশেষে মুখ খুলল কিশোর, 'বিপদ আসবে কোথা থেকে? আগে তো খুঁজে বের করি, তারপর দেখা যাবে।'

'খুঁজব কিনা, সেটাও ঠিক করা দরকার,' মুসা বলল। 'এসো, ভোট নিই। যে খোঁজার বিপক্ষে, হাত তোলো।'

দেখা গেল, মুসা একাই হাত তুলেছে। অগাস্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, আর রবিনের বিশ্বাস রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের ওপর, তাই হাত তুলছে না। তাছাড়া, ওরা ভোটে জিতলেই কি কিশোরকে ঠেকানো যাবে? এর আগে কখনও পেরেছে? কিশোরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তাকে বিরত করা মুসা আর রবিনের কর্ম নয়।

বোকা হয়ে গেল যেন মুসা, সে ভেবেছিল, অগাস্ট আর রবিন তার সঙ্গে যোগ দেবে। হেরে গিয়ে ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নিল আবার। বিড়বিড় করে কি বলল, বোঝা গেল না। কিশোরের দিকে ফিরল। 'তুমিও মরবে, আমাদেরও মারবে। কোন আক্কেলে যে যোগ দিয়েছিলাম তিন গোয়েন্দায়!···তো, এখন কি করা? পুলিশকে ফোন করব? কালোগুঁফো খুন হয়েছে যে জানাব?'

'প্রমাণ আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। 'প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করবে না পুলিশ। তবে, লাশটা পাওয়া গেলে যা জানি গিয়ে বলতে পারব।' একটু থেমে বলল, 'একটাই উপায় দেখা যাচ্ছে, অকটেভিয়ানের মূর্তি খুঁজে বের করতে হবে এখন। তার জন্যে ভূত-থেকে-ভূতের দরকার।' ঘড়ি দেখল। 'সাতটা বাজে, ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে এতক্ষণে। চালু করে দেয়া যায় ভূতদের।'

দেরি করল না আর কিশোর। এক এক করে তার পাঁচজন বন্ধুকে ফোন করল। পরদিন সকাল দশটার মধ্যে খবর জানাতে অনুরোধ করল। তারপর রবিন ফোন করল পাঁচজনকে, সব শেষে মুসা।

আপাতত আর কিছু করার নেই। রাতটা তার সঙ্গেই অগাস্টকে থাকার আমন্ত্রণ জানাল কিশোর।

অগাস্ট রাজি।

সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো মুসা আর রবিন।

'কি মনে হয়?' পাশাপাশি চলতে চলতে বলল মুসা। 'অকটেভিয়ানটা পাওয়া যাবে?'

'না পেলে গেল রক্তচক্ষু,' বলল রবিন। 'পানি লেগে হয়তো কোন এক সময় গলে যাবে মূর্তিটা, বেরিয়ে পড়বে পাথর। বাগানে পড়ে থাকবে। যার চোখে পড়বে, সে না-ও চিনতে পারে, দাম না-ও বুঝতে পারে। হয়তো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিংবা ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলবে। আর চিনে ফেললে তো মজাই মেরে দিল।'

একটা জায়গায় এসে আলাদা হয়ে গেল দু'জনে।

বাড়ি পৌঁছল রবিন। ঘরে ঢুকে দেখল, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে ডায়াল করে যাচ্ছেন তার বাবা। বিরক্ত হয়ে খটাস করে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। রবিনকে দেখেই বলে উঠলেন, 'কাণ্ড! সারা রকি বীচই যেন পাগল হয়ে উঠেছে! একটা লাইন খালি নেই, সব এনগেজড! আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছি, লাইন পাচ্ছি না! আশ্চর্য!'

কারণটা জানে রবিন, কিন্তু চুপ করে রইল। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে, সবাই এখন টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত।

কাপড় ছেড়ে সোজা গিয়ে বিছানায় উঠল রবিন। কিন্তু ঘুম আসছে না, খালি এটা ভাবে, ওটা ভাবে।

ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখল রবিন ঃ ঘোড়ায় চড়ে একদল খুনে ডাকাত তাড়া করেছে তাকে, সবার হাতে ছুরি লাগানো কালো ছড়ি।

চোখ মেলল এক সময়। পুব আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে সূর্য। বাতাসে বেকন ভাজার সুবাস, প্রথমেই মুসার কথা মনে এল রবিনের। মুচকে হাসল।

কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিচে নামল রবিন। রান্নাঘরে বেকন ভাজায় ব্যস্ত মা।

'মা? কিশোর ফোন করেছে?'

'দাঁড়া, ভেবে দেখি···,' রবিনের দিকে না তাকিয়েই হাসলেন মা, কড়াইটা চুলা থেকে নামিয়ে ফিরলেন। আঙুল থুতনিতে ঠেকিয়ে গভীর চিন্তার ভান করলেন।

'করেছিল।'

'কি বলেছে?'

'আকাশেতে উড়িতেছে একপাল হাতি, পূর্ণিমা চাঁদ যেন অমাবস্যার রাতি।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। এটা কোন মেসেজ হতে পারে না। 'যাহ্, ঠাট্টা করছ! সত্যি, বলো না, কি বলেছে?'

হাসলেন মা। 'তাহলে আরেকবার ভাবি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এটা আর সেটা, শুধু আমরাই জানি; কাউকে সামলাতে হবে টেলিফোনের কানি! কি মানেরে এর?'

'তোমার আগের কথাটার কি মানে ছিল?'

'ওটা তো এমনি বানিয়ে বলেছে, মজা করার জন্যে।'

'এটাও কিশোর বানিয়ে বলেছে।'

'তা বলেছে, কিন্তু এর কোন মানে নিশ্চয় আছে। তোদের কাজ-কারবার জানতে তো আর আমার বাকি নেই। হ্যাঁরে, রবিন, আবার কোন একটা আজব কেসে জড়িয়েছিস বুঝি?'

'হ্যাঁ, মা,' তাড়া দিল রবিন, 'দাও, জলদি নাশতা দাও।'

'এবার কি? ডানাওয়ালা হাতি খুঁজছিস?' প্লেটে ডিম আর বেকন বাড়তে শুরু করলেন মা। টোস্টার থেকে টোস্ট নিয়ে রাখলেন আরেকটা প্লেটে।

রান্নাঘরের ছোট টেবিলেই খেতে বসে গেল রবিন। 'রোমের সম্রাট অকটেভিয়ানকে খুঁজছি। ওর মালিক এক ইংরেজ কিশোর, অগাস্ট অগাস্ট, পেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

কফি ছলকে পড়ল মায়ের হাতের কেটলি থেকে। চমকে উঠেছেন। হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

হাসল রবিন। খানিক আগে মা তাকে বোকা বানিয়েছিলেন, এখন সে শোধ নিচ্ছে। 'হ্যাঁ, মা, ঠিকই বলেছি। পরে সব বুঝিয়ে বলব, এখন সময় নেই।'

নীরবে ঠোঁট বাঁকালেন মা, কফি ঢালায় মন দিলেন। আবার রবিনের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'ওকি, সবই যে রইল! এই ভাল হবে না, যা দিয়েছি সব খাবি। নইলে বেরোতেই দেব না।'

অগত্যা আবার বসে পড়তে হলো রবিনকে।

যত তাড়াতাড়ি পারল, সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডে এসে ঢুকল রবিন। অফিসে মেরিচাচী একা। বাইরে কাজে ব্যস্ত বোরিস আর রোভার।

রবিন অফিসে ঢুকতেই মুখ তুললেন চাচী। 'এই যে, এসে গেছ, বসো। মুসা আর গাসকে নিয়ে বেরিয়েছে কিশোর, এই আধ ঘণ্টামত হবে। তোমাকে ওয়ার্কশপে বসতে বলে গেছে।'

মেরিচাচীকে ধন্যবাদ জানিয়ে হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল রবিন। কিশোরের মেসেজের মানে: হেডকোয়ার্টারে টেলিফোনের পাশে অপেক্ষা করতে হবে রবিনকে। কেন অপেক্ষা করতে বলেছে, তা-ও জানে রবিন। দশটার পর যে কোন মুহূর্তে 'ভূতের' ফোন আসতে পারে। খবর জানাতে পারে।

রবিন চেয়ারে বসতে না বসতেই ফোন বেজে উঠল। ঘড়ি দেখল, দশটা

বেজে পাঁচ। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো, তিন গোয়েন্দা। রবিন বলছি।'

'হ্যালো,' কিশোরকণ্ঠে জবাব এল, 'আমি জিম। আমার বোন পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে একটা মূর্তি কিনেছে।'

ধক করে উঠল রবিনের বুক। 'নাম কি? অকটেভিয়ান?'

'নাম? দেখতে হচ্ছে। ধরে রাখো, আমি দেখে আসি।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রবিনের। একেকটা সেকেণ্ড একেক যুগ বলে মনে হচ্ছে। এত তাড়াতাড়িই কাজ হয়ে গেল! বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

সাড়া এল পুরো এক মিনিট পর। 'হ্যালো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো!' কানের ওপর জোরে রিসিভার চেপে ধরেছে রবিন, ব্যথা পাচ্ছে সে খেয়ালও নেই।

'বিসমার্ক,' জবাব এল। 'অকটেভিয়ান না। চলবে?'

'না, থ্যাংক ইউ,' হতাশা ঢাকতে পারল না রবিন। 'থ্যাংক ইউ। অকটেভিয়ানকে দরকার আমাদের।' তৃতীয়বার ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল সে।

আরও এক মিনিট চুপচাপ বসে রইল রবিন। শেষে টাইপরাইটার টেনে নিল। এ-যাবৎ যা যা ঘটেছে, বিস্তারিত লিখে ফেলবে।

লেখা শেষ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল, ইতিমধ্যে আর ফোন এল না। আশাই ছেড়ে দিল রবিন, এবার কায়দাটা বোধহয় বিফলেই গেল।

'রবিন! এই রবিন!' মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে। 'খেতে এসো।'

'আসছি,' মাইক্রোফোনে জবাব দিল রবিন।

কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠল সে। দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা সবে তুলেছে, এই সময় বেজে উঠল ফোন। থমকে গেল সে। হাত থেকে ঢাকনাটা ছেড়ে দিয়ে দুই লাফে গিয়ে পৌঁছল ফোনের কাছে। 'হ্যালো! তিন গোয়েন্দা! রবিন বলছি।'

'অকটেভিয়ানের খবর চেয়েছিলে?' একটা মেয়ে। 'আমার মা কিনে এনেছে। বাগান সাজাতে চেয়েছিল, কিন্তু বসানোর পর আর পছন্দ হয়নি। পাশের বাড়ির মহিলাকে দিয়ে দেবে ভাবছে।'

'কোন দরকার নেই, প্লীজ।' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'জিনিস পছন্দ না হলে রাখার কোন দরকার নেই। আমরা আসছি এখুনি, টাকা ফেরত দিয়ে মূর্তিটা নিয়ে আসব।'

নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে রিসিভার রেখে দিল রবিন। হলিউডের ঠিকানা, রকি বীচ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু অসুবিধে নেই। গাড়ি নিয়ে গেলে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। চট করে ঘড়ি দেখে নিল।

ইস্‌স্‌, কিশোরটা করছে কি। অকটেভিয়ানের খোঁজ পাওয়া গেছে, ও থাকলে খেয়ে নিয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়া যেত। দেরি করে ফেললে পেয়েও না আবার হারাতে হয় মূর্তিটা!

দশ

গাল ফুলিয়ে রেখেছে মুসা, মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ছে। সাইকেল নিয়ে খাড়াইয়ে উঠছে, ছোট একটা টিলা পেরিয়ে বেরিয়ে এল ডায়াল ক্যানিয়নে। তার পেছনে কিশোর আর অগাস্ট।

হলিউডের উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ের বেশ ওপর দিকে এই গিরিপথটা। সরু একটা পথ চলে গেছে, পাহাড়ের ওপরে সমতল একটা জায়গায় গিয়ে শেষ। এইখানেই হোরাশিও অগাস্টের বাড়ি, ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট এলাকা জুড়ে।

বাড়িটায় ঘুরে যাওয়ার বুদ্ধি কিশোরের। জানে না, কি খুঁজতে এসেছে। অগাস্টের দাদা কোন বাড়িতে থাকতেন, কেমন জায়গা, না দেখলে মানুষটা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া কঠিন, আসার এটাই প্রধান কারণ।

যত সহজ মনে হয়েছিল, সাইকেল নিয়ে এই পাহাড়ে চড়ার কাজটা তত সহজ হলো না। দুপুর হয়ে এসেছে, মাথার ওপর গনগনে সূর্য, দরদর করে ঘামছে ওরা, হাঁপাচ্ছে পরিশ্রমে। থেমে মুখের ঘাম মুখে নিল তিনজনেই, হোরাশিও অগাস্টের খালি বাড়িটার দিক তাকাল।

তিনতলা বাড়ি, কোন অংশ পাকা, কোন অংশ কাঠের, চমৎকার একটা স্টাইল। চারদিকে খোলামেলা, আলো আর হুহু বাতাসের অন্ত নেই! কিন্তু একেবারে নির্জন। সাইকেল ঠেলে নিয়ে এল ওরা সদর দরজার কাছে, ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখল।

'চাবি ছাড়া ঢুকবে কিভাবে?' দেখে শুনে বলল মুসা। 'তখনই বলেছিলাম, চাবিটা নিয়ে নিই রয় হ্যামারের কাছ থেকে।'

'চলো, জানালা ভেঙে ঢুকে পড়ি,' পরামর্শ দিল অগাস্ট।

'দরকার পড়লে তাই করতে হবে, কিশোর বলল। 'বাড়ির মালিক হয়তো কিছুই মনে করবে না, দু'চারদিনের মধ্যে পুরো বাড়িই তো ভেঙে ফেলবে।' পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করল সে। 'তবে আশা করছি জানালা ভাঙার দরকার পড়বে না, এগুলোর কোনটা না কোনটা লেগে যাবেই। আমেরিকার নাম করা সব কোম্পানির সব রকমের তালার চাবি আছে এখানে।'

'এক তালার চাবি আরেক তালায় লাগবে?' অগাস্টের সন্দেহ রয়েছে।

'না লাগারই কথা, তবে লেগেও যেতে পারে।'

তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে দরজার কাছে চলে এল ওরা, নব ধরে মোচড় দিল মুসা। তাকে অবাক করে দিয়ে পুরো ঘুরে গেল নব, ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা। 'খোলা! খিল-টিল কিচ্ছু লাগানো নেই!'

'অস্বাভাবিক!' আপন মনে বিড়বিড় করল কিশোর।

'খোলাই ফেলে গিয়েছে হয়তো রয় হ্যামার,' মুসা বলল, 'কিংবা, অন্য কেউ কোন কারণে খুলেছিল, আর লাগায়নি। খালি বাড়ি তো, মালপত্র নেই, লাগানোর দরকার মনে করেনি।'

অন্ধকার একটা হলঘরে এসে ঢুকল ওরা। ঘরটার দু'পাশে আরও দুটো বড় ঘর,

খালি, ধুলোয় ঢাকা, মেঝেতে কাগজের টুকরো ছড়ানো।

একটা ঘরে ঢুকল কিশোর, অনুমান করল, এটা শোবার ঘর। চারপাশে তাকাল, কিন্তু দেখার তেমন কিছু নেই। কোন আসবাব নেই। পাতলা ওয়ালনাট কাঠ দিয়ে দেয়াল পুরো ঢেকে দেয়া হয়েছে, গাঢ় চকলেট রঙের ওপর ধুলোর আস্তরণ।

না, কিছুই দেখার নেই এখানে, ঘুরল কিশোর। হলঘরে এসে ঢুকল আবার, উল্টোদিকের ঘরটায় চলে এল। লাইব্রেরি ছিল, দেয়ালে গাঁথা সারি সারি তাক দেখেই বোঝা যায়, তিন দিকের সব ক'টা তাক এখন নিঃস্ব, তাতে ধুলোর রাজত্ব। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে একে সবগুলো তাকের ওপর নজর বোলাল কিশোর, অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে, 'আ!'

'আ! কিসের আ!' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'কি দেখলে?'

'দেখার চোখ থাকলে তুমিও দেখতে পেতে।' নাক বরাবর সামনে আঙুল তুলল কিশোর। 'ওই তাকটা, দেখো।'

তাকাল মুসা। 'কই, ধুলো ছাড়া আর কিছুই দেখছি না!'

'শেষ মাথায়, অন্য গুলোর চেয়ে কোয়ার্টার ইঞ্চি বেশি লম্বা। নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে।'

এগিয়ে এসে তাকের শেষ মাথায় হাত রাখল কিশোর। টানাটানি করল। শেষে জোরে চাপ দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল একটা ছোট গোপন দরজা, পাল্লাসুদ্ধ তাক ভেতরে সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল একটা কালো ফোকর।

'হুঁ!' মাথা দোলাল কিশোর। 'বললাম না! কিছু একটা আছে।'

'ঠিকই তো!' কালো ফোকরটার দিকে চেয়ে আছে মুসা। 'পেলাম তাহলে কিছু!'

'টর্চ আনা উচিত ছিল। ভুলই করেছি। মুসা, চট করে গিয়ে সাইকেল থেকে একটা লাইট খুলে নিয়ে এসো।'

ছুটে বেরিয়ে গেল মুসা। লাইট নিয়ে ফিরে এল। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আগে ঢুকবে?'

'কেন, তুমি আগে যেতে ভয় পাচ্ছ নাকি?' কিশোর হাসল। 'ভয়ের কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

কিন্তু মুসা কথাটা মানতে পারল না। খালি বাড়ির অনেক গোপন ঘর দেখেছে সে এর আগে, কোনটাই পুরোপুরি নিরাপদ ছিল না।

আলো জ্বেলে সরু দরজা দিয়ে ঢুকে গেল কিশোর, তাকে অনুসরণ করল মুসা আর অগাস্ট।

তিন কদম এগিয়েই থেমে গেল।

না, মানুষের কংকাল নেই, ভয় পাওয়ার মত কিছুই চোখে পড়ছে না। একেবারে খালি। দেয়ালে তাক, এখানেও বই ছিল, লাইব্রেরিরই একটা অংশ।

'কিচ্ছু নেই।' কংকাল কিংবা মানুষের খুলি নেই দেখে হতাশই হলো যেন মুসা।

'কিছুই না?' প্রশ্ন করল কিশোর।

ভাল করে পুরো ঘরে আবার চোখ বোলাল মুসা। 'না, আমি কিছুই দেখছি না।'

'ভুল জায়গার দিকে ভুল ভাবে তাকিয়ে আছ। জিনিসটা এতই সাধারণ, তোমার মগজ ওটাকে গুরুত্বই দিতে চাইছে না, তাই দেখতে পাচ্ছ না।'

চোখ পিটপিট করল মুসা, আরেকবার দেখার চেষ্টা করল, যা কিশোর দেখতে পেয়েছে। 'না, বাবা, আমি দেখছি না! কি দেখেছ?'

'দরজা!' বলে উঠল অগাস্ট।

এইবার দেখতে পেল মুসা। বাদামী রঙের অতি সাধারণ একটা নব এমন ভাবে বসানো, পাল্লার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে নব ধরে মোচড় দিল কিশোর। সরু ছোট দরজা খুলে গেল সহজেই। ভেতরে আলো ফেলল সে। ধাপে ধাপে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে।

'ভাড়ার বোধহয়,' কিশোর বলল। 'চলো, দেখি কি আছে।'

'সবগুলো দরজা খোলা থাক,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'দরজা লাগিয়ে অচেনা ঘরে ঢুকতে ভয় লাগে আমার।'

সিঁড়িতে পা রাখল কিশোর, নামতে শুরু করল। পেছনে অন্য দুজন। দু'পাশে দেয়াল এত চাপা, ওরা একটু এদিক ওদিক হলেই কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে।

সিঁড়ি শেষ হলো। সামনে আরেকটা দরজা। নব ধরে ধরে টানতেই খুলে গেল। ছোট একটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা, ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস, পাথরের দেয়াল।

'ভাঁড়ার,' আলো তুলে দেখছে কিশোর।

বিচিত্র আকারের সব তাক, কেন ওরকম করে বানানো হয়েছে মাথায় ঢুকল না কিশোর কিংবা মুসার। খালি।

কিন্তু অগাস্ট চিনতে পারল। 'মদ রাখার ভাঁড়ার। বোতলের আকার আর মাপ মত বানানো হয়েছে। ওই যে, একটা ভাঙা বোতল পড়ে আছে।

হঠাৎ বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে দিল। গাঢ় অন্ধকার গিলে নিল ওদেরকে।

'কি হলো!' ফিসফিস করে উঠল আতংকিত কণ্ঠ।

'শ্-শ্-শ্! কে জানি আসছে! দেখো!'

আবছা আলো দরজার ওপাশে, বোধহয় সিঁড়ির মাথায় রয়েছে এখনও লোকটা। চাপা গলায় কথা শোনা গেল।

'চলো ভাগি!' দরজার নব ধরে টান মারল মুসা, কোন কিছু না ভেবেই। পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল, অনেক পুরানো নব, তার ওপর ভেজা বাতাসে ক্ষয় হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে ধাতু, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ছুটে চলে এল তার হাতে।

এগিয়ে আসছে আলো আর কণ্ঠস্বর।

ভাঁড়ারে আটকা পড়ল ছেলেরা।

এগারো

কাছে আসছে কণ্ঠস্বর।

দরজার বাইরে এসে থামল পদশব্দ। পাল্লার নিচ দিয়ে টর্চের আবছা আলো আসছে।

'এখানে তো আগেই খুঁজেছি,' ভারি গলায় বলল একজন। 'গিয়ে আর কি হবে?'

'পুরো বাড়িই খোঁজা হয়েছে,' আরেকটা কণ্ঠ, খসখসে, বিরক্তি মেশানো। 'আর এই ভাঁড়ারে তো আধা ঘণ্টা নষ্ট করেছি। হ্যারি, আমাদের ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে···'

'না না, ফাঁকি দিচ্ছি না, ফাঁকি দিচ্ছি না! কসম!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তৃতীয় আরেকজন, বুড়ো মানুষের গলা। 'এ-বাড়িতে থেকে থাকলে খুঁজে পেতামই। বলেছি না, এখানে লুকানোর মত আর কোন জায়গা নেই। বিশ বছর ধরে কাজ করেছি এ-বাড়িতে···,' থেমে গেল সে।

হ্যারি, হ্যারিসন! মুসা অনুভব করল হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে কিশোর। রয় হ্যামার তাহলে ঠিকই বলেছে, হোরাশিও অগাস্টের চাকর হ্যারিসনও হাত মিলিয়েছে ষড়যন্ত্রে!

'মিছে কথা বললে ভাল হবে না, হ্যারি,' বলল প্রথমজন। 'ছেলেখেলা নয় এটা। অনেক টাকার ব্যাপার, তুমিও একটা ভাগ পাবে।'

'যা জানি, সবই তো বলেছি!' হ্যারির কণ্ঠে অনুনয়। 'আমি আর অ্যানি যখন বাইরে যেতাম, নিশ্চয় তখন কোন ফাঁকে লুকিয়েছে জিনিসটা। শেষ দিকে কাউকে বিশ্বাস করত না, আমাদেরও না। থেকে থেকেই চমকে উঠত, এদিক ওদিক দেখত, বোধহয় সন্দেহ করত কেউ তার ওপর চোখ রাখছে।'

'ভীষণ চালাক ছিল ব্যাটা!' খসখসে কণ্ঠ। 'মাথায়ই ঢুকছে না, অগাসটাসের মূর্তির ভেতরে নকল পাথরটা কেন রেখেছিল!'

কান খাড়া করে শুনছে ছেলেরা, বিপদে যে রয়েছে ভুলেই গেছে। নকল পাথরটার কথা জানে লোগুলো, তার মানে ওরা কালো-গুঁফো অথবা তিন-ফোঁটার দলের লোক। পরের কথায়ই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'অথচ নকলটার জন্যেই জিকোর অবস্থা কাহিল! আহা বেচারা!' হাসল খসখসে গলা।

হাসি শুনে কেঁপে উঠল মুসা, ভয়ংকর হাসি। ছুরির ফলা থেকে তিন-ফোঁটার রক্ত মুছে ফেলার কথা মনে পড়ল।

'হাসিঠাট্টার সময় না এটা,' ভারি কণ্ঠ আরও ভারি শোনাল। 'যা বলছিলাম, অগাসটাসের ভেতরে নকল পাথর কেন? নিশ্চয় বিপথে সরানোর জন্যে। আমি বলছি, আসল চুনিটা এই বাড়িতেই আছে কোথাও।'

'তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই,' হ্যারিসনের গলা। 'পুরো বাড়িটা ভেঙে দেখতে পারেন এবার। কসম খেয়ে বলছি, আর কোন জায়গা জানি না আমি। দোহাই আপনাদের, আমাকে ছেড়ে দিন। স্যান ফ্রানসিসকোয় ফিরে যাব, এতক্ষণে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করেছে অ্যানি। আমার সাধ্যমত আমি করেছি, আর কিছু করার নেই।'

'ভেবে দেখাতে হবে,' বলল খসখসে গলা, 'আদৌ ছাড়ব কিনা…ইয়ার্ডের ওই ছেলেটাকে ধরা দরকার। আশেপাশের অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি, সবাই একবাক্যে বলেছে, খুব চালু ছোকরা। কম্পিউটারের মত কাজ করে নাকি ওর ব্রেন। বোকার ভান করে থাকে, ওটাও একটা চালাকি। পাথরটা কোথায় নিশ্চয়ই ও জানে।'

'কিন্তু ওকে ধরি কি করে?' ভারি কণ্ঠ। 'দেখি, একটা উপায় বের করতে হবে। চলো, ওপরে চলো, আলোচনা করিগে।'

'এই গোপন সিঁড়ি আর ভাঁড়ারটা কেন?' যেতে চাইছে না খসখসে গলা। 'এখানে আরেকবার খুঁজলে হত না? নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বানিয়েছে!'

'আরে দূর! ওই বুড়োর কাণ্ড!' বলল ভারি কণ্ঠ। 'সিঁড়িটাও সাধারণ, ভাঁড়ারটাও। মদ রাখত, নিরাপদে সংরক্ষণের জন্যেই বোধহয় বানিয়েছে ভাঁড়ার। তাই না, হ্যারি?'

'হ্যাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হ্যারিসন। 'মিস্টার অগাস্টের এটা এক খেয়াল। রাতেই শুধু এখানে আসতেন তিনি। প্রায় বলতেন, ছেলেবেলা থেকেই বিরাট বাড়িতে বাস করার শখ, যাতে থাকবে গোপন ভাঁড়ার, গোপন অন্ধকার সিঁড়ি।'

'আজব বুড়ো!' বলল ভারি গলা। 'চলো চলো, এই অন্ধকার, বদ্ধ বাতাস, দম আটকে আসে!'

আলো হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো। ভাঁড়ারে একা হয়ে গেল ছেলেরা।

'আউফ্‌ফ্‌!' চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল মুসা। 'আরেকটু হলেই গেছিলাম! যা সব লোক!'

'শয়তানের চেলা একেকটা! অগাস্ট বলল। 'হাসি কি! অথচ ওদের দলেরই একজনকে মেরে ফেলল তিন-ফোঁটা।'

'কি মনে হয়, কিশোর, ওরা কারা?' মুসা বলল। 'এই কিশোর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!'

স্বপ্ন থেকে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। 'অ্যাঁ!…ও, ভাবছিলাম। হ্যারিসনও ওদের দলে! তিন-ফোঁটার বিপক্ষে।'

'ওসব ভাবাভাবি পরে করলেও চলবে। বেরোনোর উপায় খোঁজো। আটকা পড়েছি, খেয়াল আছে?'

'এখানে অপেক্ষা করাই নিরাপদ। এখনও যায়নি ওরা। এসো, ভাঁড়ারটা ঘুরে দেখি।'

হয় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এখানে, কিংবা কিশোরের সঙ্গে যেতে হবে। দুটোতেই মুসার অনিচ্ছা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাটাই বেশি খারাপ মনে হলো, অগত্যা চলল কিশোরের পিছু পিছু।

উল্টো দিকে আরেকটা দরজা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। বড় চারকোণা আরেকটা ভাঁড়ার, নিচু ছাত, জানালা নেই। দেয়ালের গা ঘেঁষে এক-জায়গায় বড় একটা তেলের ট্যাংক, পাশেই মস্ত একটা তেলের চুলা। ব্যস, আর কিছু নেই।

উল্টো দিকে আরেকটা দরজা, তার ওপাশে সিঁড়ি। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল কিশোর, সিঁড়ির মাথায় দরজা, নব ধরে মোচড় দিল সে। খুলল না। আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে দেখল, অনড় রইল পাল্লা। কি ভেবে আর খোলার চেষ্টা করল না, নেমে চলে এল।

'ওপাশ থেকে ছিটকিনি লাগানো,' সঙ্গীদের জানাল কিশোর।

ব্যাপারটার মানে জানা আছে ওদের। দরজা খুলতে না পারলে, এখানেই আটকা থাকতে হবে। বাইরের কেউ জানবে না ওরা কোথায় আছে।

চুপ করে ভাবছে কিশোর। হঠাৎ বলল, 'যেখান দিয়ে ঢুকেছি ওখান দিয়েই বেরোতে হবে।'

'কিভাবে?' প্রতিবাদ করল অগাস্ট। 'নবের অর্ধেকটা খুলেছে, তালা আটকে গেছে। ওপাশ থেকে ছাড়া খোলা যাবে না। চাবিও নেই আমাদের কাছে।'

'আমারই দোষ!' বিষণ্ণ শোনাল মুসার কণ্ঠ।

'এসো, চেষ্টা করে দেখি, খোলে কিনা,' কিশোর বলল।

আবার আগের ভাঁড়ারটায় এসে ঢুকল ওরা। দরজার ভাঙার নবের কাছে আলো তুলে ধরল মুসা। কোমরে ঝোলানো সুইস ছুরিটা খুলে নিল কিশোর, অনেকগুলো ফলা, বিভিন্ন কাজে লাগে, তার খুবই প্রিয়! একটা ফলা খুললো, ছোট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এটা।

'সাধারণ তালা,' ভালমত দেখে বলল কিশোর। 'খুলতেও পারে।' ছোট চারকোণা গর্তে স্ক্রু-ড্রাইভার ঢুকিয়ে মোচড় দিল সে। ঘুরল না। যন্ত্রটা আরেকটু ঠেলে দিয়ে আবার মোচড় দিল। ক্লিক করে ঘুরে গেল তালার জিভ, খুলে গেল।

এত সহজে তালা খুলে গেছে, বিশ্বাসই হচ্ছে না মুসা আর অগাস্টের।

পাল্লা খুলে উঁকি দিল কিশোর, সিঁড়ির অর্ধেকটা পর্যন্ত আবছা দেখা যাচ্ছে, তারপরে অন্ধকার। কেউ আছে বলে মনে হলো না।

সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল সে। অন্য দুজনকে ডাকল।

হঠাৎ জ্বলে উঠল আলো।

চোখ ধাঁধিয়ে দিল টর্চের আলো, চোখ পিটপিট করছে কিশোর, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

'বাহ্, এই তো আছে!' গমগম করে উঠল ভারি গলা। 'তাই তো বলি, সাইকেল রেখে গেল কোথায়! এসো, লক্ষ্মী ছেলের মত চুপচাপ উঠে এসো। নইলে...'

বারো

কিশোরের ব্যবহারে লক্ষ্মী ছেলের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এক ঝটকায় ঘুরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দরজার ওপর, হাত বাড়িয়ে নবটা ধরার চেষ্টা করল। পারল না। ধাক্কা লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা।

'সিঁড়ি বেয়ে দুপদাপ করে নেমে আসছে লোক দু'জন।

'ধরো, ধরো ওকে, জ্যাকি!' চেঁচিয়ে উঠল ভারি কণ্ঠ। 'ওর কথাই বলেছি।

শক্তিশালী একটা থাবা কিশোরের হাত চেপে ধরল. মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের ওপর। আরেক হাতে শার্টের কলার চেপে ধরে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওপরে।

ভাঁড়ারে থেকে শব্দ শুনেই বুঝল মুসা আর অগাস্ট. কিশোরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'ধরে ফেলল!' ঢোক গিলল মুসা. গলা শুকিয়ে কাঠ।

'নিয়ে যেতে বারোটা বাজছে ওদের.' অগাস্ট বলল। 'শুনছ. কী রকম শব্দ-হচ্ছে? জোরাজুরি করছে ভীষণ।'

ব্যথায় 'আহ্‌হ্‌!' করে চেঁচিয়ে উঠল একজন।

'হাতে কামড় দিয়েছে বোধহয়। হাসল অগাস্ট।

চটাস করে চড় পড়ার শব্দ হলো, থেমে গেল জোরাজুরির শব্দ।

'দুজন মিলে একজনকে ধরেছ, লজ্জা করে না! আবার মারছ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'বেশ, তাহলে চুপ হয়ে যাও.' খসখসে কণ্ঠ বলল।

'হ্যাঁ শান্তভাবে উঠে এসো, মারব না,' বলল ভারি কণ্ঠ। 'নইলে কপালে আরও দুঃখ আছে।'

'আরও দুটো তো রয়ে গেল,' খসখসে গলা।

'থাক,' ভারি কণ্ঠ। 'একেই আমাদের দরকার।'

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল, ছিটকিনি লাগাল, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল পদশব্দ।

'কিশোর চুপ হয়ে গেছে,' শব্দ করে শ্বাস ফেলল অগাস্ট।

'তো আর কি করবে? দুজনের সঙ্গে পারবে না, খামোকা মার খাবে আরও।'

'ও পড়ল ডাকাতের হাতে, আমরা আটকা পড়লাম এখানে। আগে ছিল একটা, এখন দুটো দরজাই বন্ধ। বেরোনোর আশা শেষ।'

'কিশোর যখন বাইরে রয়েছে, আশা পুরোপুরিই আছে। কোন একটা উপায় ও ঠিক করে ফেলবে, বের করে নিয়ে যাবে আমাদের,' গভীর আস্থা মুসার কণ্ঠে।

তবে, মুসা বন্ধুর অবস্থাটা জানে না। কিশোর নিজেই ছুটতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে, থাক তো অন্য দুজনকে মুক্ত করা। হাত পিঠের ওপর মুচড়ে ধরে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ভারি কণ্ঠ। রান্নাঘরে নিয়ে এল। একটা আসবাব আছে এখনও, একটা চেয়ার, এতই পুরানো, নড়বড়ে, ভাঙা; বাতিল মালের ক্রেতারাও নেয়নি, ফেলে গেছে।

ভারি কণ্ঠ বেঁটে, মোটা। খসখসে গলা বিশালদেহী। দুজনেরই কালো গোঁফ, ভারি হর্ন-রিমড চশমা। ইয়ার্ডে যে কালো-গুঁফো গিয়েছিল, তারও একই রকম গোঁফ আর চশমা ছিল, তবে এদের কেউ নয়।

হাত ছেড়ে দিয়ে কিশোরের কাঁধ চেপে ধরল ভারি কণ্ঠ, ঠেলে নিয়ে গিয়ে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

'বাড়ির পেছনে কাপড় শুকানোর দড়ি আছে, দেখেছি,' খসখসে গলাকে বলল

সে। যাও তো, চট করে নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে গেল লোকটা।

কিশোরের দেহ তল্লাশি করল ভারি কণ্ঠ দক্ষ হাতে, ছুরিটা বের করে নিল। 'দারুণ জিনিস তো! বেশ ধার। নাক আর কান অতি সহজেই কেটে নেয়া যাবে,' কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল সে।

চুপ করে ভাবছে গোয়েন্দাপ্রধান। ভারি কণ্ঠকে শিক্ষিতই মনে হচ্ছে, সাধারণ চোর-ডাকাতের মত লাগছে না। খসখসে গলা অবশ্য সাধারণ গুণ্ডাই, তবে, ভরসা এই যে, আদেশের মালিক ভারি কণ্ঠ।

ছোটখাট একজন মানুষ দেখা দিল দরজায়, ধূসর চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বোধহয় ও-ই হ্যারিসন। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'আরে, মারছেন নাকি? আমাকে কথা দিয়েছিলেন, খুনখারাপীতে যাবেন না, মনে আছে?'

'যাও এখান থেকে!' ধমকে উঠল ভারি কণ্ঠ। 'খুন করব কি করব না, ওর ওপর নির্ভর করছে। কথা মত চললে কিছুই করব না, নইলে...তুমি যাও এখান থেকে।'

দ্বিধাজড়িত পায়ে আস্তে করে পিছিয়ে গেল হ্যারিসন।

দড়ি নিয়ে এল খসখসে গলা। দুজনে মিলে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধল কিশোরকে। দুই হাত চেয়ারের হাতার সঙ্গে, পা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে, কোমর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল চেয়ারের পেছনের সঙ্গে। মাথা ছাড়া শরীরের আর কোন অঙ্গই নড়ানোর উপায় থাকল না কিশোরের।

তারপর, খোকা,' আলাপী ভঙ্গিতে বলল ভারি কণ্ঠ, 'চুনিটা কোথায়।'

'জানি না, আমরাও খুঁজছি।'

'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, রাইস, তুমি সরো আমি দেখছি,' জানালার চৌকাঠে রাখা আছে কিশোরের ছুরিটা, তুলে নিল খসখসে গলা। বেছে বেছে পাতলা একটা ফলা খুলল, খুরের মত ধার, ঝকঝক করছে। 'কোন গালে আগে পোঁচ লাগাব, খোকাবাবু?' নিজের রসিকতায় নিজেই খিকখিক করে বিচ্ছিরি হাসি হাসল।

'তুমি থামো!' ধমক দিল রাইস, 'আমি কথা বলছি ওর সঙ্গে। সত্যিই বোধহয় জানে না। তবে, অনুমান করতে পারবে।' কিশোরের দিকে তাকাল। 'অগাসটাসের মাথায় নকল পাথরটা ঢুকাল কেন, বলতে পারবে?'

'মনে হয় লোককে বিপথগামী করার জন্যে।'

'আসলটা তাহলে কোথায়?'

'হয়তো আরেকটা মূর্তির ভেতরে, যেটাকে লোকে ভাবনার বাইরে রাখবে।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, সত্যি কথাই বলবে। অকটেভিয়ান কোথায় আছে জানে না, লোকদুটোও নিশ্চয় জানে না, কাজেই সত্যি কথা বললেও ক্ষতি নেই। বরং লাভ। তাকে মুক্তি দিয়ে দেবে হয়তো। 'আমার ধারণা, অকটেভিয়ান।'

'অকটে...ঠিক, ঠিক বলেছ!' নিজের হাতেই চাপড় মারল লোকটা। 'রোমের সম্রাট ছিল অকটেভিয়ান, আরেক নাম অগাসটাস। অগাসটাস থেকে অগাস্ট। ঠিক।' সঙ্গীর দিকে ফিরল সে। 'কি বুঝলে জ্যাকি?'

'অ্যা, হ্যাঁ!' ঘাড় চুলকাচ্ছে জ্যাকি। 'ঠিকই তো মনে হচ্ছে। তাহলে, খোকা, এবার ফাঁস করো তো, কোথায় আছে অকটেভিয়ান?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কার কাছে জানি বিক্রি করে দিয়েছে চাচী। কে কি কিনল, নাম ধাম তো আর লিখে রাখা হয় না, জানাও সম্ভব না। তবে, লস অ্যাঞ্জেলেসের কেউই হবে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাইস, আনমনে গোঁফের মাথা ধরে টান মারল। খানিকটা সরে গেল গোঁফ। নকল! 'হুঁ! আরেকটা কথা বলতো, অকটেভিয়ানের ভেতরেই যদি থাকবে তুমি মূর্তিটা খুঁজছ না কেন? এ-বাড়িতে কি খুঁজতে এসেছো?

জবাব দেয়া কঠিন। কিশোরের ভাব ছিল, যে কোনটার জিনিস নিয়ে এত গোলমাল, ওই লোক কোনবাড়িতে বাস করত, দেখা দরকার। কি জিনিস, বা কি ধরনের সূত্র খুঁজতে এসেছে, সে নিজেও জানে না।

'অকটেভিয়ান কোথায় আছে জানি না,' বলল কিশোর। 'তাই ভাবলাম, এখানেই খোঁজখবর করে যাই। নতুন কিছু মিলেও যেতে পারে।'

'নতুন কি?'

'নতুন ঠিক না, ভাবলাম, মানে আমার ভুলও হতে পারে, হয়তো অকটেভিয়ানের ভেতরেও লুকানো নেই পাথরটা। এ-বাড়িতেই কোথাও লুকিয়েছেন মিস্টার হোরাশিও অগাস্ট।'

'না, এখানে নেই,' বিড়বিড় করল রাইস। 'তাহলে মেসেজে লেখা থাকত। নকলটা অগাস্টাসের ভেতরে ছিল, তারমানে আসলটা অকটেভিয়ানেই আছে। এখন তাহলে ওই মূর্তিটাই তাড়াতাড়ি খোঁজা দরকার, আর কেউ জেনে যাওয়ার আগেই।'

'কোথায় খুঁজব?' প্রশ্ন করল জ্যাকি। 'এক এক করে বাড়ি খুঁজতে শুরু করলে, সারা জীবন খুঁজেও লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ওটা বের করতে পারব না।'

'হ্যাঁ, একটা সমস্যা বটে,' মাথা দোলাল রাইস। কিশোরের চোখে চোখে তাকাল, 'সেটা কি আমাদের সমস্যা? মোটেও না। মুক্তি পেতে চাইলে উপায়টা তোমাকেই বাতলাতে হবে। ভাবো।'

চুপ করে রইল কিশোর। ভূত-থেকে-ভূতের কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু ওটা তাসের শেষ ট্রাম্প। এখনই হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

'অকটেভিয়ান কোথায় জানি না,' বলল কিশোর। 'তবে আমাকে ছেড়ে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি, খুঁজে বের করা যায় কিনা।'

'কিভাবে করবে, উপায়টা বলো,' কুৎসিত হাসি হাসল জ্যাকি। 'এখনও না জানলে, ভেবে বের করো, এখানে বসেই। সারাদিন বসে থাকতেও রাজি আছি আমরা। দরকার হলে সারা রাত। তোমার বন্ধুরা ভাঁড়ারে আটকে আছে, ভুলে গেছ?'

জবাব নেই কিশোরের। কি বলবে? ভাবনার তুফান চলেছে মগজে। ওরা এখানে বন্দি হয়েছে এটা কি অনুমান করতে পারসে রবিন? রাতে যদি বাড়ি না

ফেরে ওরা তিনজন. বোরিসকে নিয়ে কি আসবে? রবিনকে ফোনের পাশে থাকতে বলে এসেছে সে. তাই তাড়াহুড়ো করবে না রবিন। কিন্তু বেশি দেরি হয়ে গেলে? চাচা-চাচীও যখন চিন্তিত হয়ে পড়বেন?

ভূত-থেকে-ভূতের কথা বলল না কিশোর। অপেক্ষা করবে. সিদ্ধান্ত নিল। হয়তো রবিন…

এই সময় দরজায় দেখা দিল আবার হ্যারিসন। 'রেডিও.' জ্যাকি আর রাইসকে বলল সে। 'আপনাদের বন্ধুরাই বোধহয়. রেডিওতে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। জ্যাকি নামটা শুনলাম…'

পাঁই করে ঘুরল রাইস। 'রেডিও!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ভুলেই গিয়েছিলাম। জ্যাকি. যাও তো. নিশ্চয় জিকো। ওদিকে খবর-টবর আছে বোধহয়।'

ছুটে বেরিয়ে এল জ্যাকি।

কিশোর অবাক! মৃত লোক রেডিওতে কথা বলে কি করে? তিন-ফোঁটা না ছুরি মেরে মেরে ফেলেছে তাকে?

বড় আকারের একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে ফিরে এল জ্যাকি। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে সে, বোঝাই যাচ্ছে, বেজায় ভারি। ছোট যে জিনিস ব্যবহার করে তিন গোয়েন্দা, তার চেয়ে অনেক ভাল আর দামী এটা, অনেক বেশি শক্তিশালী। লাইসেন্স লাগে। আছে কিনা কে জানে? সেটা নিয়ে জ্যাকি আর রাইসের মত লোক বিশেষ মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না।

'জিকো-ই.' ঘোষণা করল জ্যাকি। রেডিওটা মেঝেতে রেখে একটা বোতাম টিপে ধরল। মুখ নামিয়ে বলল, 'জিকো. জ্যাকি বলছি। শুনতে পাচ্ছ?' ছেড়ে দিল বোতামটা।

গুঞ্জন উঠল রেডিওর স্পীকারে। কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ, কেমন যেন যান্ত্রিক, একবার আওয়াজ কমছে, একবার বাড়ছে. দূর থেকে আসছে বলেই। 'জ্যাকি, কোথায় তোমরা? দশ মিনিট ধরে চেষ্টা করছি।'

'আমরা ব্যস্ত। কি খবর?'

'এদিকে উত্তেজনা। সোনালিচুলো ছেলেটা এইমাত্র পিকআপ নিয়ে বেরোল, সঙ্গে ড্রাইভার। ইয়ার্ডেরই একজন। হলিউডের দিকে চলেছে, আমরা পিছু নিয়েছি।'

ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। তাদেরকে খুঁজতে আসছে রবিন। বোরিসকে নিয়ে আসছে? জ্যাকি আর রাইসকে সামলাতে বোরিস একাই যথেষ্ট…

কিন্তু তার পরের কথা শুনেই আশা দপ করে নিভে গেল তার।

'এদিকে আসছে?' জ্যাকি বলল।

'না শহরের দিকে যাচ্ছে। আমরা পিছু নিয়েছি, জানে না।'

'দেখো, কোথায় যায়,' নির্দেশ দিল জ্যাকি। রাইসের দিকে তাকাল। 'তুমি কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। অকটেভিয়ানের খোঁজ পেয়েছে ছেলেটা, আমি শিওর। জিকোকে বলো,

যদি কোন মূর্তি পিকআপে তোলা হয়, ওটা ছিনিয়ে নেয় যেন।'

নির্দেশ জানাল জ্যাকি রেডিওতে। তারপর সুইচ অফ করে হাসল রাইসের দিকে চেয়ে। 'রেডিওটা কিনে খুব ভাল করেছ। টাকা উসুল।' বকের মত গলা বাড়িয়ে কিশোরের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল সে। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে খুশিতে। 'এবার বসে বসে শুধু দেখার পালা, কি বলো, খোকা বাবু?'

তেরো

বিকেল হয়ে এসেছে, তবু কিশোর আর মুসার দেখা নেই। আর অপেক্ষা করতে পারছে না রবিন। হয়তো জরুরী কোন ব্যাপারে আটকে গেছে ওরা, ওদের জন্যে বসে থাকলে অকটেভিয়ানকে হারাতে হতে পারে। মনস্থির করে ফেলল রবিন, ওদেরকে ছাড়াই যাবে।

মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করল সে, পিকআপটার কোন দরকার আছে কিনা। নেই। বোরিসের হাতেও টুকটাক কাজ, পরে করলেও চলবে। একবার দ্বিধা করেই রাজি হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

চাচীর কাছ থেকে পঞ্চাশ ডলার ধার নিল রবিন, যদি আর কোন মূর্তি নিতে রাজি না হন মহিলা, যিনি অকটেভিয়ান কিনেছেন, তাঁকে দিতে হবে। তবুও ফ্র্যানসিস বেকনকে সঙ্গে নিল।

পিকআপের পেছনে পুরু করে ক্যানভাস বিছিয়ে তাতে মূর্তিটা ভালমত বসাল বোরিস, যাতে গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়ে গিয়ে নষ্ট না হয়ে যায়। চারদিক ঘিরে পুরানো খবরের কাগজের গাদা আর কার্ডবোর্ডের বাক্স গুঁজে দিল এমনভাবে, হাজার ঝাঁকুনিতেও পড়া তো দূরের কথা, নড়বেও না মূর্তি।

ইয়ার্ড থেকে কম করে হলেও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। আবাসিক এলাকার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সুন্দর পথ, মসৃণ গতিতে ছুটে চলল পিকআপ। পথ ভাল, ঘন লোকালয়ের ভেতর দিয়ে গেছে, ফলে গাড়ির ভিড়ও বেশি। ওদেরকে অনুসরণ করে আসছে একটা গাঢ় নীল সিড্যান, এটা লক্ষ্যই করল না রবিন কিংবা বোরিস। গাড়িটাতে দুজন লোক, দুজনেরই কালো গোঁফ, হর্ন-রিমড ভারি চশমা।

যে অঞ্চলের ঠিকানা দিয়েছে মেয়েটা, সেখানে পৌঁছে গেল পিকআপ। গলির নাম্বার দেখতে শুরু করল রবিন। গলি পাওয়া গেল। মোড় নিয়ে গাড়ি ঢোকাল বোরিস।

'এই যে, এই বাড়িই!' চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'রাখুন, রাখুন।'

'হো-কে,' রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে ব্রেক কষল বোরিস। গাড়ি থামাল। ওদের আধ ব্লক পেছনে থেমে গেল নীল সিড্যান। গাড়িতেই বসে রইল লোক দুজন, এদিকে দৃষ্টি।

এক পাশের দরজা খুলে নেমে পড়ল রবিন, অন্য পাশ দিয়ে বোরিস। ট্রাকের পেছন থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে এগোল রবিনের পিছু পিছু।

বেল বাজাল রবিন।

দরজার ওপাশেই যেন অপেক্ষা করছিল মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল, বয়েসে

রবিনের চেয়ে ছোট হবে।

'তিন গোয়েন্দা!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, জীবন্ত শার্লক হোমসকে দেখছে যেন সামনে।

তিন গোয়েন্দায় যোগ দিয়েছে বলে গর্ব হলো রবিনের। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল সামান্য।

'অকটেভিয়ানকে নিতে এসেছ?' কথার তুবড়ি ছুটল মেয়েটার মুখ দিয়ে। 'মা যেটা কিনে এনেছে? রহস্যময় কোন গোপন কারণ আছে নিশ্চয়? এসো। ইস্, মাকে রুখতে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল আমার! প্রায় দিয়েই দিয়েছিল পড়শীকে। শেষে বললাম, ভুল করে রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ দিয়ে প্রলেপ লাগানো হয়েছে মূর্তিটায়, মারাত্মক পদার্থ, সিকিউরিটির লোক নিতে আসছে, তবে গিয়ে থামল। নইলে দিয়ে ফেলেছিল।'

এত দ্রুত কথা বলে মেয়েটা, শুনে তাল রাখাই মুশকিল হয়ে গেল রবিনের পক্ষে। চোখ পিটপিট করছে বোরিস।

'আরে এসো, এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' বলেই ঘুরল মেয়েটা।

তাকে অনুসরণ করল রবিন আর বোরিস।

বাড়ির পেছনে সুন্দর একটা বাগানে ওদেরকে নিয়ে এল মেয়েটা। মাঝখানে একটা ফোয়ারার ধারে রয়েছে অকটেভিয়ান, দেখেই এক লাফ মারল রবিনের হৃৎপিণ্ড। অকটেভিয়ানের গায়ে ছায়া ফেলেছে উঁচু গোলাপঝাড়, সবুজ পাতার মাঝে মাঝে ফুটে রয়েছে লাল গোলাপ, ধুলোয় মলিন শাদা মূর্তিটাকে এই পরিচ্ছন্নতার মাঝে বড় বেমানান, বড় নোংরা দেখাচ্ছে।

খানিক দূরে মরা পাতা ছাঁটছেন একজন হালকা-পাতলা মহিলা, সাড়া শুনে ঘুরলেন।

'এই যে, মা, ওরা এসে পড়েছে,' আবার কথা শুরু করে দিল মেয়েটা। 'তিন গোয়েন্দার লোক। বলেছিলাম না? ও ওদেরই একজন,' রবিনকে দেখাল সে। 'অকটেভিয়ানকে নিতে এসেছে। আর কোন ভয় নেই তোমার। এখনও ছুঁয়ে ফেলোনি তো? বেশ বেশ, তাহলে আর ভয় নেই। আরিব্বাপরে, রেডিও অ্যাকটিভ! স্কুলের আপা বলেছে, সাংঘাতিক ক্ষতি করে শরীরের...'

'না ছুঁইনি, রুসা!' মেয়েকে থামিয়ে দিলেন মহিলা। রবিনের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। 'যত সব উদ্ভট কল্পনা মেয়েটার, ফ্যানটাসির জগতে বাস। ওর চোখে দুনিয়ার সবই রহস্য, রাস্তার অচেনা সমস্ত লোক চোর-ডাকাত কিংবা স্পাই। নিশ্চয় বলেছে, রেডিও অ্যাকটিভিটির কথা বলে আমাকে ঠেকিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা নোয়াল রবিন। 'মূর্তিটা নিতে এসেছি, ম্যাডাম। ওটার বদলে যদি আরেকটা চান...এই যে, ফ্র্যানসিস বেকন...'

'না, আর মূর্তির দরকার নেই। ভেবেছিলাম, বাগানে রাখলে ভাল লাগবে। কিন্তু লাগে না। নিজেই তো দেখছ।'

'হুঁ!' পকেট থেকে টাকা বের করে বাড়িয়ে ধরল রবিন, 'এই নিন, পঞ্চাশই আছে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল,' খুশি হলেন মহিলা। 'প্যাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের সুনাম শুনেছিলাম, দেখছি ঠিকই শুনেছি।'

'বোরিস,' রবিন বলল, 'দুটো মূর্তি একসঙ্গে নিতে পারবেন?'

'পারব,' একটা মূর্তি বগলে চেপে ধরে রেখেছে বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। কিশোর বলে, ওর গায়ে মোষের জোর, ঠিকই বলে। অকটেভিয়ানকে আরেক বগলের তলায় তুলে নিল বোরিস অতি সহজে, যেন তুলোর পুতুল। রবিনের দিকে ফিরল। 'যাব?'

'হ্যাঁ, চলুন,' ঘুরে দাঁড়াতে গেল রবিন।

দুই লাফে কাছে চলে এল রুসা। 'এখুনি চলে যাবে? এই প্রথম সত্যিকারের একজন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা হলো, কয়েক কোটি প্রশ্ন জমে আছে মনে, জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম...'

'কি...,' দ্বিধা করছে রবিন। রুসার কথা শুনতে মন্দ লাগছে না। তাছাড়া, গোয়েন্দাদের ওপর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা যখন মেয়েটার...বোরিসের দিকে তাকাল সে। 'আপনি যান আমি আসছি। হ্যাঁ, অকটেভিয়ানকে একটা বাক্সে ভরে রাখবেন।'

'ঠিক আছে, তুমি তাড়াতাড়ি এসো,' বলে হাঁটতে শুরু করল বোরিস।

কথার মেশিনগান ছোটাল রুসা, একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে, কোনটারই জবাবের অপেক্ষা করছে না। কিছুই বলতে হচ্ছে না রবিনকে, শুধু শুনছে।

বোরিস এসে উঠল পিকআপের পেছনে। চ্যাপ্টা হয়ে থাকা কার্ডবোর্ডের বড় একটা বাক্স ঠিকঠাক করে তার মধ্যে একটা মূর্তি ঢুকিয়ে ভাল মত বাঁধল। তার প্রতিটি কাজের ওপর চোখ রেখেছে নীল সিডানে বসা দুই কালো-গুঁফো। রেডিওতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে জিকো, জ্যাকি আর রাইসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে।

'মূর্তি বাক্সে ঢুকিয়ে বেঁধেছে ভালুকটা,' মাইক্রোফোনে মুখ প্রায় ঠেকিয়ে কথা বলছে জিকো। ছেলেটা এখনও বাড়ির ভেতরে...

ভাঙা চেয়ারে বসে সব শুনছে কিশোর।

কথা শেষ হলো জিকোর। নির্দেশ দিল রাইস, 'বাক্সটা নামাও! শোনো, এক কাজ করো। একটা নকল দুর্ঘটনা ঘটাও। পিকআপটা স্টার্ট নিলেই গিয়ে ওটার সামনে দাঁড়িয়ে যাও, চলতে শুরু করলেই পড়ে যাওয়ার ভান করবে, ধাক্কা খেয়ে যেন পড়ে গেছ। চেঁচাতে শুরু করবে। লোকজন জমে যাবে। ছেলেটা আর ড্রাইভার নেমে পড়বে কতখানি চোট লেগেছে দেখার জন্যে। এই সুযোগে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, দরকার নেই!' চেঁচিয়ে বাধা দিল জিকো। 'ভালুকটা আবার বাড়ির ভেতরে যাচ্ছে। ট্রাকে কেউ নেই। নামিয়ে আনতে পারব।'

নীরব হয়ে গেল রেডিও। পারছে না তাই, নইলে দড়ি ছিঁড়ে উড়ে চলে যেত এখন কিশোর। যা-ও বা অকটেভিয়ানের মূর্তিটা খুঁজে পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই হারাতে হচ্ছে আবার।

বাগানে এসে ঢুকল আবার বোরিস।

একনাগাড়ে বকে চলেছে মেয়েটা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে রবিন।

'আচ্ছা, মেয়ে গোয়েন্দার দরকার নেই তোমাদের?' আগ্রহে সামনে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে রুসা। 'আমার তো মনে হয়, দলে একটা মেয়ে থাকা উচিত। অনেক সময় অনেক রকম সাহায্য হবে, যা ব্যাটাছেলেকে দিয়ে হয় না। আমাকে নিতে পারো। খুব ভাল অভিনয় করতে পারি, বিশ্বাস না হলে মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, যে কোন মানুষের গলা নকল করতে পারি, আর...'

'এই রবিন,' ডাকল বোরিস। 'আর কতক্ষণ? মিসেস পাশা জলদি করতে বলে দিয়েছে। চলো।'

'হ্যাঁ, এই যে, আসছি,' রবিন বলল। 'সরি, রুসা, আমাকে যেতে হচ্ছে। হয়তো মেয়ে একজন দরকার হতে পারে আমাদের। যদি হয়, তোমাকেই আগে খবর দেব।'

'এক সেকেণ্ড, প্লীজ! আমি আসছি,' রবিনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে গেল রুসা। ফিরে এল যেন চোখের পলকে। হাতে একটা চার কোণা শাদা কার্ড, আর পেনসিল। 'এই যে, নাও, ফোন নম্বর আর আমার নাম লিখে দিয়েছি। প্লীজ, রবিন, ভুলো না! আমাকে খবর দিও। সত্যিকার গোয়েন্দাদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে ধন্য হয়ে যাব। প্লীজ!'

কার্ডটা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল রবিন, তার পাশে বকবক করতে করতে চলল মেয়েটা।

ট্রাকে এসে উঠল রবিন আর বোরিস। ঘুরে গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন নীল সিড্যান, দেখল দুজনেই, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হলো না, বাক্সে বাঁধা মূর্তি চলে যাচ্ছে।

হাত নেড়ে গুড-বাই জানাল রুসা। কিশোর আর মুসাকে নিয়ে আরেকদিন এসে চা খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল চেঁচিয়ে।

গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস।

মোড় নিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার আগে জানালা দিয়ে মুখ বের করে পেছনে তাকাল রবিন, এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে রুসা, রবিনকে দেখে আরেকবার হাত নাড়াল।

চুপ হয়ে গিয়েছিল, আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। কানে এল জিকোর গলা।

'পেয়েছি!' জিকো বলছে। 'ওরা কল্পনাও কতে পারেনি, মূর্তিটা আমরা নিয়ে এসেছি।'

'গুড!' বলল রাইস। 'গোপন আড্ডায় নিয়ে যাও। খবরদার, আমরা আসার আগে খুলো না। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'ওভার অ্যাণ্ড আউট!' বলে নীরব হয়ে গেল রেডিও।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল রাইস, বিচ্ছিরি হাসি, ঠোঁটের এক কোণ ঝুলে পড়ছে। 'খোকা, বেঁচে গেলে। আমাদের জিনিস আমরা পেয়েছি। এখুনি অবশ্য তোমাদেরকে ছাড়তে পারছি না, তোমার বাড়িতে ফোন করে খবর দেব কোথায় আছ। তবে দেরি হবে, রাতের আগে বোধহয় পারব না। ততক্ষণ বসে থাকো এখানে।'

হ্যারিসনকে ডাকল রাইস।

তারপর তিনজনে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে একবার ফিরে তাকাল হ্যারিসন, কিশোরের জন্যে কিছু করতে পারেনি বলে দুঃখিত মনে হচ্ছে ওকে। বুড়ো মানুষ, দুই ডাকাতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না বোঝাই যাচ্ছে।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মিনিটখানেক অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'মুসাআ! গাআস! শুনছও!'

'কিশোওর!' মুসার চাপা কণ্ঠ ভেসে এল, দুটো বন্ধ দরজার জন্যে আওয়াজ অস্পষ্ট। 'কি হচ্ছে? আমাদের বের করতে পারবে? লাইটের ব্যাটারি শেষ!'

'সরি, সেকেণ্ড!' জবাব দিল কিশোর। 'আমি নিজেই আটকে আছি। দড়ি পেঁচিয়ে মমি বানিয়ে রেখেছে আমাকে। অকটেভিয়ানকেও পেয়ে গেছে ওরা!'

চোদ্দ

ভাবছে কিশোর, কি করে মুক্তি পাওয়া যায়! জানালার চৌকাঠে ফেলে গেছে ওরা তার ছুরিটা। ওখানে যাওয়া সম্ভব না, আর কোন অলৌকিক উপায়ে যেতে পারলেও দড়ি কাটা তো দূরের কথা, ওটা হাতে নিতে পারবে না।

কিন্তু মুক্তি তো পেতেই হবে! ওরা বলে গেছে বটে। কিন্তু কখন ফোন করবে না করবে, ঠিক আছে?

নিচে জোর ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। বন্ধ দরজায় গায়ের জোরে ধাক্কা মারছে মুসা আর অগাস্ট, তারই আওয়াজ। ভেঙে ফেলতে চাইছে পাল্লা।

ধাক্কা দেয়া থামল। চিৎকার শোনা গেল মুসার, 'কিশোর, এই কিশোর! শুনছ?'

'শুনছি!' জবাব দিল কিশোর। 'কি খবর!'

'নড়ছেও না। কাঁধ ব্যথা করে ফেলছি আমরা! ভীষণ অন্ধকার!'

'ধৈর্য ধরো। উপায় ভাবছি আমি।'

'জলদি করো, কিশোর! হুটোপুটি শুনছি, ইঁদুর আছে মনে হয়!'

চিমটি কাটতে পারছে না, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেই গভীর ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর। একটা কোন উপায়! একটা! চেয়ারে নড়েচড়ে উঠল সে, তার চেয়ে বেশি নড়ল চেয়ারটা, বিচিত্র শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল যেন।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে কিশোর, বাইরে সময় যেন ছুট লাগিয়েছে। একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে। পশ্চিমের উঁচু চূড়ার ছায়া এসে পড়েছে লনে, সূর্য যতই দিগন্তে নামছে, ততই বাড়ছে ছায়াটা।

টেনেটুনে আরেকবার হাতের বাঁধন পরীক্ষা করল কিশোর। কচমচ, মড়মড় করে উঠল আবার চেয়ার। বিদ্যুৎ ঝিলিক হানল যেন তার মগজে। মনে পড়ল, কিছুদিন আগে পুরানো নড়বড়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল সে, মড়াৎ করে ভেঙে প্রায় বসে গিয়েছিল চেয়ারটা।

শরীরটা সামনে-পেছনে করতে শুরু করল কিশোর, চেয়ারও নড়ছে তার সঙ্গে। জোড়াগুলো খুলবে খুলবে করছে, কিন্তু খুলছে না। ঝটকা মেরে, এক পাশে কাত হয়ে গেল কিশোর, চেয়ার নিয়ে পড়ল ধ্রাম করে। চেয়ারের একটা পায়া ছুটে গেল।

কয়েকবার জোরে জোরে পা ছুঁড়তেই খুলে উড়ে চলে গেল পায়াটা, কিশোরের পায়ে দড়ির প্যাচগুলো ঢলঢলে হয়ে গেল। যাক, ডান পা-টা মুক্তি পেল!

অন্য পা মুক্ত করার চেষ্টায় লাগল কিশোর। টানাহেঁচড়া করে লাভ হলো না। শেষে ডান পায়ে ভর দিয়ে উঠে তিন পায়ার ওপর বসাল চেয়ারটাকে, ধাক্কা দিয়ে কাত হয়ে চেয়ার নিয়ে পড়ল আরেক পাশে। মড়াৎ করে বাঁ হাতটা ভাঙল চেয়ারের। নিজেও ব্যথা পেয়েছে কিশোর, গুঙিয়ে উঠল। কিন্তু চুপ করল না। হ্যাঁচকা টান মারল বাঁ হাতে, জোড়া থেকে খুলে এল চেয়ারের বাঁ হাতা। হাতটা বার বার ঝাঁকি দিয়ে হাতা খুলে ফেলার চেষ্টা করল।

'কিশোর!' মুসার উদ্বিগ্ন ডাক শোনা গেল। 'কি হয়েছে? মারপিট করছ?'

'হ্যাঁ, চেয়ারের সঙ্গে,' জবাব দিল কিশোর। 'আমি জিতছি। আর মিনিট দুই অপেক্ষা করো।'

উঠে আবার চেয়ার নিয়ে কাত হয়ে পড়ল কিশোর, মড়মড় করে উঠল চেয়ার, বেঁকাতেড়া হয়ে গেল, কিন্তু আর কোন জোড়া খুলল না। অনেক কায়দা-কসরৎ করেও বাঁ হাত থেকে চেয়ারের হাতা খসাতে পারল না সে। চেষ্টা করে দেখল, হামাগুড়ি দেয়া যায়, শেষে হামাগুড়ি দিয়েই এগোল জানালার দিকে ছুরিটার জন্যে।

দুই হাতেরই কব্জি অবধি বাঁধা, আঙুলগুলো নড়ানো যায়। জানালার চৌকাঠ থেকে বাঁ হাতে ছুরিটা তুলে নিতে পারল কিশোর। ব্যস, হয়ে গেছে কাজ! বাঁধন কেটে মুক্ত হতে আর মাত্র এক মিনিট লাগল।

প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে, মেঝেতেই চিত হয়ে শুয়ে জিরিয়ে নিল কিশোর। ডেকে বলল, 'মুসা, আমি আসছি।'

'আল্লাহ্!' অনেকক্ষণ অন্ধকারে থেকে আলোয় এসে চোখ মেলতে পারছে না মুসা। 'দড়ি খুললে কি করে?'

'মগজের ধূসর কোষগুলোকে ব্যবহার করে,' মাথায় টোকা দিল কিশোর। 'চলো, জলদি কাটি এখান থেকে। কোন কারণে কালোগুঁফোদের কেউ আবার এসে পড়লেই গেছি। রবিনের খবর শোনো, অকটেভিয়ানকে খুঁজে পেয়েছে...'

'তাই নাকি?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'ভাল খবর!' যোগ করল অগাস্ট।

'কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়েছে আবার,' আগের বাক্যটা শেষ করল কিশোর। 'কালো-গুঁফোরা নিয়ে গেছে। চলো, যেতে যেতে বলব।'

সাইকেলগুলো তেমনি পড়ে আছে। তুলে নিয়ে চড়ে বসল তিনজনে, দ্রুত ফিরে চলল রকি বীচে। যাওয়ার পথে সব খুলে বলল কিশোর।

'ইশ্‌শ্‌, বার বার এসেও আবার চলে যাচ্ছে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে!' বিলাপ করে উঠল যেন মুসা। 'মূর্তিটায় জিনের আসর হয়েছে।'

'বোধহয় অভিশাপই কাটেনি এখনও,' মন্তব্য করল অগাস্ট।

'না কাটলে আমাদের কি? কালোগুঁফোরা মরবে,' কিশোর বলল। 'আমি অবাক হচ্ছি জিকোর কথা ভেবে। তিন-ফোঁটা বলল ওকে মেরে ফেলেছে, তাহলে আবার এল কোত্থেকে?'

...ছে, বার বার চোখের সামনে ভাসছে তার।

গজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে ছিল কিশো...

'হুঁ, রহস্যই!' মুসা বলবে। তার ধারণা ... এবং ভুল ... তো পরে, আবার অকটেভিয়ানকে পাচ্ছি কি ... প্রধান। ... মার সম্পাতি ... গেল।'

তিনজনেই চিন্তিত। কথা জমল না। চুপচাপ সাইকেল চালিয়ে রকি বীচে এসে পৌঁছল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ইয়ার্ডের গেটে ঢুকে মনে পড়ল ওদের, সারাদিন কিছু খায়নি, মনে পড়তেই মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর।

রবিন, বোরিস আর রোভার, তিনজনেই কাজে ব্যস্ত। চাচা-চাচীকে দেখা যাচ্ছে না। ইয়ার্ডের শেষ মাথায় বড় বড় গাছের গুঁড়ি একটার ওপর আরেকটা তুলে রাখছে দুই ব্যাভারিয়ান। পিকআপটা দাঁড়িয়ে আছে অফিসের কাছে। কয়েকটা লোহার চেয়ারে রঙ করছে রবিন।

'মন খারাপ নথির,' বলল মুসা। 'দেখেছ, ব্যাজার হয়ে আছে?'

'আমাদেরও তো তাই,' কিশোর বলল।

সাইকেলের শব্দ শুনে মুখ তুলল রবিন। জোর করে হাসার চেষ্টা করল। 'এই যে, এসেছ। ভেবেই মরছিলাম, কোথায় গেছ!'

'গাসের দাদার বাড়িতে,' সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলতে তুলতে বলল কিশোর। 'তোমার কি খবর?'

'ইয়ে...' বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন, এতবড় একটা দুঃসংবাদ শোনাতে বাধছে।

'ঠিক আছে, বলতে হবে না,' কণ্ঠে রহস্য ঢালল কিশোর। 'এদিকে এসো।...আমার চোখে চোখে তাকাও। হ্যাঁ, না না, পাতা বন্ধ কোরো না। তোমার চোখ দেখেই বলে দিতে পারব মনে কি আছে।'

মিটিমিটি হাসছে মুসা আর অগাস্ট।

রবিনের চোখে কিশোরের দৃষ্টি স্থির, আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে নিজের কপালে। 'হ্যাঁ, আসছে...পড়তে পারছি...ফোন এসেছিল, এক ভূত ফোন করেছিল। অকটেভিয়ানের খোঁজ মিলেছে। পিকআপ আর বোরিসকে নিয়ে ছুটলে। তারপর ...তারপর, মূর্তিটা পেলে, গাড়িতে তুললে! হলিউডের এক বাড়িতে পেয়েছ, ঠিক হচ্ছে না?'

হাঁ হয়ে গেছে রবিন। 'তাই হয়েছে! কিন্তু...'

'চুপ!' আঙুল তুলল কিশোর। 'বাকিটাও পড়ছি...'

রবিন আরও অবাক, দেখে, অগাস্টও হাসছে। কিশোরও। কিছুই বুঝতে না পেরে সে-ও হাসল। গোমড়া ভাবটা কেটে গেল, হালকা হয়ে গেল আবার পরিস্থিতি।

'রবিন?' বোরিসের ডাক শুনে ঘুরল চার কিশোর, পিকআপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাভারিয়ান। 'মূর্তিটা কি করব? পিকআপ গ্যারেজে তুলতে হবে।'

'ওই বেঞ্চে রেখে দিন,' রবিন বলল। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'ফ্র্যানসিস বেকন। নিয়ে গিয়েছিলাম যদি মহিলা বদলে নেন! নিলেন না, টাকাই ফেরত নিলেন। পঞ্চাশ ডলার ধার নিয়েছিলাম মেরিচাচীর কাছ থেকে, অকটেভিয়ানকে ফেরত আনতে পারলে টাকাটা আর দিতে হত না।'

'ও নিয়ে করব।'

মূর্তিটা ন

কোন কিছু না জোরে পা ছুঁড়তেই খুলে উড়ে চলে য় দেখেই চেঁচিয়ে উঠল,
'আরে! ঠিক দেখছিলো চল এই কিশোর, গেল। যাক, ডান পা কিশোর

ছুটে এল তিন কিশোর।

আঙুল তুলে মূর্তির পেছনের লেখা দেখাল মুসাঃ অকটেভিয়ান!

'অকটেভিয়ান!' চেঁচিয়ে উঠল অগাস্ট। 'কালোগুফোর দল নিতে পারেনি!'

'বুঝেছি!' ঘোরের মধ্যেই যেন মাথা দোলাল রবিন। 'দুটো মূর্তি বগলে চেপে নিয়ে গিয়েছিল বোরিস, অকটেভিয়ানকে বাক্সে না ভরে, ভুলে বেকনকে ভরেছে। যাক, বাঁচলাম!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

চট করে সবাই একবার দেখে নিল গেটের দিকে, তাদের ভয়, তিন ফোঁটা না এসে হাজির হয় আবার। অমূলক ভয়, একেবারে নির্জন গেট আর রাস্তা।

কমবেশি সবাই চমকে গিয়েছে, আগে সামলে নিল কিশোর। 'চলো, চলো, দেরি করা উচিত না। ওয়ার্কশপে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলি মূর্তিটা।'

জোশ এসে গেছে মুসার শরীরে, একাই মূর্তিটা বয়ে নিয়ে এল ওয়ার্কশপে।

একটা বাটালি আর হাতুড়ি বের করে আনল কিশোর। 'দেখো,' অকটেভিয়ানের ঘাড়ের নিচে হাত বোলাচ্ছে সে। 'এখানে গর্ত করা হয়েছিল, তারপর আবার কাদা লেপে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আঙুলে লাগছে। যাক, অবশেষে রক্তচক্ষু মিলল!'

'দূর, কথা থামাও!' অধৈর্য হয়ে বাতাসে থাবা মারল মুসা। 'ভাঙো, ভাঙো! নইলে আমার কাছে দাও!'

হেসে মূর্তির গায়ে বাটালি লাগাল কিশোর, হাতুড়ি দিয়ে জোরে বাড়ি মারল বাটালির পেছনে। আরেকবার বাড়ি মারতেই চলটা উঠে গেল, পুরের বাড়িতে অকটেভিয়ান দু'টুকরো। ছোট গোল একটা কাঠের বাক্স গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিল মুসা। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'খোলো! তুমিই খোলো! দেখি, পঞ্চাশ বছর ধরে কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে!' উত্তেজনায় কাঁপছে তার গলা। 'আরে, দেরি করছ কেন? অভিশাপের ভয় করছ নাকি?'

'না,' কেমন বদলে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠ! হালকা! এত হালকা হওয়ার তো কথা না!' বাক্সটা হাতের তালুতে রেখে ওজন আন্দাজ করছে সে।

মোচড় দিয়ে বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল কিশোর। সবাই ঝুঁকে এল ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে। না, জুলজ্বলে লাল কোন পাথর তো নেই! শুধু রয়েছে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ। ধীরে, অতি ধীরে দু'আঙুলে চেপে কাগজটা বের করে আনল গোয়েন্দাপ্রধান। খুলে পড়লঃ 'গভীরে খোঁড়ো! সময় খুব মূল্যবান!'

পনেরো

সে-রাতে সহজে ঘুম এল না রবিনের চোখে। ভয়ানক উত্তেজনা গেছে সারা দিন। অবশেষে কি মিলল! এক টুকরো কাগজ! নাহ্, অতিরিক্ত হয়ে গেছে! বাক্সটা খোলার

পর কি কি ঘটেছে, বার বার চোখের সামনে ভাসছে তার।

হতাশ দৃষ্টিতে কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে ছিল কিশোর। ও নিশ্চিত ছিল, বাক্সে পাথরটাই মিলবে। তার ধারণা ভুল। এবং ভুল হলে নিজের ওপর সাংঘাতিক রেগে যায় গোয়েন্দাপ্রধান।

'আরেকটা মেসেজ!' সব চেয়ে কম হতাশ হয়েছে মুসা।

'গভীরে খোঁড়ো!' আপনমনেই বলল কিশোর। 'মানে কি? রহস্যের গভীরে খোঁড়ো। লোককে বিপথে চালিত করার জন্যেই মূর্তির বুদ্ধি করেছেন হোরাশিও অগাস্ট। কিন্তু ধরে নিয়েছেন, কোন না কোনভাবে বুঝে যাবে তাঁর নাতি। নিশ্চয় বোঝার জন্যে কোন ইঙ্গিতও রেখেছেন। সেটা কি?'

'জানি না,' জবাব দিল অগাস্ট। ভাঁজ পড়েছে দুই ভুরুর মাঝে। 'দাদা খুব চালাক ছিল, নিজের বুদ্ধির মাপকাঠিতেই আর সবাইকে বিচার করেছে, ফলে থই পাচ্ছি না আমরা।'

'দেখি, মেসেজটা বের করো তো,' হাত বাড়াল কিশোর। 'আছে সঙ্গে?'

বের করে দিল অগাস্ট।

ছোট টেবিলে ছড়িয়ে বিছিয়ে আবার মেসেজটা পড়ল কিশোর, জোরে জোরে।

'এখনও আমার কাছে আগের মতই দুর্বোধ্য!' ভ্রূকুটি করল মুসা।

'আমার কাছেও,' অগাস্ট বলল। 'অগাস্ট আমার সৌভাগ্য, মানে কি? অগাসটাসের কোন একটা মূর্তির ভেতরে, এছাড়া আর কি? কিংবা হতে পারে, অগাস্ট মাসের কথা বলেছে। আগামীকাল আমার জন্মদিন। অগাস্টের ছয় তারিখে বেলা আড়াইটায় জন্মেছি আমি। কিন্তু মাসের মধ্যে পাথর থাকে কি করে? কোন ক্যালেণ্ডারের কথা বলেনি তো?'

'মনে হয় না,' নিজের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলল। 'সব ভাবনাচিন্তা এখন বাদ। শুতে যাব। আচ্ছা, দাঁড়াও, দেখে নিই,' অকটেভিয়ানের মূর্তির ভাঙা ধারগুলো পরীক্ষা করে দেখল সে। বাক্সটা যেখানে ছিল, খাঁজ হয়ে আছে, আঙুল বুলিয়ে দেখল। 'মূর্তির ভেতরে পাথর রাখা নিরাপদ মনে করেননি মিস্টার অগাস্ট।'

চুপ করে রইল অন্য তিনজন। বলার আছেই বা কি?

'চলো যাই,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ব। ঘুম দিয়ে উঠলে মাথাটা পরিষ্কার হবে, কোন একটা বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে হয়তো তখন।'

সাইকেল নিয়ে বাড়ি চলে এল রবিন। খাওয়ার পর খাওয়ার টেবিলে বসেই নোট লিখতে শুরু করল, সারা দিন যা যা ঘটেছে, বিস্তারিত। পরে খুঁটিনাটি সব মনে না-ও থাকতে পারে। লিখতে লিখতেই হাত থেমে গেল এক সময় হঠাৎ ঃ ডায়াল ক্যানিয়ন! তাইতো, ডায়াল ক্যানিয়ন কেন? অদ্ভুত নাম! খানিক দূরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ডেকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'বাবা, হলিউডের উত্তরে ডায়াল ক্যানিয়নের নাম শুনেছ?'

কাগজ নামিয়ে রাখলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'ডায়াল ক্যানিয়ন? বোধহয় শুনেছি। কেন?'

'নামটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে!'

'তাই, না? দাঁড়া, দেখছি।' উঠে গিয়ে বুকশেলফ থেকে মোটা একটা বই নিয়ে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড, আর একটা বড়ম্যাপ।

ম্যাপে পাওয়া গেল জায়গাটা। আঙুল রেখে বললেন, 'এই তো।' বইটা খুললেন। 'ডায়াল ক্যানিয়ন...ডায়াল ক্যানিয়ন...এই যে, নিঃসঙ্গ ছোট্ট একটা গিরিসঙ্কট, হলিউডের উত্তরে। আগে নাম ছিল সানডায়াল ক্যানিয়ন, পরে সংক্ষেপ করে নেয়া হয়েছে। এই নামকরণের কারণ, সূর্যঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চূড়াটার মিল আছে।' রবিনের দিকে তাকালেন। 'সূর্যঘড়ির কাঁটা কেমন জিনিস? পিরামিডের মত। ওটার ছায়া পড়ে ডায়ালের ওপর, তা দেখেই আগে সময় অনুমান করত লোকে।'

'থ্যাংকস,' বলেই আবার লেখায় মন দিল রবিন।

লিখতে লিখতেই তার মনে হলো, তথ্যটা কিশোরকে জানালে কেমন হয়? হয়তো তেমন কিছুই না, কিন্তু কোন্ কথা থেকে যে কখন কি আবিষ্কার করে বসবে কিশোর পাশা, আগে থেকে বলা যায় না।

উঠে এসে ফোন করল রবিন।

ফোন ধরল কিশোর। রবিনের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ঢোক গিলল, শব্দটা এপাশ থেকেও শুনতে পেল রবিন। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'রবিন! পেয়েছি!'

'কী!'

'পেয়েছি! কাল সকালে লাইব্রেরিতে যাচ্ছ তো? দুপুরের আগেই ইয়ার্ডে চলে আসবে। ঠিক একটায়, দেরি কোরো না। সব কিছু তৈরি রাখব আমি।'

'কিসের তৈরি!' কিছুই বুঝতে পারছে না রবিন।

কিন্তু লাইন কেটে দিল কিশোর।

স্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল রবিন, আস্তে করে নামিয়ে রাখল রিসিভার। নোট লেখা শেষ আর হলো না, কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল সে।

রাতে ঘুম ভাল হলো না। সকালে লাইব্রেরিতে গিয়েও কাজে মন বসাতে পারল না রবিন। থেকে থেকেই আনমনা হয়ে যাচ্ছে।

একটার আগেই ইয়ার্ডে পৌঁছে গেল রবিন। কিশোর, অগাস্ট, আর মুসা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পিকআপটাও তৈরি, ড্রাইভিং সিটে বোরিস, পাশে রোভার। দু'জনেই যাবে সঙ্গে। কিন্তু কোথায়? ট্রাকের পেছনে পুরু করে ক্যানভাস বিছানো, ছেলেদের বসার জন্যে। গোটা দুই বেলচাও আছে। কিশোরের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা।

'কিন্তু যাচ্ছিটা কোথায়?' এই নিয়ে অন্তত দশবার প্রশ্ন করল রবিন। উত্তেজিত।

ছুটে চলেছে পিকআপ।

রাস্তার দিক থেকে মুখ ফেরাল মুসা। 'আমারও সেই প্রশ্ন! কিশোর, মাঝেমধ্যে তুমি এত বেশি বেশি করো না। আমাদেরকে ভাবনায় রেখে কি লাভ তোমার? আমরা তো তোমারই সহকারী, নাকি?'

'হোরাশিও অগাস্টের মেসেজের লেখা সত্যি কিনা, যাচাই করতে যাচ্ছি,' অবশেষে মুখ খুলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বোরিস আর রোভারকে নিয়ে যাচ্ছি নিরাপত্তার জন্যে। ডাকাত ব্যাটারা যদি হামলা করে বসে, এই দুজনই যথেষ্ট। দশটা কালোগুফোরও সাধ্য হবে না দু'ভাইয়ের মোকাবেলা করে।'

'আরে দূর, ওসব কথা শুনতে চেয়েছে কে?' গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা। 'পারবে না, সে-তো আমরাও জানি। যা জানি না, সেটা বলো।'

'ঠিক আছে, বাবা, বলছি,' হাত তুলল কিশোর। 'সূত্রটা রবিনই দিয়েছে, কাল রাতে। ডায়াল ক্যানিয়নের আগের নাম ছিল সানডায়াল ক্যানিয়ন। এটা শুনেই বুঝে গেছি। ইস্, আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল! কাল ওরা আমাকে বেঁধে রেখেছিল, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখেছি, লনে পাহাড়ের চূড়ার ছায়া! যেন একটা বিশাল সূর্যঘড়ি। গাস, বুঝেছ কিছু?'

'না,' সোজাসাপ্টা জবাব।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'বুঝেছি! সূর্যঘড়ি…তারমানে কাঁটার ছায়ার মাথা যেখানে পড়বে, সেখানেই রয়েছে রক্তচক্ষু! মাটির নিচে। তাই না?'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল।

'কিন্তু মস্ত বড় লন,' মুসা তত উৎসাহ পাচ্ছে না। 'একেক সময় কাঁটার ছায়া একেক জায়গায় পড়বে, কয় জায়গা খুঁড়ব? পুরো লন তো খোঁড়া সম্ভব না।'

'পুরো লন খুঁড়তে হবে কেন?' পকেট থেকে মেসেজটা বের করে ক্যানভাসের ওপর বিছাল কিশোর। 'আবার গোড়া থেকে আলোচনা করছি, অগাস্ট তোমার নাম, অগাস্ট তোমার খ্যাতি, অগাস্ট তোমার সৌভাগ্য—এসব কথা গাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই লেখা হয়েছে। তারপর, পাহাড়প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করবে না, তোমার জন্ম তারিখের ছায়াতেই ওর অস্তিত্ব ; এটাই হলো গিয়ে আসল কথা। বলতে চেয়েছেন, গাসের জন্মদিনে পাহাড়ের ছায়া যেখানে পড়বে, সেখানেই পাওয়া যাবে পাথরটা। ওর জন্ম কবে? অগাস্টের ছয় তারিখে। ক'টার সময়?'

'আড়াইটা?' বলল অগাস্ট।

'হ্যাঁ, আড়াইটার সময় যেখানে ছায়া পড়বে, খুঁড়তে হবে সেখানেই। গভীর করে খুঁড়তে হবে। মেসেজ এখানেই শেষ, বাকিটা লিখেছেন ভাবনা গুলিয়ে দেয়ার জন্যে। হ্যাঁ, আরেকটা বাক্যঃ সময় খুব মূল্যবান। তারমানে, বেলা আড়াইটাকে প্রধান্য দিয়েছেন, দিনের অন্য কোন সময়ের ছায়া হলে চলবে না।'

'আর এক ঘন্টাও তো নেই!' ঘড়ি দেখে বলে উঠল মুসা।

'দূরও আর বেশি নেই,' কিশোর বলল। 'এসে গেছি প্রায়।'

কি ভেবে পেছনে তাকাল মুসা। রাস্তা শূন্য। একটা গাড়িও দেখা যাচ্ছে না, অনসরণ করছে না কেউ।

'আগেই দেখেছি, কেউ পিছু নেয়নি আমাদের। আর নিলে নিল। বোরিস আর রোভারের হাতের কিছু কিলঘুসি প্রাপ্যই হয়েছে ওদের।'

হঠাৎ মোড় নিয়ে পাশের সরুপথে নেমে এল পিকআপ। দু'পাশে পাহাড়। কত দিন আগে পথ বাঁধানো হয়েছিল, কে জানে, তারপর আর মেরামত করা হয়নি, নষ্ট হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, ছালচামড়া আর মাংস উঠে গেছে পথের, ছোট ছোট গর্তে পড়ে বিষম ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়ি, ঝনঝন আর্তনাদ তুলছে পুরানো বডি।

'কিশোর, পেছনে নেই,' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মুসা, 'কিন্তু সামনে আছে!'

দু'পাশে দু'জন করে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল, দৃষ্টি সামনে। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা কয়েক বিশাল ট্রাক, বুলডোজার, আর ইঞ্জিনে চলে এমন একটা দানবীয় বেলচা।

মিস্টার হোরাশিওর বাড়ির খানিকটা মস্ত চোয়ালে চেপে ধরে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে বেলচাটা, একটা ট্রাকে নামিয়ে দিয়ে চোয়াল ফাঁক করে আবার এগিয়ে যাচ্ছে আরেক লোকমা তুলে আনার জন্যে। বাড়ির ছাত আর একটা ধার ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছে যন্ত্রটা, বাকিটুকুও খতম করে দেবে দেখতে দেখতে। যেন একটা মহারাক্ষস।

বাড়ির পেছনের গাছপালা টিলাটক্কর যা আছে, সমান করে দিচ্ছে বুলডোজার। দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে হোরাশিওর অতি শখের বাগান।

'দানবের দল!' চিকচিক করছে অগাস্টের দু'চোখের কোণ। 'ইস, কি করছে! দাদা এখন থাকলে...,' গলা ধরে এল তার।

'সমান করে ফেলছে সব!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'রক্তচক্ষু আর আগের জায়গায় আছে কিনা কে জানে!'

'মনে হয় আছে,' ভুরু কুঁচকে লনের দিকে তাকিয়ে আছে অগাস্ট। 'দেখছ, ওই যে পাহাড়ের ছায়া, ওদিকে কেউ নেই।'

রাবিশ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল একটা ট্রাক। মুখ বের করে ড্রাইভার হাঁকল, 'এই সরো, পথ ছাড়ো। আমাদের তাড়া আছে।

পিকআপকে রাস্তার একপাশে সরিয়ে রাখল বোরিস, পাশ কেটে চলে গেল ট্রাকটা। আরও ট্রাক এসে পড়েছে রাবিশের বোঝা নিয়ে। ওটাও চলে গেল।

খোলা জায়গায় নিয়ে যান, লনের দিকে দেখিয়ে বোরিসকে বলল কিশোর। 'কেউ কিছু বললে আমি জবাব দেব।'

'হোকে,' বলে আবার পিকআপ রাস্তায় তুলল বোরিস, শ'দুই গজ এগিয়ে লনের কাছে এসে থামল।

লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল ছেলেরা।

ওদেরকে দেখে ভাঙা বাড়ির দিক থেকে এগিয়ে এল একজন বেঁটে-খাটো লোক, মাথায় ধাতব হেলমেট, সুপারভাইজার বোধহয়।

'এখানে কি করছ?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'বাইরের লোক আসা নিষেধ।'

ভাবভঙ্গি দেখেই ভরকে গেল মুসা আর রবিন। কি জবাব দেবে কিশোর?

কিন্তু জবাব তৈরিই রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে। 'আমার চাচা পুরানো জিনিসপত্র কিনেছিল এখান থেকে। কিছু ফেলে গেল কিনা দেখতে পাঠিয়েছে।'

'কিচ্ছু নেই!' সামান্যতম নরম হলো না লোকটা। 'একটা সূচও না। যাও।'

'আচ্ছা, কয়েক মিনিট দাঁড়াতে পারি আমরা?' সুর পাল্টাল কিশোর। 'এই যে, আমার বন্ধু,' অগাস্টকে দেখাল সে, 'ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে। আমেরিকায় কি করে বাড়িঘর ভাঙা হয়, দেখেনি কখনও। ওর নাকি খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'শুনেছ, কি বলেছি তোমাকে?' ধমকে উঠল লোকটা। 'এখানে সারকাস চলছে না, দেখার কিছু নেই। গায়ে এসে যখন কিছু পড়বে, তখন বুঝবে ঠেলা। ব্যথা পাবে, ঝামেলা বাধাবে খামোকা।'

'এই...,' চট করে ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর, 'সওয়া দুটো বাজে, এই পনেরো মিনিট?' অনুরোধ করল সে। 'পনেরো মিনিট পরেই চলে যাব।'

'পনেরো সেকেণ্ডও না!' ভীষণ একরোখা লোক। 'যাও, ভাগো!'

লনে এসে পড়া ছায়ার দিকে তাকাল ছেলেরা। পনেরো মিনিট পরেই পাহাড়ের চূড়ার ছায়া পড়বে রক্তচক্ষু যেখানে আছে, সেখানে।

'ঠিক আছে, স্যার, যাচ্ছি,' কিশোরও নাছোড়বান্দা। 'কিন্তু স্যার, দু'একটা ছবি তুলতে তো কোন আপত্তি নেই?'

জবাবের অপেক্ষা করল না কিশোর। কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা নামিয়ে নিয়ে পা বাড়াল ছায়ার দিকে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেই থেমে গেল সুপারভাইজার, বোধহয় ভাবল ওদিকে গেলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

ছায়ার মাথা থেকে গজখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর, ফিরে ভাঙা বাড়িটার ছবি তুলল একটা। ক্যামেরা আবার কাঁধে ঝুলিয়ে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধল সময় নিয়ে। ফিরে এল।

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' বলল কিশোর। 'যাচ্ছি।'

'আর যেন না দেখি এখানে!' বেশি খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছে ভাবল হয়তো লোকটা, তাই বলল, 'তবে, মাস তিনেক পরে এলে আর কিছু বলব না। ছ'টা বাড়ির আর বড় সুইমিং পুল বানিয়ে ফেলব ততদিনে, চাইলে একটা বাড়ি কিনতেও পারো।' ছোট্ট একটা হাসি দিল সে।

পিকআপে এসে উঠল কিশোর। তার পেছনে এল বিষণ্ণ তিন কিশোর।

স্টার্ট নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করতেই ক্ষোভ ঝাড়ল মুসা, 'একেবারে ছোটলোক, ব্যাটা! পনেরোটা মিনিটও থাকতে দিল না! লাঠি দিয়ে কুত্তা খেদাল যেন! গেল গাসের রক্তচক্ষু! কাল এসে লনের চিহ্নও দেখব না!'

'কাল আসতে যাচ্ছে কে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'আজ রাতেই আসব।'

'অন্ধকারে?' হাঁ হয়ে গেছে রবিন। 'অন্ধকারে কি দেখব? ছায়া-টায়া কিচ্ছু থাকবে না তখন!'

'ঈগল পাখিকে বলব জায়গাটা খুঁজে দিতে,' মুচকি হাসল কিশোর। ব্যস, এই পর্যন্তই, আর একটাও কথা বের করা গেল না তার মুখ থেকে।

ষোলো

ক্লান্ত শামুকের মত যেন গড়িয়ে চলল সময়। এক বিকেল পার করতেই ছেলেদের মনে হলো কয়েক শো' যুগ পার হচ্ছে। সময় কাটানোর জন্যে কত কী-ই যে করল ওরা ঃ বোরিস আর রোভারকে কাজে সাহায্য করল, মেরিচাচী দশবার বলেও যে কাজে হাত দেয়াতে পারেনি ছেলেদেরকে, আর কিছু না পেয়ে শেষে তেমন কাজও করল ওরা। চাইকি, অনেক পুরানো কয়েকটা লোহার চেয়ারের মরচে তুলল মুসা সিরিশ দিয়ে ঘষে, তারপর ব্রাশ নিয়ে রঙ করায় মন দিল। কিশোর এসবের মধ্যে নেই।

ডায়াল ক্যানিয়ন থেকে ফিরেই কিশোর সেই যে তার ওয়ার্কশপে ঢুকেছে, আর বেরোনোর নাম নেই। অন্য তিনজনের একজনকেও ঢুকতে দিল না। রক্তচক্ষু খোঁজার জন্যে কোন যন্ত্র বানাচ্ছে নাকি?'

অবশেষে শেষ হলো দীর্ঘ বিকেল। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে ফেলল ছেলেরা, বোরিসকেও খেয়ে নিতে বলল কিশোর।

খেয়েদেয়ে পিকআপ বের করল বোরিস, ইয়ার্ড থেকে কয়েক ব্লক দূরে সহজে চোখে পড়ে না এমন একটা জায়গায় এনে গাড়ি থামিয়ে তাতে বসে রইল চুপচাপ।

'ব্যাটাদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে কিছু করতে হবে এবার,' কিশোর বলল। 'হ্যানসনকে আসতে ফোন করে দিয়েছি, অন্ধকার নামলেই চলে আসবে। আমাদের তৈরি থাকা দরকার।'

'এই শেষবার রোলস-রয়েসে চড়া!' আফসোস করল মুসা, 'তারপর থেকে পা সম্বল!'

'কেন, সাইকেল আছে না আমাদের?' রবিন মনে করিয়ে দিল।

'ওই তো, পা-ই তো সম্বল,' মুসা বলল। 'ইঞ্জিন তো আর নেই, আরামও নেই। হাঁটার চেয়ে কম কষ্ট নাকি সাইকেল চালানো? পাহাড়ী পথে ওঠার সময় না বোঝা যায় ঠেলা! তিন গোয়েন্দার জারিজুরি শেষ।'

'এতদিন যে গাড়ি ছিল না, আমরা বসে থেকেছি নাকি?' কিশোর বলল। 'কোন না কোনভাবে কাজ উদ্ধার হয়েই গেছে।'

রোলস রয়েসের ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো অগাস্টকে, কি করে পাওয়া গেল ওটা, জানতে চাইল।

সংক্ষেপে জানাল মুসা। আক্ষেপ করল, 'এই শেষবার, বুঝলে? আর পাব না মানা করে দিয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানির ম্যানেজার। আরেকবার চাইতে গেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।'

'আরে দূর, কি বকবক শুরু করেছ!' ধমক লাগাল কিশোর। 'যখন ঠেকায় পড়ব তখন দেখা যাবে। চলো, তৈরি হয়ে নিই।'

নিজের বেডরুমে তিনজনকে নিয়ে চলল গোয়েন্দাপ্রধান।

যেতে যেতে মুসাকে বলল অগাস্ট, 'একটা কথা কিন্তু ঠিক। ক্যালিফোরনিয় অনেক বড়, গাড়ি ছাড়া অসুবিধেই হবে তোমাদের।'

'ইয়ার্ডের পিকআপ আছে,' বলল রবিন। 'ওটা ব্যবহার করতে পারছি।'

'পারছ, কিন্তু দেখছি তো, যতবারই দরকার পড়ছে, গিয়ে চাইতে হচ্ছে মেরিচাচীর কাছে। তখন বোরিসের হাতে কাজ আছে কিনা, সেটাও দেখতে হচ্ছে। অনেক ফাঁকড়া না?'

আলমারি খুলে চারটে জ্যাকেট বের করল কিশোর। সব ক'টাই তার, বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন রঙের। একেক জনকে একেকটা দিয়ে পরতে বলল। অগাস্টের গায়ে মোটামুটি ঠিকই লাগল, রবিনের গায়ে সামান্য ঢলঢলে হলো কিন্তু মুসার গায়ে লাগতেই চাইল না; জোরজার করে পরতে হলো, অন্যেরা সাহায্য না করলে পিঠের ওপর থেকেই নামাতে পারত না; চেন লাগাতে পারল না, সামনের দিক খোলা রইল জ্যাকেটের।

বেরিয়ে এল ওরা।

মেরিচাচী ওদেরকে দেখেই চোখ কপালে তুললেন। 'আরে, কি কাণ্ড! এই কিশোর, এতই শীত লাগছে তোদের? একজনের জ্যাকেট আরেকজনে না পরলে চলছে না! কি জানি বাপু, আজকালকার ছেলেছোকরাদের মতিগতি বুঝি না!'

চাচাও হাঁটাহাঁটি করছেন বাইরে। ফিরে তাকালেন।

'কয়েকটা লোককে ফাঁকি দিতে হবে, চাচী,' কিশোর বলল। সত্যি কথাটাই বলল কিশোর।

'বাচ্চাদের খেলা!' দাঁতে পাইপ, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফকফক করে ধোঁয়া ছাড়ছেন রাশেদ পাশা। 'ছেলেবেলায় আমরাও ওরকম খেলেছি, কত! আহা, কি ছিল সেসব দিন! মামা-বাড়িতে যেতাম, শীতের সন্ধ্যায় কিষাণ বাড়িতে খড় পোড়াত, ধোঁয়া উঠত, গন্ধ এখনও যেন নাকে লেগে রয়েছে! চাঁদনী রাতে খেজুরের রস চুরি করতে যেতাম মামাতো ভাইদের সঙ্গে···যদি চিনে ফেলে কেউ? তাই মামার শার্ট-পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে ছদ্মবেশ নিতাম···ঢলঢল করত···আহ্, বাচ্চা থাকাই ভাল। সোনালি দিনগুলো উড়ে চলে যায়···যেতে দাও, মেরি, ওদের আনন্দ মাটি কোরো না।'

কিশোরের ওয়ার্কশপে চলে এল ছেলেরা। ছোট টেবিলে একটা জিনিস পড়ে আছে। একটা যন্ত্র, ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের মত দেখতে, সরু দুটো তার বেরিয়ে এসেছে মূল অংশ থেকে, তারের মাথায় হেডফোন লাগানো। বোঝা গেল, সারা বিকেল এটা নিয়েই খেটেছে কিশোর।

এক কোণে চারটে বড় পুতুল, ওই যে, দরজিদের পোশাক তৈরি করার ডামি, যেগুলো কিনে এনেছিলেন রাশেদচাচা, মুণ্ডুশূন্য চারটে ধড়। নিচের স্ট্যাণ্ড কেটে ফেলে দিয়েছে কিশোর।

'এসো, হাত লাগাও,' ডাকল সে। 'এগুলোকে পোশাক পরাতে হবে। কেন জ্যাকেটগুলো পরে এসেছি, বুঝেছ তো? দূরবীন নিয়ে কেউ ইয়ার্ডের ওপর চোখ রেখেছে কিনা জানি না! রাখতেও পারে। হাতে করে আলাদা কাপড় আনলে ওরা সন্দেহ করে বসত। জ্যাকেট খোলো, পুতুলগুলোকে পরাও।'

জ্যাকেট পরে হাস্যকর রূপ নিল দরজির ডামি। হাত নেই, দু'পাশে ঝুলছে

জ্যাকেটের হাতা।

'ভূত মনে হচ্ছে,' মুসা মন্তব্য করল। 'এই জিনিস দেখিয়ে ফাঁকি দিতে চাও?'

'মাথা লাগালেই অনেক জ্যান্ত মনে হবে,' কিশোর আশ্বাস দিল।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে চারটে বেলুন বের করল সে। ফুঁ দিয়ে ফোলাল। তারপর সুতো দিয়ে বাঁধল কাটা গলার সঙ্গে। এদিক দুলছে ওদিকে দুলছে বেলুন, মনে হচ্ছে যেন মাথা নাড়ছে পুতুল।

হা হা করে হেসে উঠল মুসা। রবিন আর অগাস্টও হাসল।

'অন্ধকারে জ্যান্তই মনে হবে,' এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে দেখে আবার বলল কিশোর।

অপেক্ষা করছে ওরা। ধীরে ধীরে নামল অন্ধকার। পুতুলগুলোকে এখন আর হাস্যকর লাগছে না, হঠাৎ কেউ দেখলে বরং ভয়ই পেয়ে যাবে।

ইয়ার্ডের চত্বরে গাড়ির বাঁশি শোনা গেল।

'হ্যানসন,' কিশোর বলল।

খানিক পরেই ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ এসে থামল ওয়ার্কশপের বেড়ার বাইরে।

'ফোনেই বলেছি, ওকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে,' জানাল কিশোর। 'এসো, একটা করে পুতুল তুলে নাও সবাই। চট করে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে ফেলো।'

অন্ধকারে গা ঢেকে রয়েছে কালো রোলস রয়েস, কিন্তু তারার আলোর জন্যে পুরোপুরি লুকাতে পারছে না চকচকে শরীর।

'মাস্টার কিশোর?' ফিসফিস করে বলল হ্যানসন, গাড়ি থেকে নেমে পড়ছে। 'দরজা খুলে দিয়েছি।'

পেছনের সীটে পুতুলগুলোকে তুলে দেয়া হলো, এমনভাবে, দেখলে মনে হবে চার কিশোর বসে আছে।

'হ্যানসন,' কিশোর নির্দেশ দিল, 'কোস্ট রোড ধরে দ্রুত চলে যাবেন। মোড় নিয়ে পাহাড়ের পথ ধরে এগিয়ে যাবেন একটানা দু'ঘণ্টা, তারপর আরেক দিক দিয়ে ঘুরে এসে এখানে ফেলে যাবেন ডামিগুলো। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'যান। গুডবাই। আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না আমাদের। অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি হয়তো, কিছু মনে রাখবেন না।'

'আরে না না, কি যে বলেন,' হাঁ হাঁ করে উঠল ইংরেজ শোফার, 'খারাপই লাগছে আমার। আপনাদের সঙ্গে কাজ করে অনেক মজা পেয়েছি। যাই, সুযোগ পেলেই দেখা করব।'

'যান। ও হ্যাঁ, হেডলাইট জ্বালবেন না।'

'পুলিশ থাকলে?' অগাস্ট প্রশ্ন করল।

'ও পথে রাতে পুলিশ থাকে না, বিশেষ কোন ব্যাপার না ঘটলে।'

চলে গেল রোলস রয়েস, প্রায় নিঃশব্দে, চুপি চুপি গা ঢাকা দিয়ে পালাল যেন।

'বাহ্, চমৎকার!' এতক্ষণে কথা বলল রবিন। 'কেউ চোখ রেখে থাকলে মনে করবে, আমরাই যাচ্ছি।'

'ভেবে চুপ করে বসে থাকবে না,' কিশোর বলল। 'রোলস রয়েসের পিছু নেবে। চলো, এবার আমরাও যাই। লাল কুকুর চার দিয়ে বেরোতে হবে, বোরিস ওদিকেই পিকআপ নিয়ে বসে আছে।'

ওয়ার্কশপে ঢুকে যন্ত্রটা নিয়ে এল কিশোর। লাল কুকুর চার দিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকার নির্জন পথে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পিকআপ, প্রায় দেখাই যায় না, আগে থেকে না জানলে গাড়িটার গায়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ত ওরা।

ছেলেরা চড়ে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল বোরিস। পেছনে তাকিয়ে দেখল একবার কিশোর, না, কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে না।

নিরাপদেই পৌঁছল পিকআপ ডায়াল ক্যানিয়নে। হোরাশিও অগাস্টের ভাঙা বাড়ির কাছে এনে গাড়ি রাখল বোরিস। নীরব, নির্জন, কোথাও কোন রকম নড়াচড়ার আভাস নেই। লনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বড় ট্রাক আর বুলডোজার, যেন ভূত! প্রহরী নেই, রাখার কথা মনেই হয়নি বোধয় কড়া সুপারভাইজারের।

'বোরিস,' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল কিশোর, 'ট্রাক ঘুরিয়ে রাস্তায় নিয়ে রাখুন। কড়া নজরে রাখবেন। কিছু দেখলেই দু'বার হর্ন টিপবেন।'

'ঠিক আছে,' বলল বোরিস।

যন্ত্রটা নামিয়ে নিল মুসা, তার হাত থেকে নিয়ে কাঁধে ফেলল কিশোর। 'এইবার দেখা যাক আমার ডিটেকটর ঈগলের সন্ধান পায় কিনা।'

'কি বলছ, সহজ করেই বলো না, বাবা!' দু'হাত তুলল মুসা।

হাতে বেলচা নিয়ে পিকআপ থেকে লাফিয়ে নামল রবিন আর অগাস্ট।

'এটা মেটাল ডিটেকটর,' যন্ত্রটার লম্বা হাতলে চাপড় দিল কিশোর। 'ধাতব জিনিস মাটির কয়েক ফুট নিচে থাকলেও ঠিক ধরে ফেলবে,' লনের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

'কিন্তু রক্তচক্ষু ধাতু নয়,' রবিন প্রতিবাদ করল, 'পাথর।'

'সেটা আমিও জানি,' চলতে চলতেই বলল কিশোর। 'দুপুরে জুতোর ফিতে বেঁধেছিলাম, মনে আছে? সেই সুযোগে রূপার একটা আধডলার গুঁজে দিয়েছিলাম মাটিতে। মুদ্রাটার এক পিঠে ঈগলের ছবি আছে না? ওই পাখিকেই এখন জিজ্ঞেস করব, পাথর আছে কোথায়?'

'কিন্তু, দুটো পনেরো মিনিটে মুদ্রা গুঁজেছ,' সামনের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে বলল অগাস্ট। 'চিহ্ন কি ঠিক হবে?'

'সে-জন্যেই একটু এগিয়ে গুঁজেছি, আড়াইটায় কোথায় ছায়া পড়বে অনুমান করে নিয়ে। এই যে, এখানেই কোথাও হবে,' কাঁধ থেকে যন্ত্র নামাল সে।

ডিটেকটরের চ্যাপ্টা গোল দিকটা মাটিতে রেখে হেডফোন পরে নিল কিশোর। তারপর হাতলের কাছের একটা সুইচ টিপে দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে-পেছনে আশে-পাশে সরাতে থাকল যন্ত্রটা। 'ধাতুর সন্ধান পেলেই গুঞ্জন উঠবে হেডফোনে,' বলল সে।

কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও হলো না। ভারি যন্ত্র নাড়াচাড়া করে ক্লান্ত হয়ে গেল কিশোর। মুসার হাতে তুলে দিল।

মুসাও চেষ্টা করল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু গুঞ্জন তুলতে যেন নারাজ হয়ে আছে হেডফোন। 'ঈগল পাখি উড়ে চলে গেছে!' বলল সে একসময়। হতাশ। 'সারারাত খুঁজলেও পাব না!'

'কিন্তু এখানেই কোথাও থাকার কথা!' ফিরে বাড়ির অন্ধকার ছায়াটার দিকে তাকাল কিশোর, অনুমান করে নিল আবার। 'এখানেই আছে। আরেকটা চক্কর দাও।'

চক্কর পুরো করার দরকার হলো না, মৌমাছির গুঞ্জন উঠল হেডফোনে। লাফিয়ে উঠল মুসা, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

'চুপ! আস্তে!' মুসার কান থেকে হেডফোন খুলে নিয়ে পরল কিশোর। হ্যাঁ, ঠিকই। 'আর সামান্য একটু পিছাও তো···আরেকটু পাশে···হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে, হয়েছে, থামো!'

হেডফোন খুলে কোমরের বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলল কিশোর। হাঁটু গেড়ে বসে আলো ফেলল মাটিতে, আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে তুলে নিল মুদ্রাটা। 'রবিন, গাস, খোঁড়ো এখানেই।'

বেশ কিছুক্ষণ বেলচা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রবিন আর অগাস্ট। মুসা আর কিশোরের হাতে তুলে দিল বেলচা। পালা করে মাটি খুঁড়ে চলল চার কিশোর। কিন্তু রক্তচক্ষুর দেখা নেই।

নীরব নিথর চারদিক, বেলচার থ্যাপ থ্যাপ ছাড়া কোন শব্দ নেই, এমনকি একটা ঝিঁঝিও ডাকছে না।

এক সময় থেমে গেল মুসা। বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'উফ্ফ্, আর পারছি না!' হাঁপাচ্ছে পরিশ্রমে। 'কিশোর, ভুল করেছ, জায়গা এটা না।'

চুপ করে ভাবছে কিশোর। বাড়ির দিকে তাকাল আরেকবার, তারপর ফিরল কালো পাহাড়ের চূড়াটার দিকে। দূরত্ব আন্দাজ করল তারার আলোয়। বাড়িটার দিকে এক কদম এগোল। 'এখানে এসো। দেখা যাক খুঁড়ে।'

নীরবে বেলচা চলল আবার কিছুক্ষণ। হঠাৎ, ঠং করে কিসে যেন বাড়ি খেল বেলচা, পাথুরে কিছুতে।

'কিশোর!' কোথায় কি করছে ভুলে গিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'চুপ!' দ্রুত একবার এদিক ওদিক চেয়ে নিল কিশোর। নেমে পড়ল দ্বিতীয় গর্তটায়। টর্চের আলোয় দেখা গেল ছোট একটা বাক্সের কোণ বেরিয়ে আছে। ঝুঁকে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি সরাল, শক্ত করে চেপে ধরে টান দিতেই উঠে এল বাক্সটা। 'এটাই হবে,' ফিসফিস করল সে। 'সাজিমাটি দিয়ে তৈরি।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। 'রবিন, টর্চটা ধরো।'

ছোট্ট একটা সোনার তালা লাগানো বাক্সে। মুঠো করে ধরে চাপ দিল কিশোর, খুলল না তালা। ছোট হলেও বেশ শক্ত। শেষে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে জোরে জোরে কয়েক ঘা লাগাতেই কটাং করে ভেঙে গেল আংটা। তালাটা খুলে ছিটকে পড়ল।

আস্তে করে ডালা তুলল কিশোর।

টর্চের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল একটা লাল পাথর, তুলোর শয্যায় শুয়ে আছে।

'ইয়াল্লা!' আবার চেঁচাল মুসা। 'কিশোর, দিয়েছ সেরে কাজ!'

'বাহ, ভারি সুন্দর!' অগাস্টও চেঁচিয়ে উঠল।

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল অন্য তিনজন।

ঝাড়া মেরে অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে যেন তীব্র উজ্জ্বল আলো। শক্তিশালী কয়েকটা টর্চের আলো পড়েছে গায়ে। চোখ মেলতে পারছে না ছেলেরা। পায়ের শব্দ কানে আসছে।

'নড়বে না!' গর্জে উঠল একটা পরিচিত ভারি কণ্ঠ। 'দাও, পাথরটা।'

চোখ পিটপিট করছে ছেলেরা. আবছা মত দেখতে পাচ্ছে চারটে টর্চের ওপাশে চার জোড়া গোঁফ, এগিয়ে আসছে চারজন মানুষ। এক জনের হাতে পিস্তল। ভয়ংকর নলের কালো মুখ ছেলেদের দিকে।

'কালোগুঁফোর দল!' চাপা কণ্ঠে বলল রবিন। 'ব্যাটারা ঘাপটি মেরে বসেছিল, ট্রাকগুলোর আড়ালে।'

'দুপুরে এসেছিলে, শুনেছি,' বলল রাইস। 'ভাগিয়ে নাকি দিয়েছিল। শুনেই বুঝেছি, আবার আসবে তোমরা।'

'আলাপ বাদ দাও তো,' জ্যাকির খসখসে গলা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। 'পাথরটা নিয়ে সরে পড়া দরকার। এই ছেলে, দাও ওটা।' এগিয়ে এল সে।

ভীষণ ভয় পেয়েছে কিশোর, এতখানি ভয় পেতে আর তাকে দেখেনি কখনও রবিন আর মুসা। চোখ উল্টে পড়ে যাবে যেন যে কোন সময়! কাঁপছে থরথর করে। তার কাঁপা হাত থেকে বাক্সটা উল্টে পড়ে গেল গর্তে! 'এই···গুলি করো না! ···আ—আমি তুলছি!'

ঝুঁকে বসে কাঁপা কাঁপা আঙুলে ঝুরঝুরে মাটি ঘাঁটল সে, পাথরটা দেখা গেল হাতে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যে, নাও! তবু আমাদেরকে মেরো না!'

কিন্তু কেউ এসে পাথর নেয়ার সময় পেল না। আচমকা হাত ঘুরিয়ে পাথরটা ছুঁড়ে মারল সে, উজ্জ্বল আলোয় চকিতের জন্যে একটা রঙিন ধনুক সৃষ্টি করে জ্যাকির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল পাথরটা, হারিয়ে গেল পেছনের অন্ধকারে।

সতেরো

গাল দিয়ে দিয়ে উঠল জ্যাকি, এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়াল। 'খোঁজো!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আলো ঘোরাও, জলদি!'

ছেলেদের দিক থেকে এক সঙ্গে ঘুরে গেল সব ক'টা টর্চ।

'দৌড় দাও!' চেঁচিয়ে নিজের সঙ্গীদেরকে বলল কিশোর। 'জলদি! ওরা গুলি করবে না।'

চারটে তাড়া খাওয়া খরগোশের মত ছুটল ছেলেরা রাস্তার দিকে, অন্ধকার লন

উড়ে পেরিয়ে এল যেন। জায়গামতই বসে আছে বোরিস, ছেলেদেরকে ছুটে আসতে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল। স্টার্ট দিল ইঞ্জিন।

'বোরিস! জলদি!' পিকআপে উঠেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জলদি ছাড়ুন!'

কোন প্রশ্ন করল না বোরিস।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়েই ছুটতে শুরু করল পিকআপ। পেছনে তাকিয়ে দেখল ছেলেরা, গুঁফোর দলকে দেখা যাচ্ছে না। পাথরটা এখনও পায়নি নিশ্চয়, ওটা খোঁজা নিয়েই ব্যস্ত।

থরথর করে কাঁপছে পিকআপের পুরানো বডি, নীরব রাতে ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শুনে মনে হচ্ছে যেন কোন দৈত্যের গর্জন, দু'পাশের পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে অনেক বেশি বিকট হয়ে উঠছে শব্দ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, স্থির হয়ে বসে থাকাই মুশকিল। একে অন্যের গায়ে গা ঠেকিয়ে চাপাচাপি করে বসে আছে ছেলেরা।

সরু গিরিপথ পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল পিকআপ, এইবার শান্তি।

তবুও চুপ করে রইল ছেলেরা। ইয়ার্ডে পৌঁছার আগে একটা কথাও বলল না কেউ।

ইয়ার্ডের অন্ধকার চত্বরে এনে গাড়ি রাখল বোরিস।

চুপচাপ ট্রাক থেকে নামল ছেলেরা। বেলচা, মেটাল ডিটেকটর ফেলে এসেছে, আনতে পারেনি। আর অবশ্যই, লাল পাথরটাও।

অফিসের ধারে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল চার কিশোর।

'সব শেষ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা।

'তীরে এসে তরী ডুবল!' রবিনও বিষণ্ন।

'তাই মনে হচ্ছে?' সামান্যতম মন খারাপ হয়নি কিশোরের।

'মনে হচ্ছে মানে?' অগাস্টের কণ্ঠে বিস্ময়।

'ভেবেছিলাম,' কিশোর বলল, 'রোলস রয়েসের দিকে নজর দেবে ওরা। ফাঁকি দিতে পারব। উল্টে আমাদেরকেই ফাঁকি দিয়ে দিল। ভাগ্যিস বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল।'

'হ্যাঁ, বেঁচে ফিরেছি বটে, কিন্তু পাথরটা গেল!' মুসার গলায় তীব্র ক্ষোভ।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'টর্চটা জ্বালো তো।'

টর্চ জ্বালল রবিন, কিশোরের হাতে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল।

গোয়েন্দাপ্রধানের ছড়ানো হাতের তালুতে জ্বলছে উজ্জ্বল লাল চুনি!

'আসল রক্তচক্ষু,' হাসল কিশোর। 'ছুঁড়ে ফেলেছি নকলটা, তিন ফোঁটা যেটা ফেলে গিয়েছিল, মনে আছে? কেন জানি মনে হলো তখন, নিয়ে নিলাম সঙ্গে। এখন তো দেখছ, কাজেই লেগেছে। গর্তে আসলটাই ফেলেছিলাম। এক ফাঁকে ওটা তুলে পকেটে ঢুকিয়ে নকলটা বের করেছি। হাহ্ হাহ্! কলা দেখিয়ে এসেছি ব্যাটাদের!'

'কিশোর, সত্যিই তুমি একটা জিনিয়াস!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল রবিন।

'আর অভিনয়টা কি করল দেখলে!' অগাস্ট বলল। 'আমি তো ভেবেছিলাম, হার্টফেল করছে! ডাকাতগুলোকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দিল!'

'নাহ্, আমিও মেনে নিচ্ছি.' হাত তুলল মুসা, ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'আমাদের কিশোর পাশার কাছে শার্লক হোমস কিংবা এরকুল পোয়ারো কিছু না!'

'আমিও তাই বলি,' অন্ধকার থেকে ভেসে এল শীতল, শান্ত একটা কণ্ঠ। 'কিন্তু আর কোন চালাকি নয়, খোকা।'

ছেলেদের হতভম্ব ভাব কাটার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল অফিসের বাইরে লাগানো আলো। লম্বা, পাতলা লোকটা নেমে এল দরজার কাছ থেকে। ডান হাত বাড়ানো, পাথরটা নেয়ার জন্যে। অন্য হাতে মারাত্মক ছড়িটা। তিন-ফোঁটা!

বোকা হয়ে গেছে ছেলেরা। কথা ফুটল না মুখে।

'পালানোর চেষ্টা কোরো না,' কড়া গলায় বলল তিন-ফোঁটা। হাতের ছড়িটা ঠেলে দিল ছেলেদের দিকে, ঝট করে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলা। ঝকঝক করছে।

'সেই কখন থেকে বসে আছি,' বলল সে। 'চমৎকার বুদ্ধি করেছিলে, রোলস রয়েসে করে ডামি পাঠানো! কিন্তু কাজ হলো না কিছুই। তোমাদের চালাকি ওরাও ধরে ফেলেছে, আমিও। কেন যেন মনে হচ্ছিল, গোঁফওয়ালা রামছাগলগুলোকে ধোঁকা দেবেই তোমরা। তাই এখানে বসে আছি। ঠিকই করেছি। দাও।'

আর কিছু করার নেই, ভাবল রবিন, রক্তচক্ষু হাত ছাড়া করতেই হচ্ছে।

এখনও দ্বিধা করছে কিশোর। হাতের তালুতে যেন ওজন পরীক্ষা করল পাথরটার, ঢোক গিলল। মুখ তুলে তাকাল লোকটার দিকে। 'মিস্টার রামানাথ, আপনি কি কাটিরঙ্গা মন্দিরের কেউ? ন্যায় বিচারের মন্দিরের?'

'নিশ্চয়ই,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রামানাথ। 'নইলে পৃথিবীর এ মাথায় আসি? আমি মন্দিরের পুরোহিত। পঞ্চাশ বছর হলো, মন্দির থেকে চুরি গেছে রক্তচক্ষু, মন্দিরেরই একজন টাকা খেয়ে হোরাশিও অগাস্টকে দিয়ে দিয়েছিল ওটা। তখন থেকেই খোঁজা হচ্ছে ওই পূণ্য-পাথর,' চুনিটার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল সে। 'আমার অনেক ভাগ্য, অনেক পূণ্যের ফলেই আর খুঁজে পেয়েছি এটা। ভগবান দয়া করেছেন।' এক কদম বাড়াল। 'দাও।'

কিশোরের পেট ছুঁই ছুঁই করছে ছুরির ফলা, কিন্তু সে অবিচল। বলল, 'পাথরটার ক্ষতি করার ক্ষমতা দূর হয়েছে পঞ্চাশ বছরে, ঠিক, কিন্তু পুরোপুরি কি হয়েছে? আপনি চুরি করে কিংবা ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষতি হবে না?'

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রামানাথের শরীরে। এক লাফে পিছিয়ে গেল সে। সট করে ছুরির ফলা ঢুকে গেল ছড়ির খাপে।

'গাস, এই নাও,' পাথরটা বাড়িয়ে ধরল কিশোর। 'আমি এটা খুঁজে পেয়েছি, তোমাকে উপহার দিলাম। তোমার কিছু হবে না। কিন্তু যদি কেউ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়, পাথরের ভয়ানক অভিশাপ নামবে তার ওপর।'

থরথর করে কেঁপে উঠল রামানাথ। দু'চোখে আতংক। সামলে নিতে সময় লাগল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আ-আমাকে ক্ষমা করো, খোকা! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' ছড়ি ফেলে দিয়ে দু'হাত জড়ো করে প্রণাম করল রক্তচক্ষুকে। 'ঘাট

হয়েছে. ভগবান. অধমকে ক্ষমা করো!'

মুখ তুলে কিশোরের দিকে তাকাল রামানাথ। 'কিশোর. চলো না অফিসে বসি? কথা আছে।'

'চলুন।'

অফিসে এসে ঢুকল পাঁচজনেই। চেয়ার টেনে বসল। পকেট থেকে চেকবই আর কলম বের করে খসখস করে লিখল রামানাথ। ছিঁড়ে নিয়ে চেকটা ঠেলে দিল অগাস্টের দিকে। 'দেখো. এতে চলবে কিনা। রক্তচক্ষু তোমাদের কাছে একটা দামী পাথর. আর কিছু না. কিন্তু আমার কাছে দেবতা। যদি ওতে না হয়. আরও টাকা দেব। কিন্তু দেবতাকে না নিয়ে দেশে ফিরব না।'

চেকের অঙ্ক দেখে চোখ কপালে উঠল চার কিশোরের।

উঠে এসে আস্তে করে পাথরটা টেবিলে রাখল অগাস্ট, চেকটাও, রামানাথের সামনে। 'আপনার দেবতাকে আটকাব না আমি, মিস্টার রামানাথ, নিয়ে যান। টাকাও লাগবে না। যান, রক্তচক্ষু উপহার দিলাম আমি আপনাকে।'

আরেকবার পাথরটাকে প্রণাম করে সযত্নে বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রামানাথ। দু'গালে অশ্রুধারা। চেকটা আবার ঠেলে দিয়ে বলল, 'তোমার মত নির্লোভ ছেলে আমি দেখিনি, গাস, মাই বয়! আমাকে অপমান করো না, এই টাকাটা তোমাদেরকে আমি উপহার দিলাম। ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। যা দিলাম, এটা আমার কাছে কিছুই না। নাও। আমি আশীর্বাদ করছি. তোমরা অনেক বড় হবে, অনেক অনেক বড়।'

চেকটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল অগাস্ট।

'আচ্ছা, মিস্টার রামানাথ,' কিশোর বলল, 'কয়েকটা কথার জবাব দেবেন?'

'বলো?'

'কি করে জানলেন, রক্তচক্ষু আমেরিকায় আছে?'

'আমরা জানতাম. হোরাশিও অগাস্টই রক্তচক্ষু নিয়ে পালিয়েছে। পালাল তো পালাল, একেবারে গায়েব। কত খোঁজাখুঁজি করেছি, পাইনি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর তার নাম ছাপা হলো পত্রিকায়, তার সম্পর্কে লেখা হলো। ছুটে এল আমেরিকায়।'

'তো, কালোগুঁফোদের ব্যাপারটা কি? ওরা কি করে জানল রক্তচক্ষুর কথা?'

'আমি বলেছি। অনেক টাকা দেব চুক্তি করে আমিই ওদের কাজে লাগিয়েছি।'

'অ। আর উকিল রয় হ্যামার? তার কি লাভ ছিল?'

'চিঠির কপিটা কিনেছি তার কাছ থেকে, ব্যস, এই-ই।'

'হ্যারিসন?'

'ওকে স্রেফ ভয় দেখিয়ে খবর জোগাড় করতে চেয়েছিল রাইস, আর কিছু না। আমি কিছু টাকা দিয়ে দেব ভাবছি ওকে।'

'আচ্ছা, মিস্টার রামানাথ,' জিজ্ঞেস করার জন্যে অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছে মুসা, 'সেদিন বললেন জিকোকে মেরে ফেলেছেন. ও আবার জ্যান্ত হলো কি করে?'

হাসল রামানাথ। 'মারিনি। তোমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে ছবিতে রঙ

মাখিয়ে এনেছিলাম।'

'উফ্‌ফ্‌, সত্যি, যা ভয় পাইয়ে দিয়ে ছিলেন না!' রবিনও হাসল।

'একটা কথা,' হাত তুলল কিশোর। 'ওরা তো আর টাকা পেল না, রাইসের দলের কথা বলছি। যদি এখন পাথরটা ছিনিয়ে নিতে চায় আপনার কাছ থেকে?'

শীতল হাসি ফুটল রামানাথের ঠোঁটে, বুকের ভেতর কাঁপন তোলে সে ভয়ানক হাসি। 'খোকা, ভুলে যাচ্ছ কেন আমি ন্যায় বিচারের মন্দিরের পুরোহিত? পাহাড়ী যোদ্ধার রক্ত বইছে আমার শরীরে। বড়াই করছি না, জানো, মানুষখেকো বাঘ পথ ছেড়ে দেয় আমাদের দেখলে? আমার কাছ থেকে রক্তচক্ষু ছিনিয়ে নেবে কয়েকটা ছিঁচকে চোর, এতই সহজ?' মেঝেতে ছড়ি ঠুকল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা, আজ তাহলে আসি। কিশোর, এসো না একবার কাটিরঙ্গায়, তোমরা সবাই? অনেক কিছু দেখার আছে।'

'যাব, নিশ্চয়ই যাব!' হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুসার মুখে। 'ইনডিয়া দেখার শখ আমার অনেক দিনের।'

'সুযোগ করতে পারলে আমিও যাব,' কিশোর বলল। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে তার চোখ। 'আমার নিজের দেশকে দেখব না! এই বিদেশ বিভুঁয়ে পড়ে আছি বটে, কিন্তু দেশ তো আমার ওই উপমহাদেশেই—বাংলাদেশে!'

'যেও। হ্যাঁ, ঠিকানা তো তোমার কাছে আছেই। শুধু একটা চিঠি লিখে দিও আমার কাছে। ব্যস, আর কোন চিন্তা করতে হবে না তোমাদেরকে। তোমাদের জন্যেই দেবতাকে আবার ফিরে পেয়েছি। অনেক, অনেক ধন্যবাদ। চলি।'

'আরে, আরে, যাচ্ছেন কোথায়? বসুন,' লাফিয়ে উঠল কিশোর। 'একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম! আমাদের বাড়িতে এসে খালিমুখে ফিরে যাবেন? সকালে চাচী শুনলে আমাকে আস্ত রাখবে? অন্তত এক কাপ চা তো খেয়ে যান।'

হেসে আবার বসে পড়ল পুরোহিত। 'দাও। বুড়ো মানুষ তো, চা-ই বেশি খাই।'

সাগরসৈকত

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৮৭

চিঠিটা অদ্ভুত। হাতে নিয়ে চিন্তিত চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ কিশোর পাশা. তৃতীয়বার পড়ল ঃ

তিন গোয়েন্দা,

স্কুল তো ছুটি, চলে এসো না তিনজনেই আমাদের বাড়িতে। চমৎকার জায়গা, বুঝেছ, খুবই সুন্দর। সাগর, পাহাড়, পাখি, কি-যে দারুণ, না দেখলে বুঝবে না! হ্যাঁ, আরেকটা কথা, রহস্যের পুজারি তোমরা, কথা দিচ্ছি এখানে এলে কোন না কোন রহস্য পেয়ে যাবেই যাবে। তোমাদের সঙ্গে আমারও ছুটিটা কাটবে ভাল। এসো, পছন্দ না হলে পরের দিনই চলে যেও আবার, খরচ-খরচা সব আমার।

আসবে তো? তোমাদের অপেক্ষায় রইলাম।

-জর্জ গোবেল।

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। কিশোরের ডেস্কের উল্টোদিকে বসেছে মুসা আর রবিন।

খামটা উল্টেপাল্টে দেখছে রবিন। খামের এক কোণে প্রেরকের ঠিকানা রয়েছেঃ জর্জ গোবেল, গোবেল ভিলা, গোবেল বীচ।

'ঠিকানাটাও অদ্ভুত!' বিড়বিড় করল রবিন।

'জায়গাটা কোথায়?' মুসার প্রশ্ন।

ড্রয়ার খুলে একটা ম্যাপ বের করে বিছাল কিশোর। তিনজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। একটা জায়গায় আঙুল রাখল রবিন। 'এই যে, এই তো।...লস অ্যাঞ্জেলেসেই। যা মনে হচ্ছে শহরের বাইরে, গ্রামট্রাম থাকবে হয়তো আশেপাশে। সাগরের তীরে, এই যে। নাহ্, জায়গাটা সুন্দরই হবে।'

'কিন্তু এই জর্জ গোবেলটা কে?' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। 'আমাদের পরিচিত না!'

'কি জানি!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার গোয়েন্দাপ্রধান, চিন্তিত। 'কিন্তু চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, আমাদের নাড়িনক্ষত্র সব তার জানা।'

'দূর!' ঠোঁট ওল্টাল মুসা। 'আমার মনে হয়, কারও শয়তানী। শুঁটকি টেরিও হতে পারে। আমাদের বোকা বানানোর জন্যে করেছে। গেলেই ব্যাটার হাসির খোরাক হব হয়তো।'

'তা-ও হতে পারে!' রবিন বলল।

চিঠিটার দিকে আরেকবার তাকাল কিশোর পাশা, নীরবে কিছুক্ষণ ভাবল। মুখ

তুলল হঠাৎ। 'এই ছুটিতে তোমাদের কোথাও যাওয়ার কথা আছে?'

'মা আয়ারল্যাণ্ডে যাবে,' রবিন বলল। 'অনেক দিন আমার নানা-নানীকে দেখে না, এবার নাকি দেখতে যাবে। বাবা সঙ্গে যেতেও পারে, না-ও যেতে পারে। আমাকে যেতে বলেছিল, আমি মানা করে দিয়েছি। যা শীত এখন, কে যায় মরতে! সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকা কাঁথামুড়ি হয়ে, বরফের জ্বালায় বাইরে বেরোনোর জো নেই। তার চেয়ে আমাদের রকি বীচই অনেক ভাল। আমি যাচ্ছি না।'

'আমার আম্মা-আব্বা যাবে নিউ ইয়র্কে,' মুসা বলল। 'মার বোনের সঙ্গে দেখা করতে। আমি যাব...যদি না...'

'যদি না?' কিশোর ভুরু কোঁচকাল।

'যদি না, গোবেল বীচে যাওয়া হয়। নিউ ইয়র্কের লোকের ভিড়ের চেয়ে সাগর অনেক ভাল। তাছাড়া বলছে, পাহাড়, পাখি...'

'আরে আরে! তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে!' টিপ্পনি কাটল রবিন। 'ফুলের কথা কিন্তু বলেনি।'

কড়া একটা জবাব দেয়ার জন্যে ঘুরে চাইল মুসা। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল কিশোর, 'রাখো, রাখো, ঝগড়া বাধিও না, জরুরী আলাপ এটা। হ্যাঁ, তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমরা দু'জন কোথাও যাচ্ছ না। আমিও না। তাহলে গোবেল বীচে যেতে বাধা কোথায়?'

'যাবে ঠিক করে ফেলেছ?' মুসার কণ্ঠে বিস্ময়। যদি শুঁটকির কাজ হয়? ও ব্যাটা রকি বীচে আসেনি এবার ছুটিতে, ওখানে গিয়ে বসে আছে কিনা কে জানে?

'গেলে গেল। ওর চিঠি পেয়ে আমরা গেছি, কি করে জানছে? আমরা কি বলতে যাচ্ছি? তোমার এয়ারগানটা সঙ্গে নেবে, রবিন আর আমি ছিপ নেব। চুটিয়ে পাখি শিকার করব, খরগোশ মারব, মাছ ধরব।'

'থাকব কোথায়?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'গোবেল ভিলায়। আর ও-রকম কোন ভিলা না থাকলে শহরে এসে তাঁবু-টাবু কিনে নিয়ে যেতে পারব। অসুবিধে কি?'

না, কোন অসুবিধে নেই। আরও খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে একমত হয়ে গেল তিন কিশোর, গোবেল বীচেই যাবে। আসছে বুধবার, মাঝখানে শুধু একটা দিন বাকি।

মাত্র একটা দিনই যেন আর ফুরোতে চায় না। অবশেষে বুধবার এল। ভোরে উঠে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিল রবিন আর মুসা, নাশতা সেরেই পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলে এল। কিশোরও তৈরি হয়ে ওদের অপেক্ষা করছে, দুই বন্ধু আসতেই ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তিনজনের কাঁধেই ব্যাগ। মুসার হাতে এয়ারগান, রবিন আর কিশোরের হাতে ছিপ।

ছুটির সময়। বাস স্টেশনে বেশ ভিড়। স্কুল ছুটি, বড়দের চেয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভিড়ই বেশি। কোলাহল, কলরব, উত্তেজনা, সবাই আনন্দমুখর। কোথাও না কোথাও ছুটি কাটাতে যাচ্ছে সবাই।

প্রথম বাসটায় জায়গা পেল না তিন গোয়েন্দা, পরের বাসের টিকিট কাটতে হলো।

বাস ছাড়ল। রাস্তায় গাড়ির ভিড়।

শহর ছাড়িয়ে এল এক সময় বাস। ধীরে ধীরে কমছে যানবাহনের ভিড়। পথের দু'পাশে বাড়িঘর আর তেমন নেই এখন, পাহাড় আর টিলাটক্করও কমে আসছে। খোলা প্রান্তর।

তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি। জানালার কাছে বসেছে কিশোর, তার দু'পাশে অন্য দুই গোয়েন্দা। হুহু বাতাসে চুল উড়ছে ওদের। মনে দারুণ সুখ। আর থাকতে না পেরে এক সময় গান গেয়ে উঠল মুসা। তার সঙ্গে যোগ দিল রবিন, দেখতে দেখতে গান শুরু হয়ে গেল সারা বাস জুড়ে। হাতে তালি দিয়ে তাল দিচ্ছে কয়েকটা ছেলে। বাসের কণ্ডাকটরও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। তালে তালে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে ড্রাইভার। নাহ্, ছুটি বটে!

গান থামল এক সময়।

'কিশোর,' মুসা বলল, 'খাচ্ছি কখন? পেট জ্বলছে খিদেয়।'

'এখনি?' জানালার দিক থেকে মুখ ফেরাল কিশোর। 'মাত্র তো এগারোটা। আরও ঘণ্টা দেড়েক যাক।'

'খাইছে, এতক্ষণ!' আঁতকে উঠল মুসা। 'টিকব না! সেই ভোরে কখন কি খেয়েছি ভুলেই গেছি!'

হেসে ফেলল কিশোর। ব্যাগ খুলে বড় তিনটে চকলেট বের করে একটা করে তুলে দিল রবিন আর মুসার হাতে। নিজেরটারও মোড়ক ছাড়িয়ে কামড় বসাল। আবার চোখ ফেরাল বাইরে। দু'পাশে তৃণভূমি, তার ওপারে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল। পথের ধারে বড় বড় গাছ, স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে সরে যাচ্ছে।

বারোটা নাগাদ একটা স্টেশনে থামল বাস। এখানে গাড়ি বদল করতে হবে, বাস থেকে নামল তিন গোয়েন্দা।

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এখানে চলে গেছে পথ। নিচে ছড়ানো উপত্যকা রোদে ঝলমল করছে। গরু-ভেড়া চরছে। খেয়ে নিয়ে তারপর বাসে উঠবে ঠিক করল তিন গোয়েন্দা। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা, একটা বড় গাছ দেখেছে, তার ছায়ায় বসে খাবে।

পেছনে আচমকা 'ম্বঁ-অঁ-অঁ!' শুনে 'ইয়াল্লা!' বলে চেঁচিয়ে এক লাফ মারল মুসা। ফিরে চেয়ে দেখল, বাদামী রঙের একটা গরু বড় বড় অবাক চোখ মেলে তাকে দেখছে। হো হো করে হেসে উঠল কিশোর আর রবিন।

সঙ্গে আনা স্যাণ্ডউইচ দিয়ে খাওয়া সারল ওরা।

'কটার সময় পৌঁছুব?' আঙুল চাটছে মুসা। 'খাওয়াটা যুতসই হলো না। শিগগিরই খিদে লেগে যাবে।'

'এই সাতটা-আটটা তো বাজবেই,' কিশোর জবাব দিল। হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। 'আরেকটা লম্বা যাত্রা।'

'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?' প্রস্তাব দিল রবিন। 'একটা ট্যাকসি ভাড়া

করে নিলেই তো পারি? ভিড়ও হবে না, যেতেও পারব তাড়াতাড়ি।'

'হুঁ, কথাটা মন্দ না,' এক কনুইয়ে ভর রেখে কাত হয়ে শরীরটাকে সামান্য তুলল কিশোর। 'তাই করব। মুসা, দেখো না একটা ট্যাকসি।'

আবার যাত্রা শুরু হলো। চোখের পলকে যেন এগিয়ে আসছে মাইল পোস্টগুলো, পেছনে পড়ে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে একটা বড় পাহাড়ে উঠতে শুরু করল গাড়ি, পথটা পাহাড় পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ করেই যেন চূড়ায় পৌঁছে গেল গাড়ি, সাগর চোখে পড়ল। বিকেলের সোনালী আলোয় দূরের সাগরটাকে দেখাচ্ছে মস্ত এক আয়নার মত।

'ওই যে! এসে পড়েছি!' হাত তুলল কিশোর।

'দারুণ!' চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে রবিন।

'ইস্, এখুনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে!' মুসা বলল।

'আর বড় জোর মিনিট বিশেক লাগবে,' কিশোর বলল। 'খুব তাড়াতাড়িই এসেছি। বাসে এলে অর্ধেক পথ আসতাম এতক্ষণে।'

সৈকতের ধার দিয়ে ছুটছে ট্যাকসি।

'খুবই সুন্দর!' কিশোর বলল। 'কি ঘন নীল!'

'আর দ্বীপগুলো দেখেছ?' রবিন অভিভূত। 'যেন ছবি! নাহ্, এসে ভুল করিনি, কিশোর!'

'গোবেল ভিলাটা এখন খুঁজে পেলেই হয়!' মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।

কিন্তু পাওয়া গেল গোবেল ভিলা, সহজেই। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করতেই হাত তুলে দেখিয়ে দিল। ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় বিশাল এক বাড়ি, সাগরের দিকে মুখ করা। শ্বেতপাথরে তৈরি, নিশ্চয় অনেক পুরানো আমলের। সামনে ছড়ানো বাগান, ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে; গোলাপই বেশি।

বাড়ির সিংহ-দরজার মস্ত খুঁটিও শ্বেতপাথরে তৈরি, ধনুকের মত বাঁকানো গেটের কপালে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা রয়েছেঃ গোবেল ভিলা। ধবধবে শাদা পাথরে যেন ফুটে রয়েছে কালো অক্ষরগুলো।

'ব্যস, পৌঁছে গেলাম!' চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ছাড়ল গোয়েন্দা প্রধান।

দুই

খোয়া বিছানো পথ ধরে গাড়ি বারান্দায় এসে থামল ট্যাকসি, শব্দ শুনেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে দাঁড়ালেন গাড়ির পাশে। মেরিচাচীর বয়েসী, বেশ সুন্দরী, হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। মহিলাকে ভাল লাগল ছেলেদের।

'এসে পড়ছ!' হেসে বললেন মহিলা। 'তোমাদের অপেক্ষায়ই ছিলাম। তাড়াতাড়িই এসেছ।'

'ট্যাকসিতে এসেছি, তাই,' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল কিশোর। দরজা খুলে নামল। রবিন আর মুসাও নামল।

গালে চুমু খেয়ে ছেলেদেরকে স্বাগত জানালেন মহিলা। ট্যাকসি বিদায় করে দেয়া হলো। পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এলেন ড্রইংরুমে। বিরাট হলরুম, আসবাবপত্র সব পুরানো আমলের, কিন্তু খুব সুন্দর।

চারপাশে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'কই, জর্জকে দেখছি না?'

'ওর কথা আর বোলো না,' হাসলেন মহিলা। 'ও কি বাড়ি থাকে? তোমরা আসবে, আমাকে বলে সেই সকালে বেরিয়েছে, আর দেখা নেই। হয়তো মাছ ধরছে জেলে ছেলেদের সঙ্গে, কিংবা পাহাড়ে উঠে পাখির ডিম পাড়ছে। বড় বেশি দুষ্টু হয়েছে, কথাবার্তা একেবারে শোনে না...'

এক পাশে দরজা খুলে গেল। লম্বা একজন লোক ঘরে ঢুকলেন, ফেকাসে চামড়া—রোদের মুখ দেখে বলে মনে হলো না, বাদামী মস্ত গোঁফ, চওড়া কপাল বিরক্তিতে কুঁচকানো, চোখ দুটো চেহারার সঙ্গে বেমানান—বড় বড়, তাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ।

'এই শোনো,' ভদ্রলোককে ডাকলেন মহিলা। 'ওরা রকি বীচ থেকে এসেছে, জর্জের বন্ধু।' ছেলেদেরকে বললেন, 'ও জর্জের বাবা।'

উঠে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা।...ও মুসা আমান। আর ও হলো রবিন মিলফোর্ড।

'হুঁ, তোমরা বসো,' বিরক্তিতে আরও কুঁচকে গেল জর্জের বাবার চেহারা। 'হট্টগোল একদম পছন্দ করি না আমি, বুঝেছ? চুপচাপ থাকবে।' বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না,' তাড়াতাড়ি বললেন মহিলা, 'ও ওরকমই। তবে মনটা খুব ভাল। সারাদিন কি সব গবেষণা নিয়ে থাকে, এখন একটা বই লিখছে, বিজ্ঞানের কি একটা জটিল বিষয়ের ওপর। তাই অমন খিটখিটে মেজাজ।'

'না না, ঠিক আছে, আমরা কিছু মনে করিনি,' মহিলার অপ্রতিভ ভাব দেখে বলে উঠল রবিন। 'বিজ্ঞানীরা ওরকমই হয়, দুনিয়ার আর কোন খোঁজখবর থাকে না তো।'

'কথা পরে হবে,' বললেন মহিলা। 'অনেক দূর থেকে এসেছ, সারাদিন কি খেয়েছ না খেয়েছ কে জানে। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো। ওই যে, ওদিকে বাথরুম। আমি খাবার বাড়ছি।'

খাওয়া সারা হলো, তবু জর্জের দেখা নেই।

ছেলেদেরকে থাকার ঘর দেখিয়ে দিলেন জর্জের মা। পাশাপাশি দুটো ঘর, একেক ঘরে দুটো করে বিছানা। লাল টালির ছাত, অনেক উঁচুতে। এক পাশের বড় বড় জানালা দিয়ে তৃণভূমি আর তার ওপারের জলাভূমি চোখে পড়ে। অন্য পাশের একটা জানালা দিয়ে সাগর দেখা যায়। বাতাসে জানালার কাচের শার্শিতে মাথা ঠুকছে রক্তগোলাপ। এত ফুল, খুবই ভাল লাগছে রবিনের।

'জর্জ এখনও আসছে না!' রবিন বলল।

'ওর আসার ঠিকঠিকানা নেই,' ঠোঁট বাঁকালেন মহিলা। 'হয়তো জেলেদের বাড়িতেই খেয়ে রাতদুপুরে আসবে। ওর বাপ জানলে তো দেবে পিট্টি, পা টিপে

টিপে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়বে। অনেক বুঝিয়েছি, রাগ করেছি, শাসন করেছি, শোনে না। ছেড়ে দিয়েছি এখন, যা খুশি করুক গে! বড় হলে যদি ভাল হয় তো হবে!'

বড় করে হাই তুলল মুসা। শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর আর রবিন, এরপর কি হবে বুঝতে পারছে। ওদের আশঙ্কাই ঠিক হলো। হাঁ হাঁ করে উঠলেন মহিলা, 'এই যে, ঘুম পেয়েছে! সারাদিন গাড়িতে, কম পরিশ্রম? শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো!' কিশোর আর মুসাকে বললেন, 'তোমরা দুজন এঘরে শোও। রবিন, তুমি ওঘরে চলে যাও।...হ্যাঁ, রাতে কোন কিছুর দরকার হলে ডেকো আমাকে। একটুও লজ্জা কোরো না। আমি যাই।'

'গাধা কাথাকার!' জর্জের মা চলে যেতেই মুসার দিকে চেয়ে ধমকে উঠল কিশোর। 'আর খানিকক্ষণ চেপে রাখতে পারলে না? ভেবেছি, খাওয়ার পর সৈকতে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসব। দিলে সব মাটি করে! কি করে মানা করি মহিলার মুখের ওপর? ভাববে বেয়াদব।'

'আমি...আমি, বুঝিইনি!' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল মুসা। 'মহিলার রান্না খুব ভাল, বেশি খেয়ে ফেলেছি...তাই...'

'...তাই, আর কি? নাক ডাকিয়ে ঘুমাও এখন!'

'কিন্তু জর্জের ব্যাপারটা কি, বলো তো?' রবিন কথার মোড় ঘোরাল। 'আমাদেরকে এভাবে দাওয়াত করে এনে...'

'আসবে সময় হলে,' মুসা বলল। 'শুঁটকির ফাঁকিতে পড়িনি, এতেই আমি খুশি! ভেবে অবাক হচ্ছি, ছেলেটা কে?'

'এত দেরিতে হচ্ছ?' রবিন পাল্টা প্রশ্ন করল। 'আমি তো চিঠি পাওয়ার পর থেকেই ভাবছি, সে কে? কি করে আমাদের নাম জানল?'

'রহস্যজনক!' গম্ভীর মুখে বলল কিশোর। 'নিশ্চয় আমাদের পরিচিত কেউ, কোন একটা মতলব আছে তার, হয়তো আমাদের সাহায্য দরকার।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল রবিন আর মুসা, বুঝতে পারছে না।

'এখন শুয়ে পড়ো,' কাপড় ছাড়তে শুরু করল কিশোর। 'পরে জানা যাবে কি ব্যাপার। জর্জ আগে আসুক তো।'

রাতে জর্জ কখন এল, কাপড় ছাড়ল, শুলো, কিছুই টের পেল না রবিন। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে, সূর্য উঠেছে তখন।

চোখ মেলতেই লাল টালির ছাত চোখে পড়ল রবিনের। প্রথমে বুঝতেই পারল না কোথায় আছে। মাথা কাত করে জানালার দিকে তাকাল, ভোরের বাতাসে দুলছে গোলাপের ডাল, আলতো বাড়ি মারছে শার্শিতে। হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল তার, কোথায় রয়েছে। মুখ ফিরিয়ে আরেক পাশে তাকাতেই দেখল, অন্য বিছানাটাও এখন আর খালি নয়। আরেক পাশে তাকাতেই দেখল, অন্য বিছানাটাও এখন আর খালি নয়। কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে একটা ছেলে, গলা পর্যন্ত চাদর টানা।

নড়েচড়ে উঠল ছেলেটা, চোখ মেলল, রবিনের দিকে তাকাল।

'জর্জ?' রবিন বলল।

বিছানায় উঠে বসল ছেলেটা, আস্তে করে মাথা নোয়াল। মুসার চেয়েও ছোট করে ছাঁটা কালো চুল, মোটা নাক, রোদেপোড়া চেহারা। কিন্তু চোখ দুটো বড় বড়, ধূসর. বাপের চোখের মতই তাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। চেহারাটা কেমন যেন পরিচিত মনে হলো রবিনের, আগে কোথাও দেখেছে. কিন্তু কোথায়. মনে করতে পারল না।

একটাও কথা না বলে উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল জর্জ। ভীষণ পেচ্ছাপ চেপেছে রবিনের, অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল সে. কিন্তু জর্জের বেরোনোর নাম নেই। শেষে আর থাকতে না পেরে, পাশের ঘরে চলে এল। এখানেও বাথরুম খালি নেই, মুসা ঢুকেছে। কিশোরের বাথরুমের কাজ শেষ, চুল আঁচড়াচ্ছে।

আর পারছে না রবিন। জানালা দিয়েই কল ছেড়ে দেবে কিনা ভাবছে, এই সময় দরজা খুলল মুসা।

বারান্দায় বেরোতেই ডিম আর মাংসভাজার গন্ধ নাকে এল। আগে আগে চলেছে জর্জ, তিন গোয়েন্দার কারও সঙ্গেই কথা বলছে না ফিরেও তাকাচ্ছে না। দাওয়াত করে এনে এ-কেমন ব্যবহার?

ডাইনিং টেবিলে নাস্তা দিয়েছেন মিসেস গোবেল। কয়েকটা এঁটো প্লেট সরাচ্ছেন, বোধহয় খেয়ে উঠে গেছে জর্জের বাবা।

জর্জের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন মহিলা। 'আরে, জর্জ, এ কি চেহারা করেছিস! চুলের এ-অবস্থা করেছিস কেন? নাকে কি হয়েছে? বোলতা-টোলতা কামড়েছে?'

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চেয়ারে বসে গেল জর্জ। এক টুকরো পাঁউরুটি তুলে নিয়ে তাতে মাখন লাগাতে শুরু করল। কারও দিকেই তাকাচ্ছে না।

স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মিসেস গোবেল। শেষে মুখ বাঁকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোর যা ইচ্ছে, করগে, আর কিচ্ছু বলব না!...তোমরা বসো, বাবা, নিজের হাতে নিয়ে খাও।' এঁটো কাপপ্লেট তুলে নিয়ে সিংকে ভেজাতে চলে গেলেন তিনি।

নাশতা শেষ হলো। মুখ তুলল জর্জ। এই প্রথম কথা বলল ছেলেদের সঙ্গে, 'আমি মাছ ধরতে যাব। তোমরা?' মেয়েলী কণ্ঠস্বর। চেনা চেনা।

'আমরাও যাব,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা। 'তুমি না গেলেও যেতাম। ছিপ নিয়ে এসেছি আমরা।' কাটা কাটা জবাব।

হাসল জর্জ। কেমন যেন পরিচিত হাসিটা, সামনের দুটো দাঁত সামান্য উঁচু না হলে খুব মিষ্টি দেখাত। 'খুব রেগে গেছ, না? চলো, উঠে পড়ি। বাবা এসে দেখে ফেললে হয়তো অন্য কাজে লাগিয়ে দেবে। কিংবা ঘরে আটকে দেবে।'

মিসেস গোবেলকে বলে জর্জের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। রবিনের হাতে ছিপ, মুসার হাতে এয়ারগান, কিশোরের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা।

সৈকতের ধার ধরে এগিয়ে চলল ওরা। দিগন্তের ওপরে অনেকখানি উঠে পড়েছে সূর্য, সাগরের সোনালি পানি নীল হতে আরম্ভ করেছে, ঝলমল করছে কাঁচা রোদে।

হাঁটতে হাঁটতেই হাত তুলে একটা দ্বীপ দেখাল জর্জ। কেমন যেন অদ্ভুত, পাথুরে দ্বীপ। এক পাশ থেকে একটা সরু প্রণালী বেরিয়ে মিশেছে সাগরের সঙ্গে। দ্বীপের মাঝে একটা উঁচু টিলার ওপরে ভাঙা কিছু দালানকোঠা, অনেক পুরানো কোন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বোধহয়। 'সুন্দর জায়গা, না?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর আর রবিন।

'ওটার নাম গোবেল দ্বীপ,' কিশোরের দিকে ফিরল জর্জ, তার তামাটে চোখে নীল সাগরের প্রতিফলন। 'খুবই সুন্দর জায়গা। একদিন তোমাদেরকে নিয়ে যাব ওখানে। কবে, এখনি বলতে পারছি না।'

কোথায় শুনেছে ওই মেয়েলী কণ্ঠস্বর? ওই চোখ কোথায় দেখেছে? মনের অলিগলিতে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে রবিন, কিন্তু জবাব মিলছে না।

'গোবেল দ্বীপ!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'কাদের ওটা? তোমাদের?'

'আমার,' হাসল জর্জ। 'মানে, আমারই হবে একদিন। ওই দ্বীপ, দুর্গ।'

তিন

ক্ষণিকের জন্যে থ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'ওই দ্বীপ!' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মুসা, 'আস্ত একটা দ্বীপ তোমার!'

'বললাম না, একদিন হবে,' হাসছে জর্জ। 'বিশ্বাস না হলে মা-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। দ্বীপটা এখন মায়ের, তারমানে, আমারই তো?'

'হুঁ! হলেই বা কি?' আপনমনেই বলল মুসা। 'কালো কালো সব পাথর। নারকেল বীথি নেই, বনবাদাড় নেই, আসলে, প্রবালদ্বীপ হলো সব চেয়ে সুন্দর।'

'ওটাও সুন্দর,' জোর গলায় বলল জর্জ। 'গেলেই বুঝবে। অসংখ্য খরগোশ আছে, আর করমোরেন্ট। সী-গালের তো ঝাঁক পড়ে এক এক সময়। এয়ারগান দিয়ে আর ক'টা মারবে? দুর্গটাও এককালে খুব সুন্দর ছিল। এখন ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে, তা-ও সুন্দর।'

'যত যা-ই বলো, আমার কাছে ভূতুড়ে মনে হচ্ছে!' সাফ জবাব দিল মুসা।

'ভূত আছে ভাবছ নাকি? তোমাদের সেই টেরর ক্যাসলের ভূত?'

'তুমি কি করে জানলে?' ঝট করে ফিরল রবিন।

'জানি জানি,' রহস্যময় হাসি হাসল জর্জ। 'আরও অনেক কিছুই জানি। তোমাদের নাড়িনক্ষত্র সব জানা আছে আমার।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দ্বীপটা সুন্দর। আরেকটা ব্যাপার, ভূত নেই, তবে গুপ্তধন থাকতে পারে।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালো কিশোর।

'চলো, কোথাও গিয়ে বসি,' এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জর্জ। 'লম্বা কাহিনী। ওই যে, ওই পাথরগুলোর ওপর গিয়ে বসি, চলো।'

'কোনখান থেকে শুরু করি?' একটা পাথরে বসতে বসতে বলল জর্জ। 'হ্যাঁ, অনেক আগে এখানকার প্রায় সমস্ত জায়গা ছিল আমার মায়ের পূর্বপুরুষদের। যতই দিন গেল, ধীরে ধীরে গরীব হয়ে পড়ল তারা, সমস্ত জায়গাজমি বেচে বেচে খেল।

কিন্তু ওই ছোট্ট দ্বীপটা বেচেনি, কিংবা হয়তো কেনার লোক পায়নি, তাই বেচতে পারেনি। কে কিনবে? ওই ভাঙা দুর্গ দিয়ে কী হবে কার?'

'ভালই হয়েছে। চমৎকার ওই দ্বীপটার এখন মালিক হব আমি।...দ্বীপটা ছাড়াও আরও কিছু মাকে দিয়ে যেতে পেরেছে আমার নানা, বাড়িটা, গোবেল ভিলা। ভেঙেচুরে গিয়েছিল, বাবা অনেক খরচাপাতি করে সারিয়ে নিয়েছেন। দুর্গটা বাবার কোন কাজে লাগছে না, নইলে সারিয়ে নিত।'

জর্জকে ঘিরে বসেছে তিন গোয়েন্দা। আগ্রহ নিয়ে শুনছে তার কথা।

'হুঁ, দ্বীপটা সুন্দরই!' কিশোর বলল। 'মালিক হতে পারলে, আমিও তোমার মতই খুশি হতাম।'

'হ্যাঁ, এখানকার অনেক ছেলেমেয়েই সেকথা বলে, দ্বীপটা তাদের ঈর্ষার বস্তু। কতবার কতজন সাধাসাধি করেছে আমাকে, ওখানে নিয়ে যেতে। যাইনি। রেগে গিয়ে অনেকেই আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে, বড় লোক বলে আমি নাকি অহংকারে বাঁচি না। হিহ্!'

দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আছে চারজনেই। ভাটার টানে পানি নেমে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে দ্বীপটা।

'ওরা নিজে নিজে চলে গেলেই তো পারে?' বলল কিশোর।

'এত সহজ না,' মাথা নাড়ল জর্জ। 'নৌকা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। পথ চেনা না থাকলে নৌকা নিয়ে গেলেও বিপদে পড়তে হবে। প্রণালীটার জায়গায় জায়গায় ভীষণ গভীর, কিন্তু বেশির ভাগ জায়গাই অগভীর, চোখা সব পাথর বেরিয়ে আছে কোথাও পানির ওপরে, কোথাও পানির নিচে। নৌকার তলায় ঘষা লাগলেই সর্বনাশ। চিরে, কেটে ফালাফালা হয়ে যাবে। তারপর সাঁতরে তীরে ওঠা! অসম্ভব!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'ডুবে যাওয়া জাহাজের মাস্তুলে বাড়ি লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়।'

'ডুবে যাওয়া জাহাজ!' চকচক করছে কিশোরের চোখ। 'আছে নাকি ওখানে!'

'এক কালে অসংখ্য ছিল,' জর্জ বলল। এখন সাফ করে ফেলা হয়েছে, করেছে গুপ্তধন শিকারীরা। তবে ছোটখাট একটা দুটো যে এখনও নেই তা নয়। আর বড় একটা আছে, দ্বীপের ওপাশে। গভীর পানিতে। সাগর শান্ত থাকলে নৌকো থেকে নিচে তাকালে ওটার ভাঙা মাস্তুল চোখে পড়ে, তার নিচে অন্ধকার, আর কিছু দেখা যায় না। মিটিমিটি হাসছে সে। 'ওই ভাঙা জাহাজটাও আমার।'

হাঁ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। বলে কি জর্জ!

জোরে মাথা ঝাঁকাল জর্জ। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। জাহাজটা ছিল আমার নানার-নানার-বাবার। সোনা নিয়ে আসছিল ওটা, সোনার বার। গোবেল দ্বীপের কাছে ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়।'

'তাই? বারগুলোর কি হলো?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের।

'কেউ জানে না,' মাথা নাড়ল জর্জ। 'হয়তো চুরি হয়ে গেছে কোনভাবে। গুপ্তধন শিকারীরা আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছে জাহাজটা, সোনার একটা টুকরোও পায়নি।'

'মেরেছে!' তুড়ি বাজাল মুসা। 'কতখানি গভীর? ডুব দেয়া যায়? দেখতে ইচ্ছে করছে!'

'ডুবুরীর পোশাক হলে তো যায়ই,' জর্জ বলল। 'তবে ওপর থেকে দেখতে চাইলে আজই যেতে পারি। বিকেলে। পুরো ভাটা থাকবে তখন, পানি নেমে যাবে অনেক, তাছাড়া সাগরও শান্ত আজ।'

'দারুণ হবে!' খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল রবিন। 'দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।'

কিশোর চুপ করে রয়েছে, আস্তে আস্তে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, তারমানে গভীর ভাবনা চলেছে তার মাথায়।

'তো, জর্জ,' মুসা বলল, 'মাছ ধরার কি হবে? বাড়িতে না বলে এলে, মাছ ধরতে যাচ্ছ?'

'আগে রাফিয়ানকে ডেকে নিয়ে আসি,' জর্জ উঠে দাঁড়াল।

'রাফিয়ান?' কপাল কুঁচকে গেছে মুসার।

'কথাটা গোপন রাখবে তো? বাড়িতে কেউ যেন না জানে।'

'জানবে না, কথা দিলাম,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা।

'রাফিয়ান আমার সবচে বড় বন্ধু,' জর্জ বলল। 'কিন্তু মা আর বাবা একদম দেখতে পারে না ওকে, কাজেই লুকিয়ে রাখতে হয়। যাই, নিয়ে আসি।'

পাহাড়ী পথ ধরে ছুটে চলে গেল জর্জ। অবাক হয়ে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। তিনজনেই একমত, সাংঘাতিক রহস্যময় কিশোর জর্জ গোবেল।

'ওই রাফিয়ানটা আবার কে?' মুসা বলে উঠল।

'হবে হয়তো কোন জেলের ছেলে-টেলে,' রবিন সন্দেহ করল, 'জর্জের মা-বাবা তাই দেখতে পারে না।'

নরম বালিতে গা ছড়িয়ে পাথরে হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষা করে রইল ছেলেরা। খানিক পরেই বড় একটা টিলার ওপাশে জর্জের গলা শোনা গেল। 'আরে আয় রাফি, জলদি আয়, ওরা বসে আছে!'

টিলার মাথায় দেখা গেল জর্জ আর তার বন্ধুকে। পিঠ সোজা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। ও, এই তাহলে রাফিয়ান। জেলের ছেলে নয়, মস্ত এক কুকুর, বাদামী রঙের মাংগ্রল্। অস্বাভাবিক লম্বা লেজ, চওড়া মুখে ছড়িয়ে রয়েছে যেন বিস্তৃত হাসি। আনন্দে জর্জের চারপাশ ঘিরে লাফাতে লাফাতে আসছে। ঢাল বেয়ে ছুটে নামছে জর্জ।

'এই হলো রাফিয়ান,' কাছে এসে পরিচয় করিয়ে দিল জর্জ, হাঁপাচ্ছে। 'খুব সুন্দর, না? একেবারে নিখুঁত।'

ভুল বলেছে জর্জ। মোটেই নিখুঁত নয় রাফিয়ান, বরং খুঁতই বেশি। পিঠ সামান্য কুঁজো, শরীরের তুলনায় অনেক বড় মাথা- মাংগ্রল্ কুকুরের সাধারণত এমন হয় না, কানের ডগা গোল হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে চোখা, বড় বড়, লেজটা এত লম্বা, মোটা রোমশ না হলে চিতাবাঘের লেজ বলেই মনে হত। সব কিছু মিলিয়ে মাংগ্রলের ভয়ংকরত্ব নেই চেহারায়, আছে একটা হাস্যকর ভাব, তবে আদর করতে ইচ্ছে করে, এটা ঠিক। প্রথম দর্শনেই তিন গোয়েন্দাকে ভালবেসে

ফেলেছে কুকুরটা, তার উন্মাদ নাচ আর অনর্গল গাল-হাত চেটে দেয়া থেকেই বোঝা যায়।

'লক্ষ্মী ছেলে!' আদর করে রাফিয়ানের নাক চাপড়ে দিল রবিন।

মুসার নাক-মুখ চেটে দিল রাফিয়ান।

'আরে আরে, এই করছিস কি, কুত্তার বাচ্চা কুত্তা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'অপবিত্র করে দিচ্ছিস! আমার মা দেখলে এখন সাত-বার সোনারূপা ধোয়া পানি দিয়ে গোসল করাত! কুত্তা নাকি নাপাক জীব!'

কিন্তু নাপাক জীবটা এই কটু কথায় কিছুই মনে করল না, বরং আদর করে পেছন থেকে মুসার কাঁধে দুই পা তুলে দিয়ে হ্যাহ্ হ্যাহ্ করে হাসল।

জোরে হেসে উঠল রবিন আর জর্জ।

'ইস্, ওরকম একটা কুকুর যদি থাকত আমার!' কিশোর আফসোস করল। 'এই রাফিয়ান, এদিকে আয়।'

এক লাফে কিশোরের প্রায় কোলে এসে পড়ল রাফিয়ান।

আন্তরিক হাসি ফুটল জর্জের মুখে, জ্বলজ্বল করে উঠল তামাটে চোখের তারা। হাত-পা ছড়িয়ে ধপ করে কিশোরের পাশে বালিতে বসে পড়ল। 'বাহ্, আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছে নাকি?' কটাক্ষ করল সে। 'রাফিয়ানকে ভীষণ ভালবাসি আমি। জানো, মাত্র এক বছর বয়েস ওটার, অথচ কত বড় হয়ে গেছে! জলার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, গত বছর। চেহারা ভাল না বলেই বোধহয় ফেলে দিয়ে এসেছিল ওকে ওর মালিক। বাড়ি নিয়ে এলাম। প্রথমে মা কিছু মনে করেনি। কিন্তু যতই বড় হতে লাগল, দুষ্টুমি বেড়ে গেল রাফিয়ানের, শেষে মা আর সইতে পারল না...'

'কি দুষ্টুমি করত?' রবিন জানতে চাইল।

'যা পেত তাই চিবাত। ড্রইংরুমের নতুন কার্পেটের কোণা চিবিয়ে দিয়েছে নষ্ট করে, মা'র একটা নতুন হ্যাট কামড়ে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। বাবার স্যাণ্ডেল আর কাগজ চিবাতে গিয়েই পড়ল বিপদে। ধরে আচ্ছামত ধোলাই লাগাল বাবা। তারপর থেকেই বাবাকে দেখতে পারে না। ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে যায়। এই কাণ্ড করলে কি আর বাড়িতে রাখা যায় ওকে? শেষে দিল একদিন বাড়ি থেকে বের করে। বাবা হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, এরপর আর ওকে বাড়িতে নিয়ে গেলে আমাকে সুদ্ধ বের করে দেবে।'

'হ্যাঁ, তোমার বাবাকে দেখলেই ভয় করে,' মুসা মাথা দোলাল। 'সারাক্ষণই যেন রেগে আছে!'

সাগরের দিকে চোখ ফেরাল জর্জ। 'বাবা ওরকমই! রাফিয়ানকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার পর কত কেঁদেছি, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছি, না খেয়ে থেকেছি, কেয়ারই করল না বাবা। সাফ জবাব, কুকুর বাড়িতে ঢোকানো যাবে না। আমার দুঃখে রাফিয়ানও কেঁদেছে।'

'আরে দূর! যতসব গল্প। কুকুর আবার কাঁদে নাকি?' মুসা ফস করে বলে বসল।

দপ করে জ্বলে উঠল জর্জের চোখ। 'তুমি ওসবের কি বুঝবে, মুসা আমান?

ঘোড়া দেখলে ভয় পাও, কুকুর পছন্দ করো না…'

'ঘোড়া দেখলে ভয় পাই, তুমি জানলে কি করে?' অবাক হয়ে গেছে মুসা।

'না, ইয়ে, মানে, যে লোক কুকুর পছন্দ করে না, ঘোড়াকে তো ভয় সে পাবেই,' বলে তাড়াতাড়ি অন্য কথায় চলে গেল জর্জ। 'ও হ্যাঁ, চলো সাঁতার কাটতে যাই। নাকি মাছ ধরবে?'

'কুকুরটাকে এখন কোথায় রাখো, জর্জ?' কিশোর জানতে চাইল।

'ফগ-এর কাছে। ওর বাবা জেলে। গরীব, নিজেরাই খেতে পায় না, কুকুরকে খাওয়াবে কোথা থেকে? রাফিয়ানের খরচ আমিই দিই। মাঝে মাঝে ফগকেও কিছু হাত খরচ দিই, রাফিয়ানকে যত্ন করে, সেজন্যে।'

টুংটাং টুংটাং ঘণ্টা বেজে উঠল। রাস্তা দিয়ে আইসক্রীমওয়ালা যাচ্ছে।

'আইসক্রীম!' এক লাফে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'এই মিয়া, দাঁড়াও দাঁড়াও!' মোটা সাইজের গোটা চারেক চকলেট-আইসক্রীম কিনে নিয়ে এল সে। রবিন আর কিশোরকে দিল একটা করে। জর্জের দিকে বাড়িয়ে ধরতেই ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। 'না, তোমার আইসক্রীম আমি খাব না!' ঝংকার দিয়ে উঠল জর্জ। 'তুমি আমার রাফিয়ানকে গালমন্দ করেছ!'

'গালমন্দ আবার করলাম কখন!…আচ্ছা, ঠিক আছে, আর করব না। এই রাফিয়ান, তুইও নে,' নিজেরটা বাড়িয়ে ধরল মুসা।

কখন কি গালমন্দ করেছে মুসা, তাতে থোড়াই কেয়ার রাফিয়ানের, গপ করে আইসক্রীমটা কামড়ে ধরে খেতে শুরু করে দিল সে।

নরম হলো জর্জ। 'আর কক্ষনো বকবে না তো ওকে?'

'না, বকব না। নাও।'

আইসক্রীম নিল জর্জ। নিজের জন্যে আরেকটা কিনে নিয়ে এল মুসা।

নীরবে বসে আইসক্রীম খেল ওরা কিছুক্ষণ।

একসময় জর্জ বলল, 'সত্যি, তোমরা আসাতে যা খুশি হয়েছি না! চলো, একটা নৌকা নিয়ে আজ বিকেলেই যাই। আমার জাহাজটা দেখবে। কি বলো?'

'নিশ্চয়ই!' প্রায় এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা।

'হুফ!' বলে উঠল রাফিয়ান, জোরে জোরে নাড়ছে লম্বা লেজ, তারমানে সে-ও যেতে রাজি।

চার

ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল যেন সকালটা। গোটাকয়েক রঙিন মাছ ধরেছে আর ছেড়েছে রবিন। একের পর এক গুলি করে গেছে মুসা, কিন্তু একটা পাখিকেও লাগাতে পারেনি, তার গুলি কোনখান দিয়ে গেছে, টেরই পায়নি পাখি, রেগেমেগে শেষে ঢিল মেরে দু'একটা পাখিকে উড়িয়ে দিয়েছে, জর্জ আর রবিনের টিটকারি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, তবে রাফিয়ান খুব ভাল ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে। পাখি, দেখলেই আলতো 'হউ' করে মুসার কাপড় কামড়ে ধরে টেনে ফিরিয়ে পাখিটা দেখিয়ে দিয়েছে। রীতিমত ভাব হয়ে গেছে এখন দু'জনের।

দুপুর হয়ে আসছে। গরম বাড়ছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ছেলেদেরকে নীল সাগর। এয়ারগান ফেলে কাপড় খুলে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা। তার সঙ্গে সঙ্গেই নামল রাফিয়ান। রবিন আর কিশোরও নামল। কিন্তু আশ্চর্য! জর্জ নামল না। কিছুতেই নামানো গেল না তাকে। সাঁতার কাটার মুড নেই নাকি তার আজ?

দুপুর নাগাদ ছুঁচোর নাচন আরম্ভ হলো ছেলেদের পেটে। বাড়ির পথ ধরল ওরা।

ভেড়ার মাংসের বড়া, আপেলের হালুয়া, ঘরে বানানো দই আর পনির দিয়ে চমৎকার খাওয়া হলো। সব শেষে এল গাজরের মোরব্বা! মুসার হাসি দেখে কে? মিসেস গোবেল বুঝে গেছেন, কে ভোজন-রসিক, তাই সেদিকেই তাঁর আনাগোনা বেশি।

'বিকেলে কোথায় যাচ্ছিস তোরা?' মহিলা সত্যিই ভাল। অল্প সময়েই একেবারে আপন করে নিয়েছেন ছেলে তিনটেকে।

'আমাদেরকে তার জাহাজটা দেখাতে নিয়ে যাবে জর্জ,' রবিন বলল।

চোখ বড় বড় হলো মিসেস গোবেলের। 'জাহাজ দেখাতে নিয়ে যাবে জর্জ! বলিস কি? এ-যে পশ্চিমে সূর্য উঠল রে! কত ছেলেমেয়ে ওকে সাধাসাধি করে করে হয়রান, শেষে আমাকে এসে ধরেছে, আর বলেও কিছু করাতে পারিনি! নিয়ে যায়নি। অথচ...'

চুপচাপ খাচ্ছিল জর্জ, বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ওরা আমার বন্ধু, তাই নিয়ে যাব। আমার ইচ্ছে না হলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও নিয়ে যাব না।'

'হুঁ, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বয়েই গেছে তোর কাছে আসতে!...যাক, তোর যে অন্তত তিনজন বন্ধু জুটেছে, এতেই আমি খুশি। তোর এই গোঁয়ার্তুমির জন্যে কেউ পছন্দ করে তোকে? তোর বাপ পর্যন্ত দেখতে পারে না।'

'না না, খালা,' হাত তুলল মুসা, 'আমরা খুব পছন্দ করি ওকে। তাছাড়া ওর রা...আঁউউ!' পায়ে জর্জের প্রচণ্ড লাথি খেয়ে থেমে গেল সে।

'কি, কি হলো!' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিসেস গোবেল।

'না, কিছু না...পিঁপড়ে কামড়েছে!'

অবাক হয়ে এক মুহূর্ত মুসার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর একটা প্লেট টেনে নিয়ে তাতে খাবার তুলতে শুরু করলেন। জর্জের বাবা টেবিলে খেতে আসেননি– স্বস্তিই বোধ করছে ছেলেরা। তাঁর ঘরে তাঁকে খাবার দিয়ে আসা হবে।

খাওয়ার পর আর একটা মিনিটও দেরি করল না ছেলেরা। প্রায় ছুটে চলে এল সৈকতে। কুকুরটাকে আনতে গিয়েছিল যখন, খুব সম্ভব তখনই বলে রেখেছিল জর্জ, নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে ফগ। ওদেরই বয়েসী আরেক কিশোর, রোদে-পোড়া বাদামী মুখের চামড়া, কোঁকড়ানো বড় বড় চুল। সৈকতে বালির ওপর ডিঙির অর্ধেকটা টেনে তুলে তার পাশে বসে অপেক্ষা করছে। তার পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে রাফিয়ান, কুকুরটার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলাচ্ছে ফগ।

ছেলেদের সাড়া পেয়েই চোখ মেলল রাফিয়ান, তড়াক করে উঠেই লম্বা লেজ

দুলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে এল। ফগ ফিরে তাকাল।

'এসেছেন,' উঠে দাঁড়িয়েছে ফগ। 'আসুন, নৌকা তৈরি।...এরাই আপনার বন্ধু?' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

একে একে হাত মেলাল তিন গোয়েন্দা।

নৌকায় উঠল চার কিশোর, রাফিয়ানও উঠল। ধাক্কা দিয়ে ডিঙিটাকে পানিতে নামিয়ে দিল ফগ, আরেক ঠেলা দিয়ে ছেড়ে দিল। দাঁড় তুলে নিয়েছে জর্জ, পানিতে ফেলল ঝপাং করে।

সুন্দর বিকেল। নীল সাগর, ছোট ছোট ঢেউ। তিরতির করে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে ডিঙি, চারপাশ থেকে ওটাকে ঘিরে রেখেছে ঢেউয়ের শাদা ফেনা। একপাশ থেকে এসে ছলাত করে বাড়ি মারছে ঢেউ, পানি ছিটকে উঠছে, মাথায় পানি পড়ার ভয়ে চট করে মাথা নুইয়ে ফেলছে রাফিয়ান, বার বার। 'হউঅউ' করে ধমক লাগাচ্ছে ঢেউকে।

'এই দুষ্টু,' বকা দিল জর্জ, 'চুপ করে বসো।'

'আহা, করুক না একটু দুষ্টুমি,' খাতির করতে চাইছে মুসা, 'কুকুরের বাচ্চা বটে, কিন্তু খুব ভাল মানুষ।'

'তা ঠিকই বলেছ,' কুকুর যে কি করে মানুষ হলো, বোধহয় জর্জের মনেও জাগল না প্রশ্নটা। 'ঢেউকে ধমকাচ্ছে বটে, কিন্তু ভয় একটুও পায় না। ও খুব ভাল সাঁতারু।'

'হুফ!' প্রশংসা বুঝতে পারল যেন রাফিয়ান, প্রথমে মুসার কান, তারপর জর্জের নাক চেটে দিল খুশি হয়ে।

'বাহ্, বুঝতে পারে তো?' হাসিমুখে বলল মুসা।

'তা তো পারেই,' মাথা ঝোঁকাল জর্জ। 'ও সব কথা বুঝতে পারে।'

'এই যে, এসে গেছি,' দ্বীপটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। 'যা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক বড়!'

আরও কাছে এসে গেল দ্বীপ। চারপাশে চোখা পাথরের ছড়াছড়ি– দ্বীপের ধারে, পানিতে। জায়গা জানা না থাকলে কোন নৌকা কিংবা জাহাজ নোঙর করতে পারবে না, যেতেই পারবে না কাছে। দ্বীপের ঠিক মাঝখান থেকে গজিয়েছে একটা পাহাড়, তার মাথায় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। শ্বেতপাথরে তৈরি হয়েছিল, দাঁড়িয়ে রয়েছে আধখানা ধনুকের মত ভাঙা খিলান, মোটা স্তম্ভ, কিছু কিছু দেয়াল। এক কালের শির উঁচু করে থাকা চমৎকার দুর্গে এখন দাঁড়কাকের বাসা, উঁচু থাম আর খিলানের মাথায় সার দিয়ে বসে আছে অগুনতি সী-গাল।

'গা শিরশির করে দেখলে!' কিশোর বলল। 'এত পুরানো ভাঙা দুর্গ আর দেখিনি। ভেতরে ঢুকে দেখা দরকার। রাত কাটাতে কেমন লাগবে ওখানে!'

হাত থেমে গেল জর্জের, ঝট করে চোখ ফিরিয়ে তাকাল। 'একেবারে মনের কথাটা বলেছ! কখনও কাটিয়ে দেখিনি, একা একা সাহসই পাইনি। এবার দেখব। চারজন এক সঙ্গে থাকলে আর...কি বলো? দারুণ হবে না?'

'হবে,' রবিন বলল। 'কিন্তু তোমার মা কি রাজি হবে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল জর্জ। 'তবে হয়েও যেতে পারে চেপে ধরলে।'

'আজ দ্বীপে নামছি তো?' কিশোর জানতে চাইল।
'সময় হবে না,' জর্জ বলল। 'দ্বীপ ঘুরে গিয়ে জাহাজ দেখে আবার সাঁঝের আগে বাড়ি ফেরা, তাতেই দেরি হয়ে যাবে।'
'ঠিক আছে, চলো, আগে জাহাজটাই দেখি। দেখি, অনেক বেয়েছ,' হাত বাড়াল কিশোর, 'এবার আমাকে দাও।'
'ওসব আমার অভ্যাস আছে,' দাঁড় পানি থেকে তুলে ফেলল জর্জ। 'তবু নাও। বসে থাকতে পারলে কাজ করে কে?' হাসল সে। 'হুঁশিয়ার! পাথরে লাগিয়ে দিও না!'
জায়গা বদল করল কিশোর আর জর্জ।
দাঁড় পানিতে ফেলল কিশোর। দুলে উঠল ডিঙি, নাক ঘুরে গেল শাঁই করে। কিন্তু সামলে নিল সে। জর্জের মত অত ভাল বাইতে পারে না। ডিঙির নাক এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে সামান্য, তাতে অসুবিধে নেই, সোজা পথে চললেই হলো।
দ্বীপের অন্য পাশে চলে এল ওরা, খোলা সাগরের দিকে। দুর্গের এদিকটা একেবারে ভেঙে পড়েছে, স্তূপ হয়ে আছে শাদা পাথর।
'খোলা তো, বাতাসের ঝাপটা খুব বেশি এদিকে,' বুঝিয়ে বলল জর্জ, 'তাই ওই অবস্থা। জানো, এদিকে একটা ছোট্ট জেটি আছে, গোপন জেটি। দ্বীপের ভেতরে ঢুকে যাওয়া একটা খাঁড়িতে। এখন শুধু আমি জানি কোথায় আছে।'
খানিক পরে কিশোরের হাত থেকে আবার দাঁড় নিয়ে নিল জর্জ, জায়গাটা খারাপ, আর কারও হাতে নৌকার দায়িত্ব দিতে সাহস পাচ্ছে না সে। দ্বীপের ধার ধরে আরও কিছু দূর চলে হঠাৎ ডিঙির নাক ঘোরাল, বেয়ে নিয়ে চলল খোলা সাগরের দিকে। একটা জায়গায় এসে দাঁড় বাওয়া থামিয়ে ফিরে তাকাল দ্বীপের দিকে।
'জাহাজটা কোথায় কি করে বুঝবে?' কিশোর ভুরু কোঁচকাল।
'ওই যে, গাঁয়ের গির্জার চূড়াটা দেখছ?' হাত তুলে দেখাল জর্জ। 'আর ওই পাহাড়ের মাথা? দুটোকে দুটো বিন্দু ধরো। এইবার দ্বীপের ওই যে বড় বড় দুটো টাওয়ার, ওগুলোর মাঝখান দিয়ে তাকাও। টাওয়ারের মাথাদুটোকে দুটো বিন্দু ধরো। চারটে বিন্দু এক লাইনে হয়েছে?'
'না,' মাথা নাড়ল কিশোর আস্তে করে, 'হয়নি এখনও। টাওয়ারের মাথা দুটো একটু উঁচু মনে হচ্ছে।'
'হ্যাঁ,' আস্তে আস্তে ডিঙিটাকে সরিয়ে নিয়ে চলল জর্জ।
খোলা সাগরের তুলনায় পানি এখানে বেশ শান্ত। কালচে নীল একটা আয়না যেন বিছিয়ে রয়েছে। নৌকার ধার দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন, জাহাজটা দেখা যায় কিনা খুঁজছে।
'আরেকটু বাঁয়ে সরাতে হবে,' জর্জ বলল।
'হুফ!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রাফিয়ান। জোরে জোরে লেজ নাড়ছে।
'হয়েছে!' কিশোরও চেঁচিয়ে উঠল। 'এক লাইনে এসে গেছে চারটে বিন্দু! থামো!' কিন্তু সে বলার আগেই দাঁড় বাওয়া থামিয়ে দিয়েছে জর্জ।

নৌকার কিনারা দিয়ে নিচে উঁকি দিল চার কিশোর, রাফিয়ানও গলা বাড়িয়ে দিল। প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না, তারপর ধীরে ধীরে আবছা মত দেখা গেল একটা বিশাল কালো অবয়ব, ওটাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোটা খুঁটি– ভাঙা মাস্তুল!

'একটু কাত হয়ে রয়েছে না?' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'জর্জ, নামা যায় না?'

'কেন যাবে না?' জর্জ হাসল। 'নামতে চাইলে নামো। ভয় লাগবে না তো?'

'আরে দূর, কি যে বলো! আগেও নেমেছি, পুরানো জাহাজের খোল পানির তলায় নেমে দেখার অভ্যাস আছে। তবে ডুবুরির পোশাক পরে। ওসব ছাড়া নামতে পারব?'

'পারবে, যদি দম বেশিক্ষণ রাখতে পারো।'

'আমি পারব,' জ্যাকেট খুলতে শুরু করেছে মুসা। সাঁতারে ওস্তাদ সে!

শুধু জাঙ্গিয়া পরে আস্তে করে নেমে পড়ল মুসা। ডিগবাজি খেয়ে ঘুরিয়ে ফেলল শরীরটাকে পানির তলায়, মাথা নিচু করে দ্রুত নেমে চলল হাত-পা চালিয়ে।

'তুমি যাবে?' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

মাথা নাড়ল রবিন। 'তোমরাই যাও, আমার শর্দি শর্দি ভাব।'

'কঙ্কাল দ্বীপে শর্দি হয়েছিল আমার, এখানে হলো তোমার, হাহ্!' কাপড় খোলা হয়ে গেছে, নেমে পড়ল কিশোর।

মাথা নিচু করে সাঁতরে নিচে নামার সময় কিভাবে চোখ খোলা রাখতে হয়, জানা আছে কিশোরের, ডাইভিঙে দক্ষ ওস্তাদের কাছে ট্রেনিং নিয়েছে। চলার পথে আশপাশে তাকিয়ে দেখছে সে। বড় বেশি নীরব আর কেমন যেন বিষণ্ণ লাগছে এখানে। ওপর থেকে পানি নীল মনে হয়, কিন্তু এখানে কালচে, আশপাশে কালো কালো ছায়া– বিকেল বলেই, গা ছমছম করে। নিচে জাহাজের অবয়ব আরও স্পষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে, কাত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে এক অজানা ভয়ংকর দানব, সাড়া পেলেই জেগে উঠবে।

মুসার মত এতক্ষণ দম রাখতে পারল না কিশোর, আবার ওপরে ভেসে উঠতে পেরে খুশিই হলো। হাঁউস করে জোরে শ্বাস ফেলে নৌকায় উঠে এল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দারুণ!··· ভেতরে ঢুকে ভালমত খুঁজে দেখতে পারলে ভাল হত। কে জানে সোনার বাক্সগুলো···'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই নৌকার পাশে ভেসে উঠল মুসা। সেদিকে চেয়ে জর্জ বলল, 'নেই। এক তিল জায়গা খোঁজা বাকি রাখেনি ড্রাইভাররা। কিচ্ছু পায়নি।' পশ্চিম দিগন্তে তাকাল সে, 'বেলা আন্দাজ করল। 'আর দেরি করা যাবে না। চলো, নইলে চায়ের দেরি হয়ে যাবে।'

তাড়াহুড়ো করেও দেরি হয়েই গেল, বেশি না, মিনিট দশেক। চা নিয়ে অপেক্ষা করছেন মিসেস গোবেল।

চা খেয়ে আবার একটু হাঁটাহাঁটি করতে বেরোল ছেলেরা, জলার ধারে চলে এল। তাদের পায়ের কাছে নাচানাচি করছে রাফিয়ান, উল্লাসে।

সন্ধ্যা নামছে। বাড়ি ফিরছে জলার সব পাখিরা। এখানে ওখানে শুধু দু'একটা শাদা বক ধ্যানমগ্ন হয়ে এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শেষ লোকমা খাবারের আশায়।

বাড়ি ফিরল ছেলেরা। রাতের খাবার খেয়ে শু'তে গেল।

'গুড নাইট, জর্জ,' ঘুমজড়ানো গলায় বলল রবিন। চমৎকার একটা দিন কাটল, তোমারই জন্যে, ধন্যবাদ।'

'কাল আরও সুন্দর কাটবে,' জর্জের কণ্ঠেও ঘুম। 'কাল আমার দ্বীপে নামব তোমাদের নিয়ে, দুর্গ দেখাব···দুর্গ···'

জর্জের শেষ কথাটা রবিনের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না, ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

পাঁচ

সকলের আগে রবিনের ঘুম ভাঙল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, উজ্জ্বল রোদ, চমৎকার আবহাওয়া। জর্জকে ডেকে তুলল সে।

হাই তুলতে তুলতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জর্জ। 'উম্‌ম্‌! আজ না গেলেই ভাল!'

'কেন! কেন!' আঁতকে উঠল রবিন।

'ঝড় আসবে,' দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে জর্জ, চিন্তিত।

'কিন্তু আবহাওয়া তো পরিষ্কার!' জর্জের পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। 'সূর্যের সামনে ছায়া নেই, এক রত্তি মেঘ নেই আকাশে।'

'বাতাসের গতি উল্টোপাল্টা, টের পাচ্ছ না? আর ওই দেখো, দ্বীপের কাছে যে ঢেউ ভাঙছে, মাথাগুলো শাদা। অশুভ সংকেত।'

'যাবে না তাহলে?' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'রাফিয়ানের কথা ভেবেছ? আমাদের সঙ্গ না পেলে আজ কি রকম দুঃখ পাবে ও?'

হেসে ফেলল জর্জ। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাব, যাব। কেঁদে ফেলো না।'

'কি যে বলো!' রবিনও হাসল, লজ্জা পেয়েছে। 'আচ্ছা, ঝড়টা কতখানি খারাপ···' বলেই জর্জের চেহারা দেখে থেমে গেল, আবার না মানা করে বসে যেতে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'আর খারাপ হলে হলো। ঝড়ের ভয়ে তো আর ঘরে বসে থাকা যায় না। তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি দেখি, কিশোর আর মুসা উঠেছে কিনা।'

ভরপেট নাস্তা করল চারজনে। ছেলেরা দ্বীপে যাবে শুনে পোঁটলা করে খাবার বেঁধে দিলেন জর্জের মা, অনেক খাবার। বলে দিলেন, গাঁয়ের বাজার থেকে কিছু লেমোনেডের বোতল কিনে সঙ্গে নিতে। যেখানে-সেখানে যেন পানি না খায়, বারবার হুঁশিয়ার করে দিলেন।

সৈকতের পথ ধরে হেঁটে চলল ওরা। সবাই খুশি। ঝড়ের কথা কিশোর আর মুসাও শুনেছে, কিন্তু খুব একটা আমল দিচ্ছে না। ঝড়ের আগে দ্বীপে পৌঁছে যেতে পারলে আর কোন ভয় নেই।

ফগদের বাড়িতে পৌছল ওরা। বাড়ির পেছনে শেকলে বাঁধা রয়েছে রাফিয়ান, ওদেরকে দেখেই 'হউ-হউ' করে উঠল। চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এল ফগ।

'মর্নিং, মাস্টার জর্জ,' বলল সে। তার কণ্ঠস্বর অবাক করল রবিনকে, কেন যেন মনে হলো, 'মাস্টার' বলতে বাধছে ফগের। রাফিয়ানের বাঁধন খুলে দিল সে।

খুশিতে পাগল হয়ে গেল যেন রাফিয়ান। ছেলেদেরকে ঘিরে নাচছে, আর ঘেউ ঘেউ করছে।

'গুড মর্নিং, রাফি,' হেসে বলল কিশোর। 'আরে, অমন পাগল হয়ে গেলি কেন? আয়, এদিকে আয়।'

লাফিয়ে এসে কিশোরের পায়ের কাছে পড়ল রাফিয়ান। তার গায়ে দু'পা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, কান চেটে দিল কিশোরের। পরক্ষণেই লাফিয়ে গিয়ে পড়ল জর্জের গায়ে।

সৈকত ধরে এগোল ওরা আবার। অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে রাফিয়ান, পিছে পিছে চলেছে, সুযোগ পেলেই চেটে দিচ্ছে জর্জের হাত।

এক জায়গায় কয়েকটা বড় বড় পাথর নেমে গেছে পানিতে, ওখানে নৌকা বাঁধা। একে একে উঠে পড়ল অভিযাত্রীরা, নৌকা ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিল ফগ। দাঁড় তুলে নিল জর্জ।

তীরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ফগ। চেঁচিয়ে বলল, 'বেশি দেরি করো না। তাড়াতাড়ি চলে যাও। ঝড় আসবে।'

'জানি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল জর্জ। 'ভেব না, ঝড়ের আগেই দ্বীপে উঠে যাব। আসতে দেরি আছে এখনও।'

দাঁড় বেয়ে চলল জর্জ। রাফিয়ানের আনন্দের সীমা নেই। ছোট্ট নৌকাটা ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে, সেই সঙ্গে নাচছে কুকুরটা। লাফ দিয়ে একবার নৌকার এ-মাথায় চলে আসছে, আরেকবার ও-মাথায়। দুলে উঠছে নৌকা। তাতে আরও মজা পাচ্ছে সে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

এক দৃষ্টিতে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, কাছিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দ্বীপটার দিকে চেয়ে চেয়ে আগের দিনের মতই উত্তেজনা বোধ করছে।

'জর্জ,' এক সময় বলল কিশোর, 'উঠব কোন দিক দিয়ে? খালি তো দেখছি পাথর আর পাথর, নৌকা ভেড়ানোর জায়গা কোথায়?'

'আছে, আছে,' রহস্যময় হাসি হাসল জর্জ। 'কাল বলেছিলাম না, ছোট্ট একটা জেটি আছে? লুকানো। দ্বীপের পুব ধারে।'

দক্ষ হাতে চোখা পাথরের ফাঁক দিয়ে ডিঙিটাকে চালিয়ে নিয়ে চলল জর্জ, পাকা মাঝি সে কোন সন্দেহ নেই। সামনে চোখা পাথরের দেয়াল, তার পরে কি আছে দেখা যায় না। একটা ফাঁক দিয়ে নৌকা ঢুকিয়ে দিল জর্জ, দেয়ালের অন্য পাশে চলে এল। জেটিটা দেখতে পেল সবাই। প্রাকৃতিক জেটি। শাদা বালিতে ঢাকা ছোট্ট একটুকরো সমতল জায়গা, প্রায় চারপাশ থেকেই ঘিরে রেখেছে উঁচু

পাথরের দেয়াল। বাইরে থেকে জায়গাটা দেখা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সরু প্রণালী ধরে এগিয়ে চলেছে ডিঙি, জেটির দিকে। শান্ত পানি কাচের মত পরিষ্কার। রঙিন ছোট ছোট মাছগুলোকে মনে হচ্ছে রঙিন স্ফটিকে তৈরি। মুগ্ধ হয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা।

'ইস্, কি সুন্দর!' জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখ। 'তুমি ভাগ্যবতী।'

ঝট করে চোখ তুলে তাকাল জর্জ। মুসা ঠিক খেয়াল করল না ব্যাপারটা, কিন্তু রবিন অবাক হলো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ঘ্যাচ করে বালিতে ঠেকল নৌকার তলা, ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ডিঙি।

হলদে শাদা মসৃণ বালিতে লাফিয়ে নামল ওরা।

'সত্যিই তাহলে দ্বীপে পৌঁছলাম!' খুশিতে ওখানেই এক গড়ান দিল রবিন। তার সঙ্গে যোগ দিল রাফিয়ান। হেসে উঠল অন্যেরা।

টেনে নৌকাটাকে ডাঙায় তুলতে শুরু করল জর্জ। তার সঙ্গে হাত মেলাল মুসা। 'আর বেশি ওপরে তুলে কি হবে? জোয়ার কি এত ওপরে আসে?'

'ঝড় আসবে ভুলে গেছ? পানি এখন শান্ত, ঝড়ের সময় দেখবে কি রকম ফুঁসে ওঠে। নৌকাটাকে টেনে নামিয়ে বাড়ি মেরে গুঁড়ো করে দিক, তাই চাও?'

না, চায় না মুসা, পারলে এখন পাহাড়ের মাথায় তুলে রাখে নৌকাটাকে।

'চলো, চলো, ঘুরেফিরে দেখি,' তর সইছে না রবিনের। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে সে। 'এসো, এসো।'

ছোট্ট একটা পাহাড়, আসলে টিলা বলাই উচিত। ওটা পেরিয়ে মোটামুটি একটা সমতল জায়গায় চলে এল ওরা। এত সুন্দর জায়গা খুব কমই দেখেছে তিন গোয়েন্দা। আশেপাশে খরগোশের ছড়াছড়ি। ওরা কাছাকাছি এলেই একটু সরে যাচ্ছে, ভয় পেয়ে গর্তে ঢোকার কোন লক্ষণই নেই জানোয়ারগুলোর মাঝে।

'এক্কেবারে পোষা!' অবাক হয়ে বলল কিশোর।

'এখানে কেউ আসে না তো, তাই। আমিও ভয় দেখাই না ওদের।' কুকুরটার দিকে চেয়ে হঠাৎ ধমকে উঠল জর্জ, 'এই রাফি, রাফি, এলি এদিকে! ধরে থাপ্পড় লাগাব কিন্তু।'

একটা খরগোশকে তাড়া করেছিল রাফিয়ান, মাঝপথেই যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল, ফিরে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল জর্জের দিকে। এই একটা ব্যাপার বুঝতে পারে না সে, আর কোন কিছুতেই মানা করে না, শুধু খরগোশ তাড়া করলে এত রেগে যায় কেন তার মনিব? বিষণ্ণ ভঙ্গিতে ফিরে এল রাফিয়ান, ছেলেদের পাশে পাশে সুবোধ বালকের মত হেঁটে চলল, খরগোশগুলোর দিকে নজর, রসগোল্লার থালার দিকে যে চোখে তাকায় পেটুক ছেলে চোখে সেই দৃষ্টি।

'মনে হচ্ছে হাত থেকেই খাবার নিয়ে খাবে?' খরগোশ দেখিয়ে বলল কিশোর।

মাথা নাড়ল জর্জ। 'না, চেষ্টা করেছি, আসে না। ওটুকু ভয় রয়েই গেছে। ...আরে, ওই বাচ্চাটা দেখেছ! কি সুন্দর, না?'

'হুফ!' স্বীকার করল রাফিয়ান, মনিবের আঙুল তোলা দেখে ভাবল ছাড়পত্র পেয়ে গেছে, কিন্তু লাফ দিয়ে বাচ্চাটার দিকে এগোতে গিয়েই থেমে গেল। আবার

ধমকে উঠেছে মনিব, 'এই শয়তান, কান ছিঁড়ে দেব কিন্তু!'
দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে আবার ফিরে এল রাফিয়ান।
'এসে গেছি!' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর।
'হ্যাঁ, ওই যে সিংহ-দরজা,' হাত তুলে দেখাল জর্জ। 'ওখান দিয়েই দুর্গে ঢুকতে হবে।'
বিশাল দরজা ছিল এক কালে, মস্ত বড় দুই থাম, ওপরে ধনুকের মত বাঁকানো খিলানের অর্ধেকটা অবশিষ্ট রয়েছে এখন, ঝুলে আছে বেকায়দা ভঙ্গিতে, ওটাও খসে পড়তে পারে যে কোন সময়। ওপাশ থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাথরে ভাঙা সিঁড়ি, দুর্গের ঠিক গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে।
'দুর্গ ঘিরে উঁচু দেয়াল ছিল এক সময়,' বলল জর্জ, 'এখন জায়গায় জায়গায় পড়ে গেছে। টাওয়ার ছিল দুটো, দেখতেই পাচ্ছ, একটা পড়ে গেছে।'
দেখতে পাচ্ছে ছেলেরা। আরেকটা টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে এখনও, তাতে কাকের বাসা। যেখানেই ফোকর পেয়েছে, বাসা বেঁধেছে। খড়কুটো ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না এখন টাওয়ারের।
সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। টাওয়ারের কাছাকাছি আসতেই ভড়কে গেল একজোড়া কাক, একেবারে কাছেই ওদের বাসা, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কা-কা চিৎকার করে মাথার ওপরে চক্কর দিতে লাগল পাখি দুটো। এই বেয়াদবিতে ভয়ানক রেগে গেল রাফিয়ান, হাউ-হাউ করে চেঁচিয়ে উঠল সে, লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করল কাক দুটোকে, বৃথা চেষ্টা।
'ওই যে, দুর্গের কেন্দ্র,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল জর্জ। ভাঙা একটা দরজার ওপাশে পাথরের ছড়ানো চত্বর, জায়গায় জায়গায় ফাটল, সেখানে ঘাস আর শেওলার রাজত্ব। 'দেখে মনে হয়, এক সময় ওখানে মানুষ থাকত।...ওই যে, একটা ঘর এখনও আছে। চলো, ওপাশে যাই।'
দরজাটা পেরোল ওরা, ঘরটায় এসে ঢুকল। আবছা অন্ধকার। পাথরের দেয়াল, পাথরের তাক, পাথরের ছাত, এক কোণে মস্ত এক ফায়ারপ্লেস, তা-ও পাথরের। দেয়ালের অনেক ওপরে বড় বড় দুটো ফোকর, এক কালে জানালা ছিল, ওখান দিয়ে ম্লান আলো আসছে, রহস্যময় এক আলোআঁধারির সৃষ্টি করেছে ঘরের ভেতরে। গা ছমছম করা পরিবেশ।
'যা মনে হচ্ছে এই একটা ঘরই আস্ত আছে,' ঘুরেফিরে দেখছে কিশোর। আরেকটা দরজার কাছে গিয়ে অন্যপাশে উঁকি দিল। 'হুঁম, আরও আছে, কিন্তু আস্ত নেই কোনটাই। দেয়াল নেই, নয়তো ছাত নেই।' ফিরে তাকাল সে জর্জের দিকে। 'ওপরতলা বলে কিছু আছে?'
'নিশ্চয়,' কিশোরের কথার ধরনে মৃদু আহত হলো যেন জর্জ। 'তবে ওখানে আর উঠা যায় না। ওই যে, দেখো, সিঁড়ি। সব আলগা। কাক-টাওয়ারের ওপরেও কয়েকটা তলা আছে...ও, বুঝতে পারছ না, কাকেরা যে টাওয়ারটাতে বাস করে ওটার নাম রেখেছি কাক-টাওয়ার। কিন্তু ওখানেও উঠতে পারবে না, সিঁড়ি সব ভাঙা। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম। পড়ে গিয়েছিলাম। আরেকটু হলেই গিয়েছিল ঘাড়টা মটকে! তারপর আর সাহস করিনি।'

'পাতাল-ঘরটর আছে কিছু?' আচমকা প্রশ্ন করল মুসা। আতঙ্কের দুর্গের সেই ডানজনের কথা মনে পড়ে গেছে তার।

'জানি না,' মাথা নাড়ল জর্জ। 'তবে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। চারদিকে এত ঘাস-লতা-পাতা গজিয়েছে, থাকলেও এখন আর সিঁড়ির মুখ দেখা যায় না।'

সত্যিই, একেবারে জংলা হয়ে গেছে জায়গাটা। এখানে ওখানে ঘন হয়ে জন্মেছে বঁইচির ঝোপ, পাথরের ফাঁকে, কোণায়, যেখানেই জায়গা পেয়েছে, ঠেলে বেরিয়েছে এক ধরনের গুল্ম, মাথায় হলদে রঙের ছোট ছোট ফুল। সবুজ ঘাসের কার্পেট যেখানে-সেখানে, মাঝে মাঝেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলচে-লাল সরু দণ্ডের মত উদ্ভিদ, মাথায় ছোট্ট একটা ক্রসের মত, একেকটা ক্রসের চার মাথায় আবার খুদে খুদে চারটে নীল ফুল।

'না-রে ভাই, এত সুন্দর জায়গা কমই দেখেছি!' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে অভিভূত রবিন।

'দিনের বেলা সুন্দর লাগছে বটে,' খাপছাড়া কণ্ঠে বলে উঠল মুসা, 'কিন্তু রাতে? ভূত-টুত থাকে না তো?'

'তোমার কথাই এমন!' রেগে গেল জর্জ। 'খালি বাজে কথা!'

'বাজে কথা বললাম? তোমাদের মত কল্পনার জগতে থাকি না আমি সারাক্ষণ, আমি হলাম বাস্তববাদী...'

মাথার ওপর কর্কশ চিৎকার শুনে চমকে থেমে গেল মুসা। আকাশের দিকে তাকাল।

টাওয়ারের মাথায় অনেকটা 'হাঁটুভাঙা-দ'-এর মত হয়ে বসে ছিল এক ঝাঁক বড় পাখি, চকচকে কালো পালক, কি জানি কেন এক সঙ্গে উড়াল দিয়েছে, চেচাঁচ্ছে সমানে। ভয় পেয়েছে নাকি কোন কারণে?

'করমোরেন্ট,' বলল জর্জ। 'খিদে পেলেই সাগরে নামে, মাছ ধরে খায়, তারপর হজম করার জন্যে এসে বসে টাওয়ারের মাথায়।'

'ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে?' কিশোর বলল।

জর্জ জবাব দেয়ার আগেই দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ভেসে এল চাপা গুড়গুড়। ঘাড় কাত করে বলল জর্জ, 'যা বলেছিলাম, ওই দেখো ঝড় আসছে। সে-জন্যেই ভয় পেয়েছে পাখিগুলো। কিন্তুহ্, একটু তাড়াতাড়িই এসে যাচ্ছে না!' শেষ কথাটা বলতে গিয়ে আনমনা হয়ে গেল সে।

ছয়

অবাক হয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেরা। দুর্গের ভেতরটা দেখায় এতই মনোযোগী ছিল, আর কোনদিকে নজরই রাখেনি, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেছে।

আরেকবার মেঘ ডাকল। মনে হলো, আকাশের কোন এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে ভীষণ কণ্ঠে গর্জে উঠেছে হাজার খানেক বাঘ। জবাবে রাফিয়ানও গর্জে উঠল, মেঘের তুলনায় হাস্যকর মনে হলো তার চিৎকার।

'এত তাড়াতাড়িই এসে গেল!' জর্জ চিন্তিত। 'সময়মত আর বাড়ি ফিরতে পারব না। আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ।'

ঠিকই বলেছে সে। ওরা রওনা দেয়ার সময় আকাশের রঙ ছিল গাঢ় নীল, এখন কালচে ধূসর। আকাশের অনেক নিচে যেন ঝুলে রয়েছে ভারি মেঘ। ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘের দল তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে দিকে দিকে, যেন তাড়া খেয়ে। মাথা কুটে একনাগাড়ে বিলাপ করে চলেছে বাতাস। ভয় পেতে শুরু করেছে রবিন।

টুপ করে বড় একটা ফোঁটা পড়ল কিশোরের কানে। 'বৃষ্টি আসছে! চলো, কোথাও ঢুকে পড়ি। ভিজে যাব।'

'আরিব্বাপরে, ঢেউ দেখেছ!' হাত তুলে বলল জর্জ। 'বড় রকমের ঝড় আসছে!'

আকাশ চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, ক্ষণিকের জন্যে নীল আলোয় আলোকিত করে দিয়ে গেল চারদিক।

কী সাগর বদলে কি হয়ে গেছে! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ের সমান একেকটা ঢেউ ভীমবেগে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাথুরে তীরে, কানফাটা গর্জন তুলে ভাঙছে, বালির সৈকত, পাথুরে টিলা সব ভিজিয়ে একাকার করে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার।

'নৌকাটা আরও ওপরে তুলে রাখতে হবে,' জর্জ বলল হঠাৎ।

মুসা আর রবিনকে দুর্গের ঘরে চলে যেতে বলে দ্বীপের অন্য ধারে ছুটে চলে এল কিশোর আর জর্জ, নৌকাটা যেখানে রেখেছে সেখানে। এসে ভালই করেছে, ইতিমধ্যেই নৌকার কাছে চলে এসেছে পানি, ঢেউ আরেকটু বড় হলেই ভাসিয়ে নিয়ে যেত। টেনেহিঁচড়ে নৌকাটাকে টিলার ওপরে তুলে নিয়ে এল ওরা, শক্ত করে শেকড় গেড়েছে এমন একটা ঝোপ দেখে তার গোড়ায় পেঁচিয়ে বাঁধল নৌকার দড়ি।

বৃষ্টি বেড়েছে, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে দু'জনে।

'ওরা নিশ্চয় ঘরে চলে গেছে এতক্ষণে,' কিশোর বলল।

হ্যাঁ, চলে গেছে। ভয় পাচ্ছে দু'জনেই! বাইরে অন্ধকার, ঘরে আরও বেশি, তার ওপর ঠাণ্ডা। ভেজা কাপড় চোপড় নিয়ে কিশোর আর জর্জের অবস্থা কাহিল।

'আগুন জ্বালানো দরকার,' কাঁপতে কাঁপতে বলল কিশোর। 'শুকনো কাঠকুটো কোথায় পাই?'

তবে প্রশ্নের জবাবেই যেন কা-কা করে চেঁচিয়ে ঘরে এসে ঢুকল কয়েকটা কাক, মানুষের সাড়া পেয়ে দ্বিগুণ জোরে কা-কা করে উঠে বেরিয়ে গেল আবার।

'এই তো পেয়েছি, কাঠকুটো!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'কাকের বাসা। দু'তিনটে আনতে পারলেই কাজ চলে যাবে।'

বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে বেরোল সে। ভিজতে ভিজতে চলে এল টাওয়ারের কাছে। হ্যাঁচকা টানে সবচেয়ে নিচের বাসাটা খুলে বের করে দু'হাতে জাপটে ধরে নিয়ে ছুটে চলে এল আবার ঘরে।

'বাহ্, চমৎকার!' খুশি খুশি গলা জর্জের। 'ম্যাচ আর কাগজ দরকার, আছে

কারও কাছে?'

'ম্যাচ আমার কাছেই আছে,' ফায়ারপ্লেসে কুটোগুলো ছড়িয়ে রাখতে রাখতে বলল কিশোর। 'কিন্তু কাগজ…'

'আছে, আছে,' বলে উঠল মুসা। 'স্যাণ্ডউইচের মোড়ক।'

হেসে উঠল সবাই, কিন্তু কথাটা ঠিকই বলেছে মুসা। স্যাণ্ডউইচের মোড়ক খুলে নেয়া হলো, ঘি লেগে আছে, আগুন ধরাতে বরং সুবিধে হলো। কুটোগুলো গোল করে সাজিয়ে তার মাঝখানে কয়েকটা কাগজের টুকরো রাখল কিশোর, ওপরে আরও কিছু পাতলা কুটো ছড়িয়ে, একটা কাগজে আগুন ধরিয়ে তার ওপর ফেলল। প্রথমে ধোঁয়া উঠল কিছুক্ষণ, তারপর জ্বলে উঠল আগুন, সুন্দরভাবে।

পটপট করে কুটোর শুকনো গাঁট ফাটছে আগুনে, অন্ধকার ঘর লালচে আলোয় আলোকিত, দেয়ালে ছায়া নাচছে, কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছে ঘরের পরিবেশ। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালো আকাশ, টাওয়ারের মাথায় যেন নেমে এসেছে ভারি মেঘ– ঠেকে আছে, নড়তে চড়তে পারছে না। শাদা ছেঁড়া মেঘকে ঘোরদৌড় করাচ্ছে বাতাস, ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে উত্তরে। সাগর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গর্জন কানে আসছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বাতাসের তীক্ষ্ণ বাঁশি।

'সাগরের পারে বাস, অথচ সাগরকে এমনভাবে গর্জাতে শুনিনি কখনও!' রবিন বলল। 'ঝড় অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন অবস্থা…,' থেমে গেল সে।

'এ-আর এমন কি?' জর্জ বলল। 'এর চেয়েও ভীষণ ঝড় হয় এদিকে। শীতকালে সবচেয়ে বেশি।'

চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে ওদের, নইলে একে অন্যের কথা শুনতে পাচ্ছে না।

'অযথা বসে থেকে আর কি লাভ!' মুসা প্রস্তাব রাখল। 'এসো, বোঝা কমাই। শেষ করে ফেলি স্যাণ্ডউইচগুলো।'

অন্যেরা হাসল বটে, কিন্তু রাজি হলো।

'ঝড়ের মধ্যে আগুনের ধারে বসে এভাবে খাওয়া!' রবিন বলল। 'এর আগে কতবছর আগে কে খেয়েছিল এখানে, কিভাবে খেয়েছিল, দেখতে ইচ্ছে করছে!'

'এই মিয়া, চুপ করো, আর বলো না!' ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল মুসা, যেন ভূত দেখতে পাবে। 'আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! সত্যি সত্যি যদি ওনারা থেকে থাকেন!'

তার শিহরণ সংক্রামিত হলো অন্যদের মাঝেও।

চুপচাপ খাওয়ায় মন দিল ওরা। মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে লেমোনেড দিয়ে। ভালমতই ধরেছে আগুন, উত্তাপ ছড়াচ্ছে, গরম হয়ে উঠেছে ঘর। আগুনের ধার ঘেঁষে বসল জর্জ আর কিশোর, ভেজা জামাকাপড় শুকিয়ে নিতে চায়।

'আরে বাবা এত কষ্ট করছ কেন?' মাংস চিবাতে চিবাতে বলল মুসা। 'কাপড় খুলে চিপে নাও না। এখানে সবাই আমরা ছেলে, লজ্জার কি আছে?'

'ঠিক বলেছ,' শার্ট খুলতে আরম্ভ করল কিশোর।

কিন্তু জর্জ দ্বিধা করছে। শার্ট খুলল না সে, মুখ ফিরিয়ে নিল আরেক দিকে,

আগুনের আরও ধার ঘেঁষে বসল। সেদিকে চেয়ে হাসল কিশোর। 'জিনা, আর লুকিয়ে রাখতে পারবে না নিজেকে। তাছাড়া তোমার উইগও সরে গেছে, আসল চুল বেরিয়ে পড়েছে। আগুনের আলোয় বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তুমি ঘরের বাইরে বেরোলেই দেখে ফেলবে ওরা।'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। খাওয়া থামিয়ে বোকার মত চেয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। ধীরে ধীরে চোখ ফেরাল ওরা জর্জের দিকে! 'ও…ও জিনা?' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

'কেন, এখনও সন্দেহ আছে?' মিটিমিটি হাসছে কিশোর।

'কিন্তু ওই নাক…দাঁত…' মুসার গলায় খাওয়া আটকে যাওয়ার অবস্থা।

হাত বাড়িয়ে জিনার নাক চেপে ধরল আচমকা কিশোর, দু'আঙুলে টিপে ধরে টেনে খুলে নিয়ে এল আলগা রবারের নাকটা। 'জিনা, সামনের দাঁতদুটো খুলে ফেলো।'

কারও দিকে না চেয়ে আস্তে করে ওপরের পাটির সামনের দুটো আসল দাঁতের ওপর থেকে প্লাস্টিকের দাঁত খুলে আনল জিনা। হঠাৎ মুখ তুলে হাসল সে, ঝকঝকে দাঁত, সুন্দর মিষ্টি হাসি। 'যাই বলো, কিছুদিনের জন্যে তো বোকা বানাতে পেরেছি।'

'উঁহুঁ, আমাকে পারোনি,' মাথা নাড়ল কিশোর। শার্টটা চিপে পানি ঝরিয়ে আবার গায়ে চড়াল। 'আমি দেখেই চিনেছি।…ওভাবে কষ্ট করার দরকার নেই, আমরা ঘুরে বসছি। শার্ট খুলে চিপে নাও। উইগ খুলে চুল মুছে নাও।'

শার্ট খুলে চিপে নিল জিনা। আবার পরে নিয়ে বলল, 'এবার ফিরতে পারো।'

'হুঁ, সেজন্যেই চেনা চেনা মনে হয়েছে!' রবিন বলল। 'হাসি চেনা, শুধু দাঁতের জন্যে…তবে গলার স্বর…'

'আমারও সন্দেহ হয়েছে,' মুসা বলল। 'আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে সব সময়, সবই করে, অথচ পানিতে নামার বেলা…চুল ভিজে যাওয়ার ভয়ে নামোনি, না?'

মাথা ঝোঁকাল জিনা।

'জিনা,' কিশোর বলল, 'গোবেল তোমার মায়ের কুলের নাম, না?'

'হ্যাঁ।'

আবার খাওয়ায় মন দিল ওরা।

আগুন নিভু নিভু হয়ে আসছে।

'আরও কুটো দরকার,' জিনা বলল। 'ঝড় থামতে দেরি আছে। দেখি, যাই, নিয়ে আসি…' বাজ পড়ার ভয়ানক শব্দে চমকে থেমে গেল সে।

এই ঝড় রাফিয়ানেরও পছন্দ হচ্ছে না। জিনার গা ঘেঁষে বসেছে, কান খাড়া, বাজ পড়ার শব্দ হলেই গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাড়গোড় বা দু'এক টুকরো রুটি তার দিকে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে, টুকিয়ে টুকিয়ে খাচ্ছে সে ওগুলো।

চারটে করে বিস্কুট পড়ল একেকজনের ভাগে। জিনা বলল, 'আমার চারটে রাফিকে দিয়ে দাও। ওর খাওয়ার বিস্কুট আনিনি, আমারগুলোই খাক। বেচারার

নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।'

'আরে দূর, তোমার সবগুলো দেবে কেন?' মুসা বাধা দিল। 'সবার ভাগ থেকেই একটা করে দিই, চারটে হয়ে যাবে ওর।'

'তোমরা সবাই খুব ভাল,' জিনা আন্তরিক গলায় বলল, 'সেজন্যেই এই ছুটিতে তোমাদের কথাই প্রথম মনে এল। দিলাম চিঠি লিখে। ভালই কাটছে, না?'

'হুফ!' সবার আগে জবাব দিল রাফিয়ান। চারটে আস্ত বিস্কুট পেয়ে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে, কুকুরে-হাসি। চার কামড়ে চারটে বিস্কুট সাবাড় করে দিল সে, তারপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে চিত হয়ে শুয়ে চার পা তুলে দিল ওপর দিকে। হেসে জিনা তার পেটে আঙুল বুলিয়ে দিল।

খাওয়া শেষ, আগুনও একেবারে কমে গেছে। মুসা আরও গোটা দুয়েক বাসা ভেঙে নিয়ে আসার জন্যে উঠল। কাঁধ চেপে তাকে বসিয়ে দিল কিশোর। 'আমি ভিজেছি, ভিজি আরেকবার। তুমি বসো। তাছাড়া বাইরের অবস্থাও দেখার ইচ্ছে হচ্ছে।' মুসা কিংবা জিনাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

টাওয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল। অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। থেকে থেকেই বাজ পড়ছে, আকাশটাকে চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে যেন বিদ্যুতের নীল শিখা। ঝড়কে ভয় করে না কিশোর পাশা, কিন্তু এই ঝড়টা অস্বস্তি জাগাচ্ছে তার মনে, কেন জানি! ভয়ংকর অবস্থা আকাশ আর সাগরের। বজ্রের গর্জন মিলিয়ে যাওয়ার পর পরই কানে আসছে সাগরের হুংকার। দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, কিন্তু অনুমান করতে পারছে সে, ঢেউয়ের বড় বড় একেকটা পর্বত ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে দ্বীপের গায়ে, প্রচণ্ড শব্দে ভাঙছে, তার ছিটে উঠে আসছে এই এত ওপরে, টাওয়ারের গোড়াতেও। বৃষ্টি না থাকলে ওই ছাঁটের জন্যেও ভিজে যেত কিশোর। 'সাংঘাতিক ব্যাপার-স্যাপার!' বিস্মিত গলায় আপনমনেই বিড়বিড় করল সে।

কি ভেবে ঘুরল কিশোর। ভেজা পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে দিয়ে চলে এল দেয়ালটার কাছে, যেটা এককালে পুরো দুর্গকে ঘিরে রেখেছিল, এখন জায়গায় জায়গায় ভাঙা। তেমনি একটা ভাঙা জায়গার কাছে এসে দাঁড়াল সে। সাগরের দিকে চেয়ে বোবা হয়ে গেল! এ-কি দৃশ্য!

ঢেউ তো না, যেন ধূসর-সবুজ পর্বত একেকটা। ছুটে এসে গিলে ফেলতে চাইছে ছোট্ট দ্বীপটাকে, চূড়ায় শাদা ফেনা, আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে চমকাচ্ছে। এত জোরে বাড়ি মারছে দ্বীপটাকে, কিশোরের ভয় হলো, ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে না দেয়! পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে বাজ পড়ার শব্দে, না ঢেউয়ের গুমরানিতে ঠিক বুঝতে পারল না।

পুরো তিরিশ সেকেণ্ড নির্বাক চেয়ে রইল কিশোর খোলা সাগরের দিকে। ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেল, বুঝতে পারছে, এই সাগরে এর চেয়ে বড় ঢেউ আর উঠবে না, গোবেল দ্বীপকেও ভেঙে নিয়ে যেতে পারবে না। পাশ ফিরে চেয়েই স্থির হয়ে গেল সে। ঢেউয়ের খাঁজে একটা নিয়মিত সময়ে বার বার বেরিয়ে আসছে ডুবো-টিলার চোখা চূড়া, তারই ফাঁকে কালো বড় একটা অবয়ব, ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে মনে হচ্ছে। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে, একবার এপাশে কাত হচ্ছে, একবার ওপাশে, তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভাসছে। কি ওটা!

'জাহাজ হতে পারে না!' নিজেকে বোঝাল কিশোর বিড়বিড় করে। দ্রুত হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি, চোখের সমস্ত ক্ষমতা নিঙড়ে নিয়ে দেখার চেষ্টা করছে ভালমত, কিন্তু বৃষ্টি আর ঢেউয়ের ছাঁটের জন্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না কিছুতেই। 'অথচ জাহাজের মতই লাগছে! নাকি জাহাজই! দ্বীপে ভিড়ার চেষ্টা করছে! তাহলে মরেছে ওটা, কেউ বাঁচাতে পারবে না!'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কিশোর। কালো বস্তুটা আরেকবার ভাসল, তারপর ডুবে গেল আবার। হঠাৎ তার মনে পড়ল আগুনের কথা, নিভে গেল না-তো? ফিরল সে।

আর আধ মিনিট দেরি করলেই নিভে যেত আগুন। ফিরে আসায় কোনমত বাঁচানো গেল।

'অদ্ভুত একটা জিনিস দেখে এসেছিল,' বলল কিশোর। 'জাহাজের মতই লাগল!'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল অন্য তিনজন।

'জাহাজের ভূত! ঝড়ের মাঝে বেরোয়!' গলা কেঁপে উঠল মুসার।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা। 'চল তো, দেখি!' আগুনে আরও কয়েকটা কুটো ফেলে কিশোরের হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরোল সে। রবিন আর মুসা চলল ওদের পেছনে।

বাতাসের গতি কমছে, কিন্তু বৃষ্টি বেড়েছে, ঝড় সরে যাচ্ছে বোধহয়। বাজ পড়ছে এখনও, তবে অনেক দূরে, সরে যাচ্ছে আরও, বিদ্যুতের ঝলকও কমছে। ভাঙা দেয়ালটার কাছে সঙ্গীদেরকে নিয়ে এল কিশোর।

ধূসর-সবুজ ঢেউ দেখল ওরা, ঢেউয়ের মাথায় ফেনা দেখল, দ্বীপ ঘিরে পানির তা-থৈ নাচ দেখল। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে মুসা আর রবিন, কিশোরের বাহু খামচে ধরে রেখেছে জিনা।

'ওই যে, ওদিকে,' হাত তুলল কিশোর। 'চোখা পাথরের মাঝে। দেখেছ?'

প্রথমে কিছু দেখল না, তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জাহাজ! জাহাজই! বড়…অনেক বড়, সেইলিং বোট কিংবা জেলেদের বোট নয়।'

'ওই যে, বললাম, ভূতুড়ে!' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।

তার কথায় কান দিল না কেউ, অবাক হয়ে চেয়ে আছে জাহাজটার দিকে। পুরোপুরি ভেসে উঠেছে এখন, কালো বিশাল দেহ, দুলছে ঢেউয়ে। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কিনারে নিয়ে আসছে ঢেউ, খুব ধীরে ধীরে।

'মরবে!' কিশোর বলল। 'যা চোখা পাথর! তলায় খোঁচা লাগলেই খতম!'

তার কথা শেষও হলো না, কাঠ ভাঙার তীক্ষ্ণ মড়মড় শব্দ উঠল, দুলে উঠে একপাশে অনেকখানি কাত হয়ে গেল জাহাজ। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভয়াল ডুবোটিলার চূড়ায় বাড়ি লেগেছে। কাত হয়েই রইল জাহাজটা, তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল মস্ত একটা ঢেউ। ঢেউ সরে যাওয়ার পরও একই জায়গায় একই ভাবে থেকে গেল জাহাজটা।

'গেছে আটকে!' কিশোর বলল। 'আর নড়তে পারবে না। ঝড় থামলেই পানি নেমে যাবে, ওখানে ওভাবেই আটকে থাকবে জাহাজটা।'

বৃষ্টি ধরে এসেছে, তবে একেবারে থামেনি। এরই মাঝে মেঘের ফাঁকে রোদ দেখা দিল, চকিতের জন্যে। বোঝা গেল, শিগগিরই সূর্য বেরিয়ে আসবে।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এ-আবার কি? এখনই ঝড়, এখনই রোদ!'

'গরমকালে এদিকের ঝড় এমনই,' জিনা বলল, 'এই আছে, এই নেই।'

মেঘ পাতলা হয়ে এল, ঝড়ো বাতাস মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গায় এল ফুরফুরে হাওয়া। মেঘের ফাঁকে হেসে উঠল সূর্য, উষ্ণ কোমল রোদ যেন স্বাগত জানাল ওদের। ঢেউ কমে গেছে, পানি নেমে গেছে অনেক, টিলার মাথায় আটকা পড়া জাহাজটা এখন স্পষ্ট।

'অদ্ভুত!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর! 'অদ্ভুত দেখাচ্ছে! জাহাজের এমন চেহারা...'

'বুঝেছি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জিনা। তার ধূসর চোখে আলো। উত্তেজনায় কথা আটকে যাচ্ছে।

'কী!' জিনার কাঁধ খামচে ধরল কিশোর।

'কিশোর...ওটা, ওটা আমার জাহাজ!' খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল জিনা। 'আমার ডুবো-জাহাজ! ঝড়...ঝড় সাগরের তলা থেকে তুলে দিয়েছে! আমার জাহাজ!'

পলকে বুঝে গেল অন্যেরা, জাহাজটার এই চেহারা কেন। আধুনিক জাহাজ নয়, পুরানো কাঠের জাহাজ, পাল নেই, মাস্তুল ভাঙা। জাহাজ নয়, জাহাজের ধ্বংসাবশেষ!

'ভালই হলো,' জিনার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে আনল কিশোর। 'ভালমত খুঁজে দেখতে পারব এবার। হয়তো...কে জানে, হয়তো সোনার বারগুলো পেয়েও যেতে পারি! কি বলো, জিনা?'

সাত

এরপর মিনিটখানেক নির্বাক হয়ে জাহাজটার দিকে চেয়ে রইল ওরা। কালো পুরানো ভেজা ধ্বংসাবশেষের ভেতরে অসংখ্য সোনার বার!– ভাবতেই কেমন জানি লাগছে!

জিনার হাত ধরল কিশোর। 'কি বলো, জিনা?'

তবুও জবাব দিল না জিনা, বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে জাহাজটার দিকে। হঠাৎ করেই ফিরল কিশোরের দিকে। 'জাহাজটা তখন কার ছিল জানি না, হয়তো কোন রানী বা রাজার, কিন্তু এখন আমার! সাগরের তলায় ডুবে ছিল, ভেসে উঠেছে। কিশোর, ওটার ক্যাপ্টেন ছিল আমাদের নানার-নানার-বাবা। জিনিসটা তো এখন আমারই সম্পত্তি, নাকি? কেউ ছিনিয়ে নিতে আসবে না তো আবার?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না কিশোর। মুসা বলল, 'তা আসতেও পারে! তবে আমরা ওটার কথা কাউকে না বললেই হলো।'

'বোকার মত কথা বলো না!' জাহাজের মালিকানা হারানোর ভয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে জিনার। 'জেলেরা আসে, কারও না কারও চোখে পড়ে যাবেই।

এত বড় একটা জাহাজ···দেখতে না দেখতে রটে যাবে খবর!'

'তাহলে কেউ দেখার আগেই চলো ভেতরে খুঁজে দেখি,' মুসা প্রস্তাব দিল। 'ঢেউ আরেকটু কমলেই যাব।'

'ঢেউ তেমন কমতে অনেক দেরি,' জিনা বলল। 'নৌকা নিয়ে যেতে হবে। এখন যা আছে ঢেউ, তার অর্ধেক থাকলেও আছড়ে গুঁড়ো করে দেবে ডিঙি। আজ সম্ভব না।'

'কাল সকালে?' জিনার দিকে তাকাল কিশোর। 'অন্য কেউ এদিকে আসার আগেই যদি চলে আসি আমরা? ভেতরে কিছু না কিছু পেয়ে যেতে পারি।'

'পাবে না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'বললাম না, ডুবুরিরা কিছু বাকি রাখেনি···'

'যত যেভাবেই দেখুক,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'পানির তলায় অত খুঁটিয়ে দেখা যায় না। ওপরে অনেক ভাল করে দেখতে পারব। তাহলে কাল সকালেই, কি বলো?'

'হ্যাঁ, তা আসা যায়,' জাহাজটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না যেন জিনা। 'স্বপ্নের মত লাগছে! আমি···আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এত কাল পর ওটা উঠে এল পানির তলা থেকে!'

মেঘ কাটেনি পুরোপুরি, তার ভেতর দিয়েই সূর্য উঠেছে, রোদ বেশ কড়া। ভেজা কাপড় থেকে হালকা বাষ্প উঠতে শুরু করেছে, এমনকি রাফিয়ানের ভেজা রোম থেকেও বাষ্প উঠছে রোদের আঁচে। সে-ও তাকিয়ে আছে জাহাজের দিকে, থেকে থেকে চাপা স্বরে গোঁ গোঁ করছে।

'কি-রে জাহাজ দেখে অমন করছিস কেন?' কুকুরটার মাথায় হাত রাখল জিনা। 'ওটা শত্রু না, লাগতে আসবে না তোর সঙ্গে।'

'হয়তো তিমি-টিমি ভেবেছে,' হেসে বলল রবিন। 'জিনা, কাল সকালে কেন? আজই যাওয়া যায় না?'

'নাহ! আমারও খুবই ইচ্ছে করছে, কিন্তু সম্ভব না। দেখছ, জাহাজটা এখনও পুরোপুরি বসেনি পাথরের ফাঁকে? বড় ঢেউ এলেই দুলে উঠছে। পাথরে বাড়ি খেতে পারে নৌকা, আর যদি কোন অলৌকিক উপায়ে বেঁচে যাইও জাহাজে উঠতে পারব না কিছুতেই। খুবই বিপজ্জনক। খামোকা ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে কাল সকালেই আসব।'

আরও খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে জাহাজটা দেখল ওরা। তারপর ঘুরল। নৌকা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। ওদেরকে দেখেই টাওয়ার থেকে নেমে এল কাকের ঝাঁক, বাসা ভাঙা হয়েছে দেখেছে, মাথার ওপর উড়ে কা-কা করতে লাগল। গর্ত থেকে আবার বেরিয়ে এসেছে খরগোশেরা। কাকের কা-কা'য় কান না দিয়ে খরগোশের গর্ত এড়িয়ে, ঝোপ-ঝাড় ভেঙে, টিলা ডিঙিয়ে আবার নেমে এল ওরা প্রাকৃতিক জেটিতে। মুসা একাই নামিয়ে আনল ডিঙিটা।

'আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা ভাল,' জিনা বলল। 'ঢেউ এখনও বেশি।' আকাশের দিকে তাকাল সে। 'হুঁম্‌ম! আবার বৃষ্টি আসবে। জোয়ারের আগে এসে গেলে মরেছি: তাহলে আজ আর বাড়ি ফিরতে পারব না।'

ভাগ্য ভাল, জোয়ারের আগে এল না বৃষ্টি। ঢেউয়ের প্রতিকূলে পাল্লা করে

দাঁড় বেয়ে চলতে বেশ কষ্টই হচ্ছে ওদের।

খোলা সাগরে বেরিয়ে এল নৌকা। জাহাজটা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, উল্টো দিকে রয়েছে, পাহাড়ের ওপাশে।

'নাহ্, দেখবে না কেউ,' দাঁড় বাইতে বাইতে বলল কিশোর। জিনার দিকে ফিরল। 'রাতে মাছ ধরতে যায় জেলেরা?'

'যায়। তবে আজ যাবে না। আকাশ আবার খারাপ হচ্ছে।'

'এই, দাঁড়টা আমাকে দাও তো,' কিশোরের দিকে হাত বাড়াল মুসা। 'তোমার হাতে থাকলে সারাক্ষণ ওদিকেই চেয়ে থাকবে, বাড়ি ফেরা আর হবে না। এদিকে খিদেয় আমার পেট জ্বলছে।'

'হুফ!' সঙ্গে সঙ্গে একমত হলো রাফিয়ান। মুসার হাঁটু ঘেঁষে এসে লেজ নাড়তে লাগল।

'যাক, এতদিনে মনের মত দোস্ত পেয়েছ একটা,' হেসে টিপ্পনী কাটল রবিন।

তীরে নেমে টেনে ডাঙার অনেক ওপরে নৌকাটা তুলে রাখল ওরা। জিনা বলল, 'তোমরা দাঁড়াও, আমি রাফিকে দিয়ে আসছি এক দৌড়ে!'

বাড়ি ফিরতে দেরিই হয়ে গেল। খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন মিসেস পারকার, দুশ্চিন্তা শুরু করেননি এখনও।

কাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল ওরা। খাবারের বহর দেখে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। প্রথমেই কেকটা টেনে নিল সে। বড়সড় ডিশের প্রায় কানা ছুঁই ছুঁই করছে কেকের প্রান্ত। গাঢ় চকলেট রঙ, ঘি চুপচুপ করছে, চূড়ায় বড় বড় কিসমিস আর বাদাম গা ডুবিয়ে আটকে আছে, ভেতরে মোরব্বার কুচি আর কি কি আছে, অনুমান করতে কষ্ট হলো না তার। ছুরি দিয়ে বড় এক টুকরো কেটে নিয়ে কামড় বসাল। আরি, কি স্বাদ! কেক তৈরিতে মেরিচাচীকেও ছাড়িয়ে গেছেন জিনার মা।

'দিনটা কেমন কাটল?' হেসে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস পারকার।

'খুব ভাল, খুব ভাল,' মুখে কেক ভরতি, কথা স্পষ্ট হচ্ছে না মুসার। 'দারুণ একখান ঝড় বইল। ধাক্কা দিয়ে সাগরের তল থেকে জা...'

এক সঙ্গে লাথি চালাল কিশোর আর রবিন। নাগালের মধ্যে থাকলে জিনাও লাথি মারতো। 'আঁউক!' করে উঠল মুসা, চোখে পানি এসে গেল।

'কি হলো?' অবাক হলেন মিসেস পারকার। 'গলায় আটকেছে? এত তাড়াতাড়ি কিসের, আস্তে খাও না। নাও, পানি খেয়ে নাও। গেলাস ঠেলে দিলেন মুসার দিকে। 'হ্যাঁ, তারপর কি হলো?'

জিনার কড়া দৃষ্টি থেকে চোখ সরাল মুসা। 'ও হ্যাঁ, সাগরের তল থেকে, জানেন, কি যে বড় বড় ঢেউ...'

'ঢেউ সাগরের তল থেকে ওঠে নাকি? বোকা ছেলে,' হাসলেন মিসেস পারকার। 'জর্জের দ্বীপ দেখেছ?'

'নিশ্চয়। এত সুন্দর না! তবে ঝড়ের জন্যে কিছু দেখতে পারলাম না। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার মতই রা...হাঁউক!' আবার লাথি খেয়েছে পায়ে।

জিনার মা যাতে কিছু বুঝতে না পারেন সেজন্যে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর,

'খরগোশগুলো তো একেবারে পোষা।'

'হ্যাঁ, আর করমোরেন্টও দেখলাম,' রবিন যোগ করল। 'অনেক অনেক করমোরেন্ট।'

'আর জানো, মা,' জিনা বলল, 'কাক এত বেশি হয়েছে না। সারাক্ষণ খালি কা-কা-কা-কা, একেবারে কান ঝালাপালা...'

'তোরাও দেখি কাকের মতই কা-কা শুরু করে দিলি!' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস পারকার। 'নে, জলদি খেয়ে নে। তারপর চুপচাপ যার যার ঘরে চলে যা। উনি ব্যস্ত, জরুরী কাজ করছেন। চেঁচামেচি শুনলে রাগ করবেন। যাই, খাবারটা দিয়ে আসি,' জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই বললেন, 'আরে, আকাশ আবার খারাপ! জোর বৃষ্টি আসবে।'

প্লেটে খাবার নিয়ে স্বামীর কাজের ঘরে চলে গেলেন তিনি।

'গাধা কোথাকার!' চাপা গলায় ধমক দিল কিশোর। 'দিয়েছিলে তো ফাঁস করে? মুখ সামলাতে পারো না?'

'হয়েছে, হয়েছে, আবার বকাবকি করছ কেন?' মুসার মুখ গোমড়া, কিন্তু খাবার চিবানোয় বিরতি নেই। 'লাথি তো যা মারার মেরেছ, চামড়া ছড়ে গেছে পায়ের।' এক কামড়ে একটা সামুসার আধখানারও বেশি মুখে পুরল সে।

হো হো করে হেসে ফেলল অন্য তিনজন। মুসার মুখ ভরা, হাসতে পারছে না, কিন্তু চোখ উজ্জ্বল।

খাওয়া শেষ করে ওপরে চলে এল ওরা। জিনা বলল, 'এবার তো ঘরে বন্দি। দাঁড়াও, লুডু নিয়ে আসছি।'

খেলা শুরু হলো। কিশোর আর জিনা জুটি হয়েছে। প্রতিপক্ষ রবিন আর মুসা। খেলা চলছে, এক সময় প্রশ্ন করল কিশোর, 'আচ্ছা, জিনা, তোমাকে জর্জ বলে ডাকেন কেন তোমার মা-বাবা?'

'ছেলের খুব শখ ওদের,' গুটি চালতে চালতে বলল জিনা। 'আমার একটা ভাই হয়ে মারা গেছে, তার নাম ছিল জর্জ। তার পরে আমি হয়েছি, তাই আমাকে দিয়েই পুত্রসন্তানের আশা পূরণ করে তারা,' শেষ কয়েকটা শব্দ বিশেষ এক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল সে। 'আরে, আরে একি!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমার গুটি খেয়ে ফেলেছ? চুরি করেছ তুমি, স্রেফ চুরি!'

'না, চুরি করিনি!' মুসাও চেঁচাল। 'ছক্কা উঠেছে আমার, ঠিকই খেয়েছি!'

'না, চুরি করেছ!'

'না, করিনি!'

বেধে গেল ঝগড়া। টান দিয়ে লুডু ছিঁড়ে ফেলল জিনা। তাকে থামাতে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার উল্টে ফেলে দিল রবিন। এক ঝটকায় খুলে গেল দরজা, জিনার বাবা, রাগে লাল চোখমুখ। ধমকে উঠলেন, 'এই, হচ্ছে কি!'

মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল সবাই।

'খালি শয়তানি, না? চুপচাপ গল্প করো। আবার যদি গোলমাল শুনি, কাল ঘরে আটকে রাখব, বেরোতেই দেব না, হ্যাঁ। যত্তসব!' গজগজ করতে করতে চলে গেলেন তিনি।

'সরি, মুসা,' লজ্জিত হয়েছে জিনা।

মুসা কিছু বলতে পারল না, শুধু লজ্জিত হাসি হাসল।

বাইরে অঝোর বৃষ্টি। আকাশ কালো। সন্ধ্যা নামতে দেরি আছে, অথচ বৃষ্টির জন্যে এখনই বেশ অন্ধকার। সাগরের দিকে তাকাল কিশোর, দিগন্ত চোখে পড়ছে না, আড়াল করে দিয়েছে বৃষ্টির চাদর। আনমনেই হাত বাড়িয়ে জানালার কাছের গাছ থেকে একটা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে শুরু করল ভেজা পাপড়িগুলো।

খেলা বা গল্প কিছুই আর জমল না। আর কিছু করারও নেই এখন। সকাল সকালই শু'তে গেল ওরা। মুসা আর রবিন শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু কিশোর আর জিনার চোখে ঘুম নেই। দুজনের মনে একই ভাবনা। বৃষ্টি থামবে তো সকালের আগে? জাহাজে উঠতে পারবে? আচ্ছা, সত্যিই কি পাবে ওরা সোনার বারগুলো? সে-রাতে স্বপ্ন দেখল কিশোর, জলদস্যুদের সর্দার হয়েছে সে, পালতোলা কাঠের জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে খোলা সাগরে, দিগ্বিজয়ে। জিনা দেখল দুঃস্বপ্ন, ভোরের দিকে···

আট

'কিশোওর! কিশোওর! বাঁচাও! বাঁচাও! আমার দম আটকে আসছে···'

জিনার চিৎকারে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল রবিন। পাশের বিছানায় ছটফট করছে জিনা। উঠে গিয়ে ঠেলা দিল, 'এই জিনা, কি হয়েছে। ওঠো। দুঃস্বপ্ন দেখেছ?'

চোখ মেলল জিনা। 'আমি পাতাল ঘরে বন্দি···সোনার বার···ওহ্,' মুখে হাসি ফুটল সহসা। 'স্বপ্ন দেখছিলাম!' উঠে বসল সে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল ওরা, কখন বৃষ্টি থেমে গেছে। দিগন্তে পানির তলা থেকে যেন পিছলে বেরিয়ে আসছে বিশাল সূর্যটা, সাগরের পানি তো নয়, টলটলে তরল সোনা, আকাশে শাদা মেঘ রক্তাক্ত, তাতে সোনালি ছোপ। গোলাপবনে টুইই, টুইই করে ডাকছে কি একটা নাম-না-জানা ছোট্ট পাখি। অপূর্ব সুন্দর এক সকাল!

কিশোরও উঠেছে। মুসাকে ঠেলা দিল, 'এই, এই মুসা ওঠো। সকাল হয়েছে।'

চোখ মেলল মুসা, কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল। কেমন এক ধরনের সুখের অনুভূতি তাদের মনে। আবহাওয়া পরিষ্কার, অভিযানে বেরোবে খানিক পরেই। বিছানা ঝাড়ল মুসা। রবিন আর জিনাকে ডাকতে চলল কিশোর, কিন্তু বারান্দায় বেরিয়েই দেখল, ওরা দু'জন তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে।

কিশোরকে দেখেই ঠোঁটে আঙুল রাখল জিনা, 'জোরে কথা বলো না! মা-বাবা নিশ্চয় এখনও ওঠেনি। দেখা হলেই হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তার চেয়ে চলো না জানিয়েই বেরিয়ে পড়ি। ফিরে এসে খাব।'

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ওরা বাড়ি থেকে।

রোদ বাড়ছে, সূর্যটা এখনও দিগন্তেই রয়েছে, পানির সামান্য ওপরে। আকাশ এত পরিষ্কার, মনে হয় যেন এই মাত্র ধুয়ে এনে ছড়ানো হয়েছে। উজ্জ্বল নীল আকাশের পুবে শাদা মেঘের গায়ে গোলাপী রঙ লেগেছে, সাগর যেন একটা চকচকে আয়না। আবহাওয়া দেখে মনেই হয় না, গতকাল কি ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে!

সৈকতে তিন গোয়েন্দাকে দাঁড়াতে বলে ফগের বাড়ি চলে গেল জিনা। খানিক পরেই নৌকা বেয়ে নিয়ে ফিরে এল।

দ্বীপে রওনা হলো ওরা। দাঁড় বাইতে পরিশ্রম লাগছেই না প্রায়, সাগর একেবারে শান্ত। দ্বীপের ধার দিয়ে ঘুরে অন্যপাশে নৌকা নিয়ে এল জিনা।

চোখা পাথরে কাত হয়ে আটকে রয়েছে জাহাজটা, পাথরের মতই অনড়। হালকা ঢেউয়ে তলা দিয়ে পানি আসছে-যাচ্ছে, কিন্তু জাহাজকে নড়াতে পারছে না, তারমানে ভালমতই আটকেছে। পানির তলায়ই ভাঙা ছিল অবশিষ্ট একটি মাত্র মাস্তুল, গতকালকের ঝড়ে সেটা ভেঙে আরও খাটো হয়েছে।

'ইস্‌স্‌, কি অবস্থা হয়েছে!' আফসোস করল জিনা। 'আরও ভেঙেছে! এটুক যে রয়েছে, সেটাই আশ্চর্য! যা একেকখান বাড়ি খাচ্ছিল!'

'কিন্তু ওটার কাছে যাবে কি করে?' মুসা বলল। জাহাজের চারপাশে চোখা পাথরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'দেখই না, কি করে যাই,' জিনা হাসল। তার কথা বিশ্বাস করল তিনজনেই। গোবেল দ্বীপ আর তার চারপাশের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা হাতের উল্টোপিঠের মতই পরিচিত জিনার কাছে। দাঁড় বাওয়ার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে, কতখানি আত্মবিশ্বাস রয়েছে ওর।

কাছে চলে এল ডিঙি। বিশাল জাহাজ, দূর থেকে দেখে বোঝা যায়নি এত বড়, পানির তলায় ডুব দিয়ে তো নয়ই। জাহাজের শরীর কামড়ে ধরে রেখেছে নানা রকমের ছোট বড় শামুক। এখানে ওখানে ঝুলে রয়েছে শেওলা, বাদামী-সবুজ, আধশুকনো। ভেজা ভেজা কেমন একটা আঁশটে গন্ধ ছড়াচ্ছে। জাহাজের খোলে ইয়া বড় বড় কালো ফোকর, পাথরের খোঁচায় হয়েছে। অনেক পুরানো একটা লাশ যেন, দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়।

যে ক'টা পাথরে জাহাজ আটকে রয়েছে, তার একটার গা ঘেঁষে নৌকা রাখল জিনা। জোয়ার আসছে, ঢেউ ছলাতছল বাড়ি খাচ্ছে পাথরের গায়ে, পানির ছিটে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের জামা।

'নৌকা বাঁধি কোথায়!' এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জিনা।

'জাহাজের সঙ্গেই,' কিশোর বলল। 'দড়িটা কোথায়?' পাটাতনের নিচ থেকে খুঁজে দড়ি বের করে নিল সে। এক মাথা নৌকার গলুইয়ের আঙটার সঙ্গে বেঁধে আরেক মাথায় একটা ফাঁস তৈরি করল। জাহাজের ডেকের ভাঙা রেলিঙের একটা খুঁটি সই করে ছুঁড়ে দিল ফাঁসটা, আটকাল না। তিন বারের বার কাজ হয়ে গেল। টেনে ফাঁসটা খুঁটিতে এঁটে নিল সে। দুটো কাজ হলো এতে। নৌকাও বাঁধা হলো, জাহাজে ওঠারও ব্যবস্থা হলো।

দড়ি বেয়ে বানরের মত সবার আগে ডেকে উঠে গেল জিনা। কিশোর আর

মুসা উঠল তার পর। সবার শেষে রবিন। রেলিঙের কাছাকাছি এসে হাঁপ ধরে গেল তার, ওপর থেকে হাত ধরে টেনে তুলে নিল তাকে মুসা।

'এই সেই ডেক, না?' বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ডেকে চোখ বোলাচ্ছে জিনা। 'এখানেই ঘুরে বেড়াত এক সময় জ্যান্ত মানুষ, আমার নানার-নানার-বাবা!' বড় একটা গর্তের দিকে আঙুল তুলল সে। ওই যে, সিঁড়ি বোধহয় ওখানেই।'

গর্তটার কাছে এসে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। সিঁড়িই। মরচে ধরা লোহার একটা মই জায়গামতই আটকে আছে এখনও।

'ভার সইবে তো?' দেখতে দেখতে বলল জিনা। 'ইস্, কি অন্ধকার!'

প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে আনতে সাধারণত ভুল করে না কিশোর পাশা, কোমরের বেল্ট থেকে টর্চ খুলে হাতে নিয়ে মই বেয়ে নামতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল অন্য তিনজন সাবধানে, যদি ভেঙে পড়ে! না, ভাঙল না মই, নিরাপদেই নামল ওরা।

বিরাট খোল, বেজায় অন্ধকার, টর্চের আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছে। ভারি ওক কাঠে তৈরি নিচু ছাত, রবিনেরই মাথা নুইয়ে রাখতে হচ্ছে, মুসার তো আরও অসুবিধে। এখানে কেবিন ছিল নাকি? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেয়াল-টেয়াল্ল কিচ্ছু নেই এখন, ভেঙেচুরে সব একাকার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভাঙা কাঠ। নানারকম জিনিস ছিল, সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে, শামুক আর শেওলার রাজত্ব। তীব্র আঁশটে গন্ধ, শামুক আর শেওলা পচতে শুরু করলে গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠবে, বোঝাই যাচ্ছে।

হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে, ভীষণ পিচ্ছিল। দড়াম করে এক আছাড় খেল মুসা, এরপর পা বাড়াতেই ভয় হলো তার। এক মাথায় পাটাতনে বড় আরেকটা গর্ত দেখা গেল। আগে এখানে কেবিন ছিল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেবিনের মেঝেতেই গর্তটা।

'ওর নিচেই বোধহয় সোনার বাক্সগুলো রাখা হয়েছিল,' গর্তে আলো ফেলে বলল কিশোর। হয়তো ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। নোনা পানি আছে এখন, আর জ্যান্ত মাছ। ইচ্ছে করলে নামা যায় ওখানে কিন্তু লাভ কি? উপুড় হয়ে শুয়ে গর্তের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে, আলো ফেলে দেখল। না, বাক্স চোখে পড়ছে না। বড় একটা ভাঙা পিপে ভাসছে পানিতে, ভেতরে কিচ্ছু নেই।

কিশোরের পাশে শুয়ে ভেতরে উঁকি দিল জিনা। 'হুঁ, পানির পিপে। মদেরও হতে পারে। কিংবা মাংস, কিংবা বিস্কুট, কিন্তু সোনা নয়। আরে, পানির তলায় ওসব কি? ও, বাংক। সাধারণ নাবিকরা থাকত ওখানে।'

কোণের দিকে এক জায়গায় অনেকগুলো হুক দেখা গেল দেয়ালে, তাতে শেওলা ঝুলে রয়েছে। রান্নাঘর ছিল। বাবুর্চির কড়াই আর কাপ, প্যান ঝুলিয়ে রাখা হতো ওগুলোতে।

পুরো জাহাজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল ওরা। ক্ষীণ একটা আশা রয়েছে মনে, যদি বাক্সগুলো মিলে যায়! কিন্তু পাওয়া গেল না, একটা বাক্সও না, বার রাখার বাক্স তো দূরের কথা, কোন রকমের কোন বাক্সই দেখতে পেল না।

এক পাশে একটা দেয়ালের কিছু তক্তা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, দরজাটা

কোথায় ছিল বোঝা যায়। বড় একটা কেবিনে এসে ঢুকল ওরা। অন্য তিন পাশের দেয়াল মোটামুটি ঠিকই রয়েছে। এক কোণে একটা বড় বাংক, তাতে নারকেলের সমান বড় এক কাঁকড়া শুয়ে আছে। সাড়া পেয়ে লম্বা একটা দাড়া বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে, খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সিদ্ধান্ত নিল, শুয়ে থাকবে আগের মতই। আরেক কোণে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা গোল টেবিল, দুটো পায়া নেই। কাঠের বুক শেলফ আছে, তাতে বই নেই, তার জায়গায় রয়েছে রাশি রাশি শামুক আর ঝিনুক, কুৎসিতভাবে ঝুলে রয়েছে শেওলা। দেয়ালেও শামুক আর শেওলার ছড়াছড়ি।

'ক্যাপ্টেনের কেবিন,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'কোণায় ওটা কি?'

এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল রবিন। 'কাপ। আধখানা পিরিচও পড়ে আছে। জাহাজটা যখন ডুবেছিল, চা বা কফি খাচ্ছিলেন বোধহয় ক্যাপ্টেন!'

এমনিতেই অস্বস্তি বোধ করছে ওরা, এই প্রাপ্তি মন আরও খারাপ করে দিল। বাতাসে আঁশটে গন্ধ স্থির হয়ে আছে যেন, পায়ের তলায় কাঠের মেঝে ভেজা, পিচ্ছিল। জিনা ভাবছে, পানির তলায়ই ভাল ছিল, কেন ভাসতে গেল জাহাজটা? গলিত লাশ কবরে মাটি চাপা থাকাই ভাল!

'চলো যাই,' গলা কাঁপছে জিনার। 'আমার ভাল্লাগছে না! গা গুলাচ্ছে!'

যাওয়ার জন্যে ঘুরল অন্য তিনজন, শেষবারের মত আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবিনটা দেখে নিচ্ছে কিশোর। রওনা হতে যাবে, ঠিক এই সময় চোখে পড়ল জিনিসটা। আলো ওটার ওপর স্থির রেখে সঙ্গীদেরকে ডাকল, 'দাঁড়াও! এক মিনিট!'

ঘুরে তাকাল অন্যরাও। ছোট একটা দেয়াল-আলমারির দরজা! তালার ফুটোটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিশোরের।

'নিশ্চয় কিছু আছে ওর ভেতরে!' উত্তেজিত শোনাল তার কণ্ঠ, হাতের টর্চের আলো কাঁপছে অল্প অল্প। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে। দরজার ধারে আঙুল বাধিয়ে টান দিল। খুলল না। তালা আটকানো।

গালে আঙুল রেখে এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। টর্চটা মুসার হাতে দিয়ে কোমর থেকে খুলে নিল তার প্রিয় আট ফলার ছোট ছুরিটা। একেকটা ফলা একেকটা অতি দরকারী যন্ত্র। তালা খোলার চেষ্টা করল সে, পারল না। মরচে পড়ে আটকে গেছে। তালার পাশে খোঁচা দিয়ে দেখল, ভিজে নরম হয়ে গেছে, সামান্য খোঁচাতেই কাঠের চলটা উঠে যায়, পচে গেছে একেবারে। শেষে তালার চারপাশের কাঠ ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেটে ফেলল সে। স্ক্রু-ড্রাইভারটা তালার ৷র্তে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই কুট করে লক-পিন ভেঙে রেখে খুলে চলে এল তালা।

দুই তাকের ছোট্ট আলমারি, ভেতরে কয়েকটা জিনিস। একটা কাঠের বাক্স, পানিতে পচে ফুলে রয়েছে। গোটা তিনেক বই, ফুলে তিন গুণ হয়ে রয়েছে। একটা মদের গেলাস, ভেঙে তিন টুকরো, আরও কয়েকটা জিনিস রয়েছে– কি ছিল চেনার উপায় নেই।

'নাহ্, কিছু নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, 'তবে বাক্সটা...' তুলে নিল সে ওটা। 'ভেতরে নিশ্চয় কিছু আছে। খুলে দেখতে হবে।'

বাক্সের ডালায় দুটো ইংরেজি অক্ষর খোদাই করা: আর জি।

'রিচার্ড গোবেল!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'আমার নানার-নানার-বাবা! এটা ওঁর বাক্স! নিশ্চয় মূল্যবান দলিলপত্র রয়েছে ভেতরে! খোল, খোল!'

চেষ্টা করল কিশোর, কিন্তু তালা খুলতে পারল না। 'এখানে হবে না। হাতুড়ি দরকার।'

'চলো, বাড়ি নিয়ে যাই! চলো, চলো!' তর আর সইছে না জিনার।

ডেকে বেরিয়ে এল ওরা। খানিক দূরে খোলা সাগরে জেলে-নৌকার ভিড়, এদিকেই তাকিয়ে আছে জেলেরা, উত্তেজিত ভাব-ভঙ্গি, জাহাজটা দেখে ফেলেছে।

দড়ি বেয়ে নৌকায় নামল চার অভিযাত্রী। আঙটা থেকে দড়ি খুলে দিল কিশোর, পানিতে ঝুলে রইল দড়ির মাথা, খুঁটি থেকে ফাঁস খোলা সম্ভব না নৌকায় বসে, দড়িটা ফেলে রেখেই যেতে হচ্ছে।

জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছে একটা জেলে-নৌকা। মুখের কাছে হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বলল গলুইয়ের কাছে দাঁড়ানো একটা লোক, 'এইই, শুনছ? কিসের আওয়াজ?'

'পুরানো ভাঙা জাহাজ!' চেঁচিয়ে জবাব দিল জিনা। 'ঝড়ে ভেসে এসেছে!'

'আর কিছু বলো না,' হুঁশিয়ার করে দিল কিশোর, 'চুপ!'

কিছু বলল না জিনা। লোকটার দিকে পেছন করে বসে দাঁড় তুলে নিল।

বাড়ি ফিরে দেখল, টেবিলে নাস্তা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মায়ের বকা খাবে ভেবেছিল জিনা, কিন্তু কিছু বললেন না মিসেস গোবেল। কোথায় গিয়েছিল ওরা জানতে চাইলেন শুধু। 'মরনিং ওয়াক' করতে বেরিয়েছিল, জিনা বলতেই চুপ করে গেলেন।

চিকেন সুপ, ডিম ভাজা আর টোস্ট যেন নাকেমুখে গুঁজে দিয়ে শেষ করল ওরা। বাক্সটা লুকিয়ে রেখে এসেছে একটা গোলাপ ঝাড়ের তলায়। খেয়ে গিয়ে কোন এক ফাঁকে বের করে নিয়ে আসবে, উঠে যাবে ওপরতলার চিলেকোঠায়, ওখানে নিয়ে গিয়েই ভাঙবে, আলোচনা করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে।

নয়

তিন গোয়েন্দাকে চিলেকোঠায় পৌঁছে দিয়ে নিচে নেমে গেল জিনা। বাবা কাজের ঘরে, এঁটো ডিশপ্লেট সরাচ্ছেন মা, খানিক পরেই রান্নাঘরে চলে গেলেন। এই ফাঁকে বাক্সটা বের করে নিয়ে এক ছুটে ওপরে চলে এল সে।

আরেকবার তালা খোলার চেষ্টা করল কিশোর, পারল না, মুখ তুলে বলল, 'জিনা, একটা হাতুড়ি আর ছেনি হবে?'

'সবই আছে, বাবার যন্ত্রপাতির বাক্সে,' জিনা বলল। 'দাঁড়াও, দেখি আনতে পারি কিনা।'

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল সে, হাতে হাতুড়ি আর ছেনি। 'চুরি করে এনেছি। বাবা খুব ব্যস্ত, খেয়াল করেনি। পেছন দিয়ে ঢুকে টুক করে খুলে নিয়ে এসেছি,' হাসল সে।

বাক্সটা মেঝেতে রেখে ডালার ওপরে ছেনি বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে কষে এক ঘা লাগাল কিশোর। চলটা উঠে গেল কাঠের, কিন্তু তলায়, মানে বাক্সের ভেতরের দিক শক্ত টিনের পাত দিয়ে মোড়ানো, তাতে বেধে ফিরে এল ছেনির মাথা। আবার ডালার আরেকখানে আক্রমণ চালাল সে, কাঠের চলটা উঠে গেল আরেক জায়গার। ছেনি দিয়ে ডালার অর্ধেকেরও বেশি তুলে ফেলা গেল, কিন্তু ভেতরের লাইনিং কাটেনি। ছেনি বসিয়ে জোরে বাড়ি দিয়ে দিয়ে লাইনিং কাটতে শুরু করল কিশোর, বিকট ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে। তিন ধার কাটা হয়ে গেল; এখন টিনের পাত টেনে ওপরের দিকে বাঁকিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কি আছে না আছে বের করে আনা যাবে। কিন্তু আনা আর হলো না। এক ঝটকায় খুলে গেল চিলেকোঠার দরজা। জিনার বাবা! রাগে মুখচোখ লাল!

কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি, 'এই, কি হচ্ছে! হচ্ছে কি! সারা বাড়ি মাথায় তুলেছ! আওয়াজের চোটে ঘরে থাকতে পারছি না!' বাক্সটার ওপর চোখ পড়ল তাঁর। 'ওটা কি?'

তাড়াতাড়ি বাক্সটা তুলে নিল মুসা।

'কি ওটা?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার পারকার। 'কথা বলছ না কেন?'

'একটা বা-বাক্স…' তোতলাতে শুরু করল মুসা।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি! কিসের বাক্স? দেখি?' হাত বাড়ালেন তিনি।

পিছিয়ে গেল মুসা। 'না, কিছু না, এমনি…'

'কি এমনি! দেখি!' গর্জে উঠলেন মিস্টার পারকার। এগিয়ে এসে মুসার হাত থেকে বাক্স কেড়ে নিয়ে বললেন, 'কি সব আজেবাজে জিনিস এনে খালি ঝামেলা!…শয়তানীর চোটে কাজ করা যায় না! যত্তোসব! কোথায় পেয়েছ এটা?'

'জা-জাহাজে…'

'জাহাজে! কোন জাহাজে?'

'ওই যে…মানে, যেটা ভেসে উঠেছে…'

'মাথায় দোষটোষ নেই তো! কোথায় ভেসে উঠেছে জাহাজ?'

এবার রেগে গেল মুসা। 'দোষ থাকবে কেন? কাল ঝড় হয়েছে, দেখেননি? দ্বীপের কাছে ভেসে উঠেছে একটা ভাঙা জাহাজ, আপনাদের দ্বীপের কাছে। আপনার নানা-শ্বশুর নাকি কোন এক শ্বশুরের দ্বীপ ছিল, সেটার কাছেই তাঁর জাহাজ ডুবেছিল, ভেসে উঠেছে!' রাগের ঠেলায় এক নিঃশ্বাসে সব কথা ফাঁস করে দিল সে।

প্রমাদ গুণল সবাই।

অবাক হয়ে বাক্সটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মিস্টার পারকারই। বিড়বিড় করলেন, 'হুঁ, মূল্যবান কিছু থাকতে পারে ভেতরে! ওই জাহাজে উঠতে কে বলেছে তোমাদেরকে? নাক গলানো হয়ে গেল না?'

'নাক গলানো কোথায়, বাবা?' বন্ধুদের অপমান সইতে না পেরে রেগে উঠল জিনা। 'ওটা আমার দ্বীপ, আমার জাহাজ, আমি নিয়ে গেছি ওদেরকে।' হাত বাড়াল, 'দাও, আমার বাক্স আমাকে দাও। সোনার বার-টার থাকতে পারে ওতে।'

'সোনার বার!' ভুরু কুঁচকে গেছে বিজ্ঞানীর। 'একেবারেই বুদ্ধু! আরে বোকা, এই বাক্সে বার থাকে কি করে! দেখছিস না, ছোট? জাহাজটায় সোনার বার ছিল, গপ্পোটা আমিও শুনেছি। হয়তো ছিল, কিন্তু এখন নেই। অনেক আগেই কেউ না কেউ কোথাও সরিয়ে ফেলেছে, জাহাজে নেই।'

'থাকলে থাকুক, না থাকলে নেই,' চোখে পানি এসে গেছে জিনার, মরিয়া হয়ে বলল, 'আমার বাক্স দিয়ে দাও। ওটা তুমি নিচ্ছ কেন?' কেন জানি তার এখন মনে হচ্ছে, ভেতরে সোনা-দানা না থাকুক, মূল্যবান দলিলপত্র নিশ্চয় রয়েছে, যাতে গুপ্তধনের নকশা আঁকা আছে।

কিন্তু বাক্সটা দিলেন না মিস্টার পারকার, হাতে নিয়ে নেমে চলে গেলেন।

'আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি!' লজ্জিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'সব ফাঁস করে দিয়েছি!'

'যা হবার হয়েছে,' মুসার কাঁধে হাত রাখল কিশোর। 'দুঃখ করে লাভ নেই।'

'বাক্সটা আবার পাই কি করে, ভাবছি!' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'পাই কি করে?' জিনার দিকে তাকাল সে। 'কিভাবে?'

'বাবার ঘরের ওপর চোখ রাখতে হবে,' ভেবে বলল জিনা। 'বেরোলেই চুরি করব। আর কোন উপায় দেখছি না।'

ঠিকই, আর কোন উপায় নেই। কাজেই মিস্টার পারকারের কাজের ঘরের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকল ওরা। সারাক্ষণই কেউ না কেউ চোখ রাখল দরজার দিকে।

কি কারণে বাইরে এলেন জিনার মা, ছেলেদেরকে বাগানে একই জায়গায় ঘুরঘুর করতে দেখে অবাক হলেন। 'আরে, অবাক কাণ্ড! তোরা সব এখানে? মুখ শুকনো কেন এমন? ঝগড়াঝাঁটি করেছিস নাকি?'

'না, খালা,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল মুসা, 'ঝগড়া করব কেন? এই এমনি...'

'হুঁ!' ঠোঁট ওল্টালেন তিনি। 'কি জানি, বাপু! তোদের মতিগতি কিছু বুঝি না।' নিজের কাজে চলে গেলেন তিনি।

'কি ব্যাপার জিনা?' রবিন আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। 'তোমার বাবা কি ঘর থেকে বেরোবেন না? এভাবে ঘরে বসে থাকা...এটা কোন কাজের কাজ হলো?'

'কাজের কাজ করে নাকি বিজ্ঞানীরা?' সাফ বলে দিল জিনা, 'সব অকাজ! এই জন্যেই তো মেজাজ এমন তিরিক্ষি হয়ে থাকে ওদের! ঘরের কোথায় একটা ইঁটের কণা পড়ল, তার শব্দেই চমকে ওঠে বাবা! বাবার জ্বালায় টুঁ শব্দ করার জো আছে? হোস্টেলই আমার ভাল!'

কিশোর তাদের কথায় যোগ দিল না। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল। 'কাজ করছেন।' আর কোন কথা না বলে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বই খুলে বসল।

ঘর থেকে একটিবারের জন্যে বেরোলেন না মিস্টার পারকার। দুপুর হয়ে এল। খাওয়ার জন্যে ডাকতে এলেন জিনার মা।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিয়ে খেয়ে আসতে হলো ছেলেমেয়েদের। ফিরে এসে আবার আগের জায়গায় বই খুলে বসল কিশোর। গাছের ছায়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল অন্য তিনজন।

বিকেল হয়ে এল। হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলল কিশোর। তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। জিনার গায়ে ঠেলা দিল, সে চোখ মেলতেই বলল, 'জিনা, কিসের শব্দ? তোমার বাবার ঘর থেকে আসছে!'

কান পেতে শুনল জিনা। 'আর কিসের? বাবা নাক ডাকাচ্ছে।'

'এইই সুযোগ!' বই রেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'দেখি চেষ্টা করে!'

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর, বড় একটা আর্‌ম্ চেয়ারে আধশোয়া হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন জিনার বাবা, মুখ খোলা, চোখ বন্ধ, ঘুমে অচেতন। মাথা বেকায়দাভাবে কাত হয়ে রয়েছে এক পাশে, ফলে, যতবারই শ্বাস টানছেন, বিকট শব্দ হচ্ছে।

'নাহ্, ঘুমিয়েছে!' ভাবল কিশোর, বাক্সটার দিকে তাকাল, মিস্টার পারকারের ওপাশে টেবিলে রয়েছে। 'নিই ঝুঁকিটা! ধরা পড়লে চড়থাপ্পড়ও দিয়ে বসতে পারে, কিন্তু আর কোন উপায় নেই!'

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। আর্‌ম্ চেয়ারের কাছে এসে থামল এক মুহূর্ত, মিস্টার পারকারের মুখের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরে চলে এলো টেবিলের কাছে। বাক্সটা তুলে নিল কাঁপা কাঁপা হাতে, দুরু-দুরু করছে বুকের ভেতর, গলা শুকিয়ে কাঠ– ঘন ঘন ঢোক গিলতে হচ্ছে, তাড়াহুড়োয় বাক্সের ওপরে রাখা আলগা একটা কাঠের টুকরো পড়ে গেল মেঝেতে। ছোট্ট খুটুস শব্দ, কিন্তু কিশোরের মনে হলো বোম ফাটল। চোখের পলকে এসে লুকিয়ে পড়ল আর্‌ম্ চেয়ারের পেছনে।

'কি হলো!' বিড়বিড় করলেন মিস্টার পারকার, নাক ডাকানোয় ব্যাঘাত ঘটল, কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপরই আবার শুরু হলো নিয়মিত, খোঁওঁওঁওঁ-খোঁত!

আর দেরি করল না কিশোর, বাক্সটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। বাইরে বেরিয়েই দে ছুট। সঙ্গীদের মুখের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, 'সোজা সৈকতে!' ছুটতে শুরু করল সে, দুহাতে ধরে রেখেছে বাক্স।

বিকেলে, সৈকত একেবারে নির্জন নয়, কিন্তু দেখেও দেখল না যেন ছেলেরা। একটা পাথরের ধারে এসে ধপ করে বালিতে বসে পড়ল কিশোর। হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই এসে বসে পড়ল কিশোরকে ঘিরে।

বাক্সটা যেমন নিয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার পারকার, তেমনিই রয়েছে, খোলার চেষ্টাও করেননি। কোমর থেকে ছুরি খুলে তিন দিক কাটা টিনের একপ্রান্তে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে ওপর দিকে তুলে ফেলল কিশোর। সবাই ঝুঁকে এসেছে, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে, খেয়ালই করছে না যেন ওরা, বাক্সের ভেতর কি আছে, কার আগে কে দেখবে, সেই চেষ্টা।

টিনটা বাঁকা করে ফেলল কিশোর। না, ভেতরে সোনাদানা কিচ্ছু নেই। আছে

কালো কাপড়ে মোড়ানো বইয়ের মত কিছু একটা। একটু যেন হতাশই হলো ওরা।

'আরে, একেবারে শুকনো!' ভেতরে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'পুরানো আমলের কাজ, কি নিখুঁত। এত শত বছর পানির তলায় পড়ে ছিল, অথচ এক ফোঁটা পানি ঢোকেনি, খটখটে শুকনো! হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা বের করে আনল সে। কাপড় খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা ডায়েরী! 'হুঁ, তোমার নানার-নানার বাবার হাতের লেখা, পড়া তো যাচ্ছে না। এত গুঁড়ি গুঁড়ি, লেখা তো না, পিঁপড়ের সারি!'

একটা পাতা দু'আঙুলে ধরে পরখ করে দেখল জিনা। তুলট কাগজের মত কাগজ, বয়েসের ভারে হলদে হয়ে এসেছে। ডায়েরীটা নাড়াচাড়া করছে কিশোর, হঠাৎ ভেতর থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ পড়ল বালিতে। প্রায় ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিল সে। মানচিত্র! নকশা! কাগজটা ডায়েরীর পাতার চেয়েও হলুদ। তাড়াহুড়ো করতে গেলে যদি ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে খুলে চলে আসে, এই ভয়ে সতর্ক হয়ে আস্তে আস্তে খুলে বিছাল ওটা বালিতে।

'হুঁ, ম্যাপই মনে হচ্ছে!' আপনমনে বলল সে মাথা দুলিয়ে, 'কিন্তু আজব ম্যাপ! ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!'

জিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাপটার দিকে, রক্ত সরে যাচ্ছে তার মুখ থেকে। ঝট করে মুখ তুলল, চোখে জ্বলজ্বলে আলো। কথা বলার জন্যে মুখ খুলেছে, কিন্তু বলতে পারছে না। তার ভাবভঙ্গিতে অবাক হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।

'কি?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'বোবা হয়ে গেছ? কি ব্যাপার?'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকি দিল জিনা, ঝাঁকুনি খেয়েই যেন গলার সুড়ঙ্গে আটকে থাকা প্রতিবন্ধক ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল কথার স্রোত, 'কিশোর, জানো ওটা কি! জানো! জানো! ওটা ম্যাপ, একটা ম্যাপ! দুর্গের ম্যাপ, গোবেল দুর্গের, যখন ওটা আস্ত ছিল, ধসে পড়েনি! এই যে, এই যে দেখো,' এক জায়গায় আঙুল রাখল, 'ডানজন! পাতাল-ঘর! আর এই যে, ডানজনের কোণায় কি জানি লেখা!'

লেখার ওপরে রাখা জিনার কাঁপা কাঁপা আঙুল সরিয়ে দিল কিশোর। সবারই চোখ এখন লেখাটার ওপর। পুরানো ধাঁচের পেঁচানো হরফে রয়েছে একটিমাত্র অদ্ভুত শব্দ: ইনগটস।

'ইন-গটস!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ইয়াল্লা! এটা আবার কি জীব! কোন দৈত্য-টৈত্য, নাকি ভূতের সর্দার!'

হেসে ফেলল রবিন, কিশোরও।

'এই জন্যেই বলি, বই-টই একটু পড়ো,' বলল রবিন। 'দুনিয়ার কিছুই তো জানো না।'

'হেই মিয়া, মুখ সামলে কথা বলবে!' রেগে উঠল মুসা। 'জানি না মানে? কয় ধরনের খেলা আছে, খেলার সরঞ্জাম আছে, জানো তুমি? জানো, এবার রেসলিঙে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কে হয়েছে? কয় রকমের খাবার আছে দুনিয়ায়, জানো? জানো,

ঠিকমত রাঁধতে জানলে শুঁয়োপোকার গন্ধও জিভে পানি ঝরিয়ে ছাড়ে…'

'হুঁউক! ওয়াক থুহ!' গলা চেপে ধরল জিনা, বমি ঠেকাচ্ছে। 'রাক্ষস কোথাকার!'

বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার কুচকুচে কালো মুখে। 'তো, যা বলছিলাম, রবিন, সবাই সব কিছু জানে না। তুমি যা জানো, সব আমি জানি না, আবার আমি যা জানি, সব তুমি জানো না…'

'আরে দূর, লেকচার রাখো!' বিরক্ত হয়ে হাত তুলল কিশোর। 'ইনগটস মানে হলো ধাতুর বার। তবে এখানে সোনার কথাই বোঝানো হয়েছে, আমি শিওর।'

'খাইছে! অ্যাঁ, সোনা!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'জাহাজ থেকে যেগুলো গায়েব! দুর্গটার তলায় না-তো? ডানজনে…'

মাথা ঝোঁকাল জিনা। 'মনে হচ্ছে তাই! ইস্, যদি খুঁজে বের করতে পারতাম!' বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন ফিসফিস করল, 'ইস্, যদি পারতাম!'

'পাই আর না পাই, খুঁজব।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর। 'খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সামিল হবে কাজটা, তবু চেষ্টা না করে ছাড়ব না। কিন্তু ভাঙা দুর্গ, ঝোপঝাড়, জঙ্গল…যাকগে! আগে থেকে ভেবে লাভ নেই, উপায় একটা নিশ্চয় বেরোবে।'

চিন্তিত চোখে বাক্সটার দিকে তাকাল কিশোর। 'এটা কি করব?' নিজেকে প্রশ্ন করছে সে। 'আবার রেখে দিয়ে আসব? জেগে উঠে না দেখলে নিশ্চয় খুঁজবেন, তার চেয়ে রেখেই দিয়ে আসি!'

'ম্যাপটা রেখে দিই আমরা। শুধু ডায়েরীটা বাক্সে ভরে রেখে দিয়ে এলেই তো হয়?' মুসার প্রস্তাব।

'তার চেয়ে আরেক কাজ করি বরং,' রবিন বলল, 'সবই রেখে আসব। ম্যাপের একটা কপি করে রেখে দেব নিজেদের কাছে।'

'হ্যাঁ, কথাটা মন্দ না,' কিশোর বলল। 'তবে ম্যাপ না ফিরিয়ে দিলেও তো চলে, উনি তো আর দেখেননি ভেতরে কি আছে না আছে।…আচ্ছা, থাক, রেখেই আসব, তার আগে চলো কপিটা করে নিই।'

বাগানে ফিরে এল ওরা। চট করে গিয়ে নিজের ঘর থেকে বল পয়েন্ট আর কাগজ নিয়ে এল জিনা। দেখে দেখে ম্যাপটার নিখুঁত একটা নকল এঁকে ফেলল কিশোর। তারপর ডায়েরীর ভেতরে আবার আসলটা ভরে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিল বাক্সে, হাত দিয়ে চেপে নামিয়ে দিল বাঁকানো টিন, যতটা সম্ভব সমান করে দিল আগের মত, যাতে বোঝা না যায় খোলা হয়েছিল। নকলটা সাবধানে ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বাক্স হাতে উঠে দাঁড়াল। 'রেখে আসি।'

আবার এসে জানালায় উঁকি দিল কিশোর, আরেকটু হলেই জিনার বাবার চোখে চোখ পড়ে যেত, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়ে ফেলল সে। কিন্তু ব্যাপার কি? এখনও হৈ-চৈ শুরু করেননি কেন? বাক্সটা নেই, খেয়ালই করেননি?

করেননি বোঝা গেল চায়ের টেবিলে। ছেলেদের দিকে তাকালেনই না,

চুপচাপ খাচ্ছেন। সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে গিয়ে বাক্সটা আবার জায়গা মত রেখে এল কিশোর, সঙ্গীদের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ছেলেরা।

টেলিফোন বাজল হঠাৎ। উঠে গিয়ে ধরলেন মিসেস পারকার। ওখানে দাঁড়িয়েই ডেকে বললেন, 'জন, তোমার।'

'কে?' চিবাতে চিবাতে বললেন জিনার বাবা।

'খবরের কাগজের লোক। দেখা করতে চায়। জরুরী কথা আছে বলল।'

'এখন হবে না,' হাত নাড়লেন মিস্টার পারকার। 'বলে দাও, ছ'টার সময় আসতে।'

আবার চিন্তিত হয়ে পড়ল ছেলেরা। যা আপনভোলা মানুষ মিস্টার পারকার, বাক্সটা আর ভেতরের জিনিসপত্র দেখিয়ে দেবেন না তো রিপোর্টারদের? দুর্গের পাতাল ঘরে সোনার বার লুকানো রয়েছে, কোনমতে গুজবটা একবার রটে গেলে, সর্বনাশ!

'ইস্, গাধামি হয়ে গেছে!' ভাবল কিশোর। 'ম্যাপটা বাক্সে রাখা মোটেই উচিত হয়নি!'

দশ

পরদিন সকালে স্থানীয় সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হলো খবরটা: কি করে ঝড়ের ধাক্কায় সাগরের তল থেকে উঠে পাথরে আটকে গেছে শত শত বছরের পুরানো জাহাজ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সব কথাই মিস্টার পারকারের পেট থেকে বের করে নিয়েছে ধড়িবাজ সাংবাদিক, নিখোঁজ সোনার বারের গল্পও জেনে গেছে, তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে চলে গেছে গোবেল দ্বীপে, কি ভাবে জানি পথ খুঁজে নিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে কয়েকটা ছবিও তুলে এনেছে ভাঙা দুর্গটার, আর জাহাজের ছবি তো আছেই, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয় সব ছবি তুলে দিয়েছে কাগজে ছেপে।

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করল জিনা। দুপদাপ করে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। 'মা-আ! এসব কি! ওটা আমার দ্বীপ! তুমি কথা দিয়েছিলে, দাওনি!'

'তোর নয় একথা তো বলিনি!' ভুরু কোঁচকালেন মা। 'ওরা দ্বীপে গিয়ে ছবি তুলেছে তো কি হয়েছে? নষ্ট তো আর করে ফেলেনি।'

'কিন্তু গেল কেন? কার কাছে অনুমতি নিয়ে?' আরও রেগে উঠল জিনা! 'ওগুলো আমার! দ্বীপ, দুর্গ, জাহাজ···আমাকে না বলে ওরা যায় কি করে?'

'খামোকা রাগ করছিস,' মেয়েকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন মা। 'তোর বাবা অনুমতি না দিলেই বা কি হত? সাগরের মালিক তো আর আমরা না, বোট নিয়ে গিয়ে জাহাজের ছবি তুলতোই ওরা। দুর্গের ছবিও। মানা করলেও ঠেকানো যেত না।'

এরপর দর্শকদের ঠেকানোর চেষ্টা করল জিনা, পারল না, কেয়ারই করল না কেউ তার কথা, রাগে-দুঃখে চোখে পানি এসে গেল তার। পুরানো একটা জাহাজ পানিতে ভেসে উঠে যে এমন শোরগোল তুলবে, এতটা শোরগোল, কল্পনাও

করতে পারেনি ছেলেরা, তাজ্জব হয়ে লোকের কাণ্ড দেখল ওরা। অনেক দূর থেকেও খবর শুনে জাহাজ দেখতে এল লোকে, দ্বীপ আর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখল। এত দিন চেষ্টা করেনি তাই, এখন দরকারের সময় ছোট্ট লুকানো বন্দরটা ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলল জেলেরা। মাছ ধরা বাদ দিয়ে ট্যুরিস্ট আনা-নেয়া করতে লাগল নৌকায় করে, যার যা খুশি ভাড়া হাঁকছে, কামিয়ে নিচ্ছে দু'পয়সা।

গুমরে মরছে জিনা, তাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল কিশোর। 'শোনো, জিনা, বারগুলোর কথা এখনও জানে না কেউ। উত্তেজনা কমে এলেই দ্বীপে গিয়ে ওগুলো খুঁজে বের করব।'

'আমাদের আগেই যদি অন্য কেউ পেয়ে যায়?' চোখ মুছতে মুছতে বলল জিনা, কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

'কি করে? বাক্সের ভেতরের নকশা এখনও কারও চোখে পড়েনি। দাঁড়াও না, আরেক সুযোগে আবার চুরি করে নিয়ে আসব নকশাটা, আর ফেরত দেব না।'

কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না কিশোর। ইতিমধ্যেই অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন মিস্টার পারকার। পরের দিন ডাইনিং রুমে খাচ্ছিল ছেলেরা, হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন তিনি। ঘোষণা করলেন, এক পাগলা অ্যান্টিক সংগ্রহকারীকে উপহার দিয়ে দিয়েছেন বাক্সটা। না, ভেতরে কি আছে না আছে খুলেও দেখেননি তিনি।

আতংকিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল ছেলেরা। সর্বনাশ হয়ে গেছে! যদি ওই লোকটা নকশার মানে বুঝতে পারে? হয় সে গোপনে বারগুলো খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করবে, কিংবা, বোকা হলে লোকের কাছে বলবে। পরের দিনই খবরের কাগজের পয়লা পাতায় খবর হয়ে বেরোবে কথাটা, ব্যস, তারপর আর কি!

মেজাজ খুব ভাল এই মুহূর্তে জিনার বাবার, আশ্চর্য একটা ব্যাপার! কেন ভাল, কে জানে! লোকটা তোয়াজ করে ফুলিয়ে-টুলিয়ে দিয়ে গেছে হয়তো। তবে এই মেজাজ কতক্ষণ থাকবে, ঠিক নেই, যে কোন মুহূর্তে মেঘের আড়ালে চলে যেতে পারে রোদ, আচমকা ঝড় উঠলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। একবার ভাবল কিশোর, তাঁকে সব কথা খুলে বলে, কিন্তু ভেবে চিন্তে শেষে না বলারই সিদ্ধান্ত নিল। হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন, সেক্ষেত্রে না বলাই ভাল, অযথা হাসির খোরাক হয়ে কি লাভ?

নিজেদের মাঝে আলোচনা করল ছেলেরা। ঘোরালো হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। জিনার মাকে বারগুলোর কথা বলবে কিনা, ভাবল ওরা, তারপর সে চিন্তাও বাতিল করে দিল। তিনিও বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না।

'ওসব বলাবলির দরকার নেই,' অবশেষে বলল কিশোর। 'যা বলছি শোনো। খালাকে গিয়ে ধরব আমরা, গোবেল দ্বীপে পিকনিকে যেতে চাই। দুটো রাত থাকবও ওখানে। যে করেই হোক তাঁকে রাজি করাতে হবে। এতে সময় পাব আমরা। আগামী দু'দিনের আগে কেউ গুপ্তধন খুঁজতে আসবে না আশা করছি, তৈরি হওয়ার একটা ব্যাপার আছে তো।'

কিশোরের প্রস্তাব মেনে নিল সবাই। পরের দিনই সকালে রওনা দেবে, ঠিক করল ওরা। আবহাওয়া এখন পরিষ্কার, সঙ্গে করে প্রচুর খাবার নিয়ে যাবে, অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। জিনার মাকে গিয়ে ধরল ওরা। তখন মিস্টার

পারকারও রয়েছেন ওখানে। মেজাজ ভালই।

'খালা,' কিশোর বলল, 'একটা কথা বলব। রাখবেন?'

'কি-রে?' অবাক হলেন মিসেস পারকার। 'এমন ভাবে বলছিস, যেন রাজ্য আর রাজকন্যা চেয়ে বসবি?'

'না, খালা,' হাসিমুখে বলল কিশোর, 'ওসব চাইতে আসিনি। আমরা গোবেল দ্বীপে যেতে চাই।'

'যেতে চাইলে যাবি, এটা আর এমন কি হলো?'

'দু'এক রাত কাটাতে চাই ওখানে।'

'রাত কাটাবি?'

'কেন, কি হবে খালা? আকাশ পরিষ্কার, চেনা জায়গা, তেমন ভয়ের কিছু নেই তো। আর অবস্থা খারাপ দেখলে তো চলেই আসতে পারব, কয় মিনিট আর লাগে যেতে আসতে।'

'হুঁ, তা বটে। জন, তুমি কি বলো?' স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস পারকার।

'যেতে চাইলে যাক,' বললেন মিস্টার পারকার। 'নইলে আর যাওয়ার সুযোগ পাবে না। পাবে, ইয়ে, মানে, আমি বলছি কি, যেতে পারবে, তবে এখনকার মত নির্জন আর থাকবে না তখন। পিকনিক চলবে না ওখানে। লোকটা খানিক আগে আবার ফোন করেছিল। দ্বীপটা কিনতে চায়, ভাঙা দুর্গ সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে একটা হোটেল করবে নাকি, ভাল আইডিয়া, না?'

হাঁ হয়ে গেছে চার ছেলেমেয়ে, নাকেমুখে কষে থাবড়া মেরেছে যেন তাদেরকে কেউ। দ্বীপ বিক্রি! গোপন ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে? জেনে ফেলেছে লোকটা? বুঝে গেছে, কোথায় লুকানো রয়েছে বারগুলো?

দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন জিনার, চোখে আগুন। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা-আ! তোমরা আমার দ্বীপ বেচতে পারো না! ওটা আমার দ্বীপ, আমার দুর্গ... তোমাদের কোন অধিকার নেই!'

ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার পারকার। 'বোকার মত কথা বলছ, জরজিনা!' শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর, মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে না-তো বিজ্ঞানীর! 'ওটা এখনও তোমার হয়নি, তোমার মায়েরই রয়েছে। তোমার মায়ের থাকা মানেই আমার থাকা।'

'বাবা, টাকা কম আছে তোমার?' কেঁদে ফেলল আবার জিনা। 'যা আছে তারই হিসেব রাখো না! ওই দ্বীপটা বেচলে আর কতই বা আসবে? কি করবে তুমি ওই টাকা দিয়ে? বলো, কি করবে?'

'ইয়ে...ইয়ে...হ্যাঁ, মানে...ও, হ্যাঁ, তোমার জন্যেই বিক্রি করছি। টাকাটা তোমার নামে ব্যাংকে জমা দিয়ে দেব। যখন খুশি টাকা তুলে তোমার যা খুশি কিনতে পারবে। কত ভাল ভাল জিনিস।'

'ভাল জিনিস আমি চাই না!' আবার চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'মা! দোহাই তোমাদের, ওটা বিক্রি করো না! তুমি, তুমি কথা দিয়েছিলে, ওটা আমাকে দেবে। দাওনি?'

'দি-দিয়েছিলাম!' দ্বিধায় পড়ে গেছেন মহিলা। 'কিন্তু…,' স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি, মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে মিস্টার পারকারের মুখে। 'কিন্তু পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে, মা। তোর বাবা নিশ্চয় কথা দিয়ে ফেলেছেন, তাই…'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা দিয়ে ফেলেছি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মিস্টার পারকার।

'আমাকে একবার বলারও দরকার মনে করলে না, বাবা? আমি তোমার সন্তান নই, বলো, জবাব দাও, নই? আমাকে ছেলেমানুষ ভাবো, কিন্তু আমারও তো একটা মন আছে…'

সাংঘাতিক দ্বিধায় পড়ে গেছেন মিস্টার পারকার, ওদিকে ক্রেতাকে কথা দিয়ে ফেলেছেন, এদিকে মেয়ের এই অভিমান, কি করবেন? কিছুই ঠিক করতে না পেরে আচমকা রেগে উঠলেন তিনি, চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোর খারাপ চেয়েছি নাকি আমি? বললাম, সব টাকা দিয়ে দেব, যা খুশি করগে…'

'তোমার টাকা তুমিই রাখোগে, যাও!' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল জিনা। 'একটা পয়সাও আমি ছোঁব না! ছোঁব না!' এক ছুটে বেরিয়ে চলে গেল সে, দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল, বোঝা গেল আওয়াজ শুনেই।

হতভম্ব হয়ে গেলেন মিস্টার পারকার। তিন গোয়েন্দাকে বললেন, 'ওকে গিয়ে বোঝাও তোমরা। তোমাদের বন্ধু, হয়তো শুনবে। আসলে, এখন আর কিছু করতে পারছি না, আমার মান-ইজ্জতের প্রশ্ন! কথা দিয়ে ফেলেছি লোকটাকে!'

'দলিল কবে হচ্ছে, খালু?' শান্তকণ্ঠে জানতে চাইল কিশোর।

'এ-হপ্তার ভেতরেই। কালই চলে যাও, গিয়ে পিকনিক করে এসো। পরে নতুন মালিক আর দ্বীপে উঠতে দেবে কি না দেবে কে জানে!'

'কার কাছে বিক্রি করছেন? বাক্সটা যাকে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' লজ্জিতই মনে হচ্ছে তাঁকে। 'প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! আর ব্যাটা একটা চিনেজোঁক, এমন ভাবে ধরল, বোঝাল, হ্যাঁ বলে ফেললাম!…যা হওয়ার হয়ে গেছে, জরজিকে গিয়ে বলো, ওরকম, না না, ওটার চেয়ে ভাল আরেকটা দ্বীপ ওকে কিনে দেব! যা চায়, তাই দেব, যাও বলোগে!'

'কথা দিচ্ছেন?' রহস্যময় হাসি ফুটেছে কিশোরের মুখে।

'হ্যাঁ, দিচ্ছি!'

'বেশ, আমিও কথা দিচ্ছি, জিনাকে শান্ত করব,' মুসা আর রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। বাইরে বেরিয়েই বলল, 'কিছু বুঝলে, লোকটা দ্বীপ কেন কিনতে চাইছে?'

'ম্যাপের মানে বুঝে ফেলেছে, আরকি?' রবিন বলল।

'হোটেল না কচু!' মুসা বলল। 'শয়তানটা আসল কথা জেনে ফেলেছে, পটিয়ে-পাটিয়ে এখন দ্বীপ বিক্রিতে রাজি করিয়ে ফেলেছে জিনার বাবাকে। হারামখোর!'

বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে জিনা। তার কাছে গিয়ে বসল কিশোর। কোমল গলায় ডাকল, 'জিনা!'

জবাব দিল না জিনা, মুখ তুলল না।

'জিনা, শোনো,' কিশোর বলল আবার, 'এত নিরাশ হয়ো না, যা হয়েছে ভালই হয়েছে!'

'ভাল হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'আমার এত সাধের দ্বীপ ওরা কেড়ে নিচ্ছে, আর তুমি বলছ ভাল হয়েছে?'

'ভালই তো হয়েছে,' হাসল কিশোর। 'কাল যাচ্ছি আমরা গোবেল দ্বীপে। থাকব। যে ভাবেই হোক খুঁজে বের করব সোনার বারগুলো। লোকটা আসার আগেই কাজ সেরে ফেলব আমরা।'

মুখ ফেরাল জিনা। 'কিন্তু আমার দ্বীপ…'

'ওটার জন্যে দুঃখ করো না। তোমার বাবা বলেছেন, তোমাকে আরও ভাল দেখে আরেকটা দ্বীপ কিনে দেবেন। যা চাও, তাই দেবেন। আমি হলে এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়তাম না।'

'কি সুযোগ?' উঠে বসল জিনা, বুঝতে পারছে না।

'চাওয়ার,' মিটিমিটি হাসছে কিশোর। তার ভাবভঙ্গিতে মুসা আর রবিনও অবাক হয়ে গেছে।

'কি চাইব? দ্বীপ ছাড়া আর কি চাইব!'

'আর কিছু নেই?'

'না।'

'সত্যিই নেই? ভাল করে ভেবে দেখো…'

মেঘের কোলে রোদ উঠল, হাসি ফুটল জিনার মুখে। আস্তে মাথা দোলাল, 'হ্যাঁ, আছে!'

এগারো

পরদিন সকাল সকালই রওনা দেবে, ঠিক করল ওরা। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লিস্ট করতে বসল, কি কি সঙ্গে নেয়া দরকার।

'খাবার লাগবে,' প্রথমেই বলল মুসা। 'বেশি করেই নেব, যাতে টান না পড়ে।'

'পানি নিতে হবে,' জিনা বলল। 'খাবার পানি নেই দ্বীপে। কুয়া একটা আছে শুনেছি, তাতে মিষ্টি পানি থাকার কথা, কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি।'

'খাবার,' লিখতে লিখতে বলল কিশোর। 'পানি। আর?' তিনজনের দিকেই তাকাল সে। বিড়বিড় করল, 'খোন্তা,' লিখে ফেলল সেটা।

'কি হবে?' মুসা অবাক।

'মাটি খুঁড়ে ডানজনে নামার দরকার পড়তে পারে,' কিশোর বলল। 'আর কি?'

'দড়ি লেখো,' রবিন বলল।

'আর টর্চ,' জিনা মনে করিয়ে দিল। 'ভয়ানক অন্ধকার পাতালে।'

আতঙ্কের দুর্গের ডানজনের কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠল মুসা। মনে পড়ল, কিভাবে হাত-পা বেঁধে পাতাল ঘরে ফেলে রাখা হয়েছিল ওদেরকে। ও-

রকম একটা ঘরে আরেকবার আটকা পড়তে চায় না সে কিছুতেই।

'কম্বল,' রবিন বলল। 'রাতে ঠাণ্ডা পড়বে, যা বাতাস লাগে দুর্গের ঘরটায়!'

লিখে নিল কিশোর।

'মগ লেখো,' মুসা বলল, 'চা আর পানি খেতে লাগবে। আর কিছু যন্ত্রপাতি, এই প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, এসব। কাজে লেগে যেতে পারে।'

আধ ঘণ্টা পর লম্বা এক ফর্দ হয়ে গেল, যা যা মনে পড়েছে চারজনের, সব লিখে নেয়া হয়েছে। রাগ, ক্ষোভ, হতাশা অনেক কেটে গেছে জিনার। একা থাকলে এত সহজে পারত না, তিন গোয়েন্দা সঙ্গ দেয়াতেই নিজেকে সামলাতে পেরেছে এত তাড়াতাড়ি। 'আর একা থাকব না,' ভাবল জিনা, 'একা একা কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব না। একটা মাথার চেয়ে কয়েক মাথা এক স.. খাটালে অনেক জটিল ব্যাপারও সহজ করে নেয়া যায়। আচ্ছা, এই ছেলে তিনটে এত শান্ত থাকে কি করে? কোন কারণেই হুট করে উত্তেজিত হয়ে যায় না। আমি হই কেন? কেন শান্ত রাখতে পারি না নিজেকে? আমার বদ-মেজাজের জন্যেই বাবা দেখতে পারে না আমাকে, বুঝতে পারছি এখন। মা-টা অতিরিক্ত ভাল, তাই আমার সব অত্যাচার সহ্য করে। নাহ্, আর খারাপ থাকব না, ভাল হয়ে যাব। তিন গোয়েন্দা দারুণ শিক্ষা দিয়েছে আমাকে! বিশেষ করে ওই কিশোর পাশা...'

জিনার দিকে নজর পড়তেই লক্ষ্য করল কিশোর, তামাটে চোখ দুটো তার মুখের ওপর স্থির। হাসল সে। 'কি ব্যাপার?'

লজ্জা পেল জিনা, মুখ লাল হয়ে গেল। 'না, কিছু না!...ভাবছি, তোমরা কত ভাল, কত সহজ! দু'দিনেই আমার বাবা-মাকে আপন করে নিয়েছ, ওদের সন্তান হয়েও এত বছরে আমি যা পারিনি! ইস্, যদি তোমাদের মত হতে পারতাম!'

'দোষটা তোমার না, জিনা,' কিশোর বলল, 'ধনী বাপের একমাত্র মেয়েরা সাধারণত ওরকমই হয়। এর অনেক কারণ।'

'তোমরাও তো তোমাদের বাপের একমাত্র ছেলে?'

'তা বটে, তবে ওরা ধনী নয়, অন্তত তোমার বাবার তুলনায় তো নয়ই। তাছাড়া, আমার বাবা-মা ছোট-বেলায়ই মারা গেছে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে, আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাওয়ার কেউ নেই। চাচা কম আদর করে না, মেরিচাচীও জান দিয়ে দেয় আমার জন্যে, নিজের মা থাকলেও এর বেশি করতে পারত না, তবে চাচীর সব চেয়ে বড় গুণ, শাসনটা ঠিকই আছে। বখে যেতে দেয়নি আমাকে। মুসার মা-ও যথেষ্ট কড়া। আর আমাদের রবিন মিয়া এমনিতেই ভাল...'

'দূর, কি যে বলো! বাবাকে তো রাগতে দেখোনি! ভালর ভাল, কিন্তু শাসনের সময়...'

'হুঁ!' নরম গলায় বলল জিনা। 'দেখো, আর কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না আমি!' উঠল সে। 'চলো, খানিক বেড়িয়ে আসি। রাফিকে দেখে আসি।'

ফগ আর রাফির সঙ্গে সারাটা দিন কাটাল ওরা। দ্বীপে গিয়ে কিভাবে কি করবে, তার নানারকম প্ল্যান করল। ওদের কথা যেন বুঝতে পারে রাফিয়ান, এমনি ভঙ্গিতে মুখ গম্ভীর করে পাশে বসে থাকে আলোচনার সময়, মাঝে মাঝে সমঝদারের মত লেজ নাড়ে, বড় বড় বাদামী চোখ দুটোতে ফুটে ওঠে কেমন

একটা ভাব! জ্বলজ্বল করে। বুদ্ধিমান মানুষের চোখের তারায় যেমন আলো দেখা যায়, তেমনি এক ধরনের আলো ফোটে!

পরদিন সকালে জিনিসপত্র নিয়ে নৌকা-ঘাটে চলে এল ওরা। নৌকা তৈরি রেখেছে ফগ। সবাই উঠে পড়ল। রাফিয়ানও উঠল। মালপত্র তুলে পাটাতনের একধারে রেখে দিল ফগ, তারপর ঠেলে নামিয়ে দিল নৌকাটা পানিতে। দাঁড় তুলে নিল জিনা।

'সব কিছুই আনা হয়েছে, না?' প্যাকেটগুলোর দিকে চেয়ে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জিনা।

'ম্যাপ! ম্যাপটা এনেছ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'এনেছি,' পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর, বের করে আনল ভাঁজ করা কাগজটা দু'আঙুলে ধরে। 'এই যে…'

হঠাৎ এক ঝটকায় তার হাত থেকে কাগজটা উড়িয়ে নিয়ে পানিতে ফেলল জোরাল বাতাস। ঢেউয়ের তালে তালে দুলতে লাগল ওটা। শঙ্কিত হয়ে প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল চারজনে। তাদের মহামূল্যবান নকশা!

ঝপাং করে গলুইয়ের আরেক পাশে দাঁড় ফেলে নৌকা ঘোরাতে শুরু করল জিনা। কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে উঠল রাফিয়ান, কোন রকম দ্বিধা না করে ঝাঁপ দিল পানিতে। অত্যন্ত ভাল সাঁতারু সে। শক্তিশালী মাংসপেশীতে কাঁপন তুলে সাঁতরে গিয়ে কাগজটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল।

মুসা আর কিশোর মিলে রাফিয়ানকে টেনে তুলল নৌকায়। দাঁতে চেপে ধরেছে কাগজটা রাফিয়ান, কিন্তু এত আলতো করে, সামান্যতম দাগও পড়েনি দাঁতের! উদ্বিগ্ন হয়ে ভাঁজ খুলল কিশোর, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক, বাঁচা গেছে! পানিতে ভিজেছে বটে, কিন্তু লেখার কোন ক্ষতি হয়নি। বল পয়েন্ট কলমের কালি, নষ্ট হয়নি। পাটাতনে কাগজটা বিছিয়ে আঙুল দিয়ে চেপে ধরে রাখল, যাতে আবার বাতাস উড়িয়ে নিতে না পারে। একবারেই শিক্ষা হয়ে গেছে।

'বড় বাঁচা বেঁচেছি!' বলল কিশোর।

অন্যেরাও স্বীকার করল কথাটা।

নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে আবার জিনা। দ্বীপের দিকে চলেছে।

বার বার গা ঝাড়া দিয়ে রোম থেকে পানি ঝরিয়ে নিয়েছে রাফিয়ান, রোদে পিঠ শুকাচ্ছে। পুরস্কার হিসেবে বড় একটা বিস্কুট পেয়েছে, কুটুর কুটুর করে কামড়াচ্ছে, চিবাচ্ছে আয়েশ করে।

চোখা ডুবো পাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে দক্ষ হাতে নৌকা বেয়ে চলেছে জিনা। মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারছে না কিশোর, ঘোড়ায় চড়তে যেমন ওস্তাদ মেয়েটা, নৌকা বাওয়ায়ও তেমনি।

নিরাপদেই সরু প্রণালীতে ঢুকল নৌকা, ছোট্ট বন্দরে এসে ঘ্যাচ করে থামল। লাফিয়ে বালিতে নামল অভিযাত্রীরা। টেনে নৌকাটা ডাঙার অনেক ওপরে তুলে রাখল, জোয়ারের পানি আর নাগাল পাবে না। মালপত্র নামাতে শুরু করল।

'দুর্গের ঘরটায় নিয়ে যাব সব,' কিশোর বলল। 'ওখানেই নিরাপদ। ঝড়বৃষ্টিতে নষ্ট হবে না, তবে, অন্য কেউ এসে পড়লে কি ঘটবে জানি না।'

'দু'এক দিনের মধ্যে আসবে না মনে হয়,' জিনা গাল চুলকাল। 'বাবা বলল, দলিলপত্র তৈরি করে রেজিস্ট্রি করাতে করাতে হপ্তাখানেক লেগে যাবে। হয়তো তার আগে আসবেই না ব্যাটা।'

'তারমানে, পাহারার দরকার নেই,' প্রণালী দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ওপর চোখ রাখার প্রয়োজন আছে কিনা ভাবছে কিশোর। 'চলো, যাই। মুসা, তুমি পানির ড্রাম নাও। খাবারের বোঝা আমি নিচ্ছি, খোন্তাগুলো নিক জিনা। রবিন, অন্য পোঁটলা-পাঁটলিগুলো তুমি নাও।'

খাবার আর পানি প্রচুর পরিমাণে আনা হয়েছে; রুটি, মাখন, বিস্কুট, জ্যাম, টিনজাত ফল, শুকনো আঙুর, চায়ের সরঞ্জাম আর কয়েক বোতল লেমোনেড। সব চেয়ে ভারি দুটো বোঝা নিয়েছে কিশোর আর মুসা, টিলা বেয়ে উঠতে কষ্টই হচ্ছে ওদের, পা টলোমলো করছে, পিছলে পড়ে গেলে দোষ দেয়া যাবে না।

দুর্গের ছোট ঘরটাতে এনে মালপত্র তুলল ওরা। আবার ফিরে চলল কম্বল আর চাদরের বাণ্ডিল আনতে। আনা হয়ে গেল। মালপত্র গুছিয়ে রেখে ঘরের বাইরের চত্বরে এসে বসল ওরা।

'এইবার আসল কাজ,' ম্যাপটা মাটিতে বিছাল কিশোর। 'ডানজনে ঢোকার পর খুঁজে বের করতে হবে। জিনা, দেখো তো, কিছু বোঝো কিনা?'

চারজনেই ঝুঁকে এল ম্যাপের ওপর। শুকিয়ে গেছে কাগজ, লেখা ঠিকই রয়েছে। নকশা দেখেই বোঝা যায়, পুরানো দিনে যখন আস্ত ছিল দুর্গটা, দেখার মত বিল্ডিং ছিল!

'এই যে দেখো,' ডানজনের ওপর আঙুল রাখল কিশোর, 'মস্ত বড় পাতাল-ঘর, আর এই এখানে…এখানে চিহ্ন… বোধহয় সিঁড়ির নিশানা।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জিনা, 'আমারও তাই মনে হয়। তারমানে, ডানজনে নামার দুটো পথ। একটা সিঁড়ি নেমেছে ওই ছোট ঘরটারই কোনখান থেকে…আরেকটা…আরেকটা টাওয়ারের নিচ থেকে, ওই যে ওই টাওয়ারটা,' হাত তুলে কাক-টাওয়ার দেখাল সে। 'এটা কি, কিশোর?'

একটা গোল চিহ্নের ওপর আঙুল রেখেছে জিনা, গোল একটা পাইপের মুখ যেন, পাইপটা ওপর থেকে শুরু হয়ে ডানজনের মেঝে ভেদ করে আরও নিচে নেমে গেছে।

'কি জানি!' নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। 'ও হ্যাঁ, বুঝেছি, কুয়ার কথা বলেছিলে না? এটাই সেটা। খুব গভীর। ওটাতে নামতে কেমন লাগবে ভেবে দেখো?'

'কেমন আর লাগবে!' বিড়বিড় করল মুসা। 'আমার রোম খাড়া হয়ে গেছে এখুনি! কুয়া দিয়ে পাতালে নামা…আরিব্বাপরে বাপ, আমি বাবা নেই ওতে!'

মুসার বলার ধরনে হেসে ফেলল অন্যেরা, রাফিয়ানও কুকুরে-হাসি হাসল বলল, 'হুফ!' যেন বোঝাল, এত ভয় কিসের? আমি আছি না সঙ্গে?

'এখন তাহলে কি করব?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'সিঁড়ি খুঁজব এই ঘরে থেকে থাকলে, এটা দিয়ে নামাই ভাল। যতদূর জানি, ওসব সিঁড়ির মু বড় চ্যাপ্টা পাথর দিয়ে ঢাকা থাকে। খুঁজব?'

'হ্যাঁ,' ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

শেওলা আর আগাছায় ঢেকে রয়েছে পাথুরে মেঝে, সিঁড়ির মুখ কোথায় বোঝার উপায় নেই।

'পরিষ্কার করতে হবে,' এগিয়ে গিয়ে একটা খোন্তা তুলে নিল কিশোর। তোমরাও নাও। কাজ শুরু করে দিই।'

চারটে খোন্তা আনা হয়েছে। কাজে লেগে গেল ওরা। চেঁছে সাফ করে ফেলতে লাগল মেঝের আগাছা।

চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত ছেলেদের কাজ দেখল রাফিয়ান, ও আর বসে থাকে কি করে? খোন্তা ধরতে পারবে না, তাতেই বা কি? চার পায়ে পাঁচটা করে ক্ষুরধার নখ রয়েছে, বিশটা যন্ত্র নিয়ে সে-ও লেগে গেল কাজে। আঁচড়ে-খামচে কাজ করতে গিয়ে অকাজই করল বেশি। ধুলো-মাটি আর আগাছার টুকরোর ঝড় উঠল। তার সব চেয়ে কাছে রয়েছে কিশোর, তার গায়েই ময়লা পড়ছে বেশি।

'এঁহ্হে, রাফি, থাম, থাম।' ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কিশোর। 'বালু দিয়ে চুলের সর্বনাশ করে দিচ্ছিস আমার!'

বারো

দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল মেঝে। চারকোনা বড় বড় পাথর জোড়া দিয়ে তৈরি মেঝে, একটার সঙ্গে আরেকটার সামান্যতম তফাৎ নেই। কোনটা আলগা বোঝাই যাচ্ছে না। টর্চের আলো ফেলে সাবধানে প্রতিটি পাথর পরীক্ষা করে দেখল কিশোর কিন্তু পাওয়া গেল না ফাঁক।

'লোহার রিঙ কিংবা হাতল-টাতল কিছু তো থাকার কথা,' রবিন বলল। 'এসো তো আরেকবার দেখি।'

একবার নয়, আরও কয়েকবার দেখল ওরা। প্রতিটি ফাঁকে খোন্তার মাথা ঢুকিয়ে জোরে চাড় দিয়েও দেখল কিশোর আর মুসা, আলগা পাথর পাওয়া গেল না। ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা একনাগাড়ে পরিশ্রম করল ওরা, লাভ হলো না। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট।

খেতে বসল ওরা। খেতে খেতেই আলোচনা চলল।

'আর কিভাবে দেখব?' কিশোর বলল। 'মনে হচ্ছে এঘরে নেই। দেখি, খেয়ে উঠে আরেকবার দেখব ম্যাপটা। অন্য কোন ইঙ্গিত আছে কিনা কে জানে!'

আরেকবার খুঁটিয়ে দেখা হলো ম্যাপ, নতুন কিছু বোঝা গেল না। নকশাটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। 'দেখো, ম্যাপে আঙুল রাখল সে হঠাৎ, 'এই চিহ্নটা, এটাকে সিঁড়ি ভাবছি আমরা, তা নাও তো হতে পারে? আর এই যে, কুয়ার মুখ, এটা এই চিহ্নের খুব কাছাকাছি। মানে কি? সিঁড়ির মুখ তো খুঁজে পেলাম না, চলো, কুয়ার মুখ খুঁজি। ওটা পেলে হয়তো সিঁড়ির মুখ খুঁজে বের করে ফেলতে পারব।'

'হয়তো,' জিনা বলল। 'কুয়াটা আশেপাশেই কোথাও···এই যে চত্বর, এরই কোথাও রয়েছে,' ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলল সে।

বাইরে উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল ওরা। দুর্গের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে আশপাশে তাকিয়ে কুয়ার মুখ খুঁজল। শেওলা, ঘাস আর ঝোপঝাড়ের জন্যে চত্বরের পাথরই দেখা যায় না ভালমত, কুয়ার মুখ দেখবে কি? জায়গায় জায়গায় পাথর ফেটে ভেঙে বেঁকাতেড়া হয়ে গেছে, এককালে সমতল, মসৃণ ছিল, এখন হয়েছে তার উল্টো।

বড় একটা খরগোশ যেন ফুঁস মন্তরের বলে উদয় হলো চত্বরে, কোথা থেকে উঠল ওটা, বোঝা গেল না। লাফিয়ে গিয়ে খানিক দুরের একটা গর্তে সুড়ৎ করে ঢুকে পড়ল। আরেকটা খরগোশ বেরোল, এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদেরকে দেখল, তারপর ওটাও গিয়ে ঢুকল আগের গর্তটায়।

খানিক পরে আরেকটা খরগোশ বেরোল, বাচ্চা। বড় বড় কান, ছোট্ট লেজ, মনে হয় যেন গোড়া থেকে কাটতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে, আটকে রয়েছে খানিকটা। খোশমেজাজে তিড়িং-বিড়িং করে এলোপাতাড়ি কয়েক লাফে ছেলেদের কাছাকাছি চলে এল ওটা, বসে পড়ে কৌতূহলী চোখে তাকাল, সামনের দুই পা দিয়ে কান ঘষছে, যেন ময়লা ধুয়ে ফেলছে।

খরগোশের বাচ্চার এই চালিয়াতি আর সইতে পারল না রাফিয়ান, 'হুঁউক!' করে ধমক লাগিয়েই তাড়া করল। কল্পনাই করেনি, তার চেয়ে অনেক বেশি ত্যাঁদোড় ওই অত্তোটুকুন বাচ্চা, চোখের পলকে লাফ দিয়ে তিন হাত ওপরে উঠে পড়ল ওটা, শূন্যেই ঘুরল, নিঃশব্দে নেমে এল আবার মাটিতে– আগের জায়গা থেকে অন্তত পাঁচ হাত দূরে, তারপর ছুটল। কান প্রায় লেপটে গেছে ঘাড়ের সঙ্গে, ছোট্ট লেজটা নাচছে ছোটার তালে তালে, রাফিয়ানকে কলা দেখাল সে অবলীলায়। একটা ঝোপের ধারে গিয়ে ফিরে তাকাল পলকের জন্যে, মুখই ভেঙচাল বোধহয়, পরক্ষণে ঢুকে পড়ল ঝোপে।

রাফিয়ান কি আর ছাড়ে? ঝোপঝাড় ভেঙে হুড়মুড় করে পিছু নিল সে-ও। ঝোপের ভেতরেই বোধহয় খরগোশের বাসা, গর্তের মুখ ছোট হয়তো, তাই খুঁড়তে শুরু করল কুকুরটা, ছিটকে আশা ধুলো মাটির ঝড় তা-ই প্রমাণ করছে। উত্তেজিত চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে তার, গলা ফাটিয়ে ডাকছে জিনা, চলে আসতে বলছে, কানেই তুলছে না রাফিয়ান। পাগলের মত গর্তের চারপাশের মাটি খুঁড়ে মুখ বড় করছে, নিশ্চয়ই তার ভাষায় বাপ-মা তুলে গাল দিচ্ছে বজ্জাত বাচ্চাকে। বোধহয় বলছে, 'যাবে কোথায়! আসছি আমি! শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব!'

'রাফি! শুনছিস! এই রাফি!' চেঁচাল আবার জিনা। 'কতবার না বলেছি, খরগোশ তাড়া করবি না এখানে! শুনছিস! এই পাজি!'

রোখ চেপে গেছে রাফিয়ানের, মনিবের ডাকের তোয়াক্কাই করছে না। সে তার কাজে ব্যস্ত। কয়েকটা চড়থাপ্পড় লাগিয়ে, কান ধরে টেনে আনার জন্যে চলল জিনা। সে ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াতেই আচমকা থেমে গেল আঁচড়ের শব্দ, রাফিয়ানের ভয়মেশানো আর্তি শোনা গেল একবার, তারপরেই চুপচাপ। দু'হাতে কাঁটাঝোপ সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল জিনা।

রাফিয়ান গায়েব! ঘটনাটা কি!– চমকে গেল জিনা। খরগোশের গর্ত দেখা যাচ্ছে, কালো ছড়ানো মুখ যেন বিশাল অজগরের হাঁয়ের মত হয়ে রয়েছে। খুঁড়ে

খুঁড়ে বড় করে ফেলেছে রাফিয়ান।

'কিশোর!' উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচিয়ে ডাকল জিনা। 'রাফিয়ান নেই! খরগোশের গর্তে পড়ে গেছে!'

ঝোপের ধারে জিনার পাশে বসে কিশোরও উঁকি দিল ভেতরে। রবিন আর মুসাও এসে হাঁটু গেড়ে বসল গা ঘেঁষে।

'গর্তে পড়ল!' বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। 'এত্তোবড় একটা কুকুর খরগোশের গর্তে পড়ে কি করে!'

'যেভাবেই হোক, পড়েছে!' কেঁদে ফেলবে যেন জিনা। 'খুঁড়ে বের করা দরকার ওকে! জলদি না করলে দম আটকে মরে যাবে!'

বেশ বড় ঝোপ, কাঁটা-ডাল, ভেতরে ঢোকা মুশকিল। তবে ভরসা, সঙ্গে যন্ত্রপাতি রয়েছে। ছুটে গিয়ে কুড়াল নিয়ে এল কিশোর। কুপিয়ে কাটতে লাগল কাঁটা-ঝোপ। সে আর মুসা মিলে অল্পক্ষণেই ঝোপের অনেকখানি উড়িয়ে দিল। হাতের কনুই পর্যন্ত ছড়ে কেটে গেছে, রক্ত বেরিয়ে এসেছে চামড়া কেটে, খেয়ালই করছে না।

গর্তটার পারে বসে ভেতরে ঝুঁকে তাকাল কিশোর। অন্ধকার। টর্চের আলো ফেলল। চেঁচিয়ে উঠল বিস্ময়ে। 'এই জন্যেই তো বলি, এতবড় একটা বাঘাকুকুর খরগোশের গর্তে ঢোকে কি করে! জিনা, এটাই কুয়া! কুয়ার পারে খরগোশের বাসার মুখ, খুঁড়ে খুঁড়ে দুটো এক করে ফেলেছে রাফিয়ান। খরগোশের গর্তে পড়েনি, পড়েছে কুয়ার ভেতরে।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল জিনা। বিলাপ শুরু করল, 'ও রাফি, রাফিরে, তুই কোথায়!...তোকে ছাড়া যে আমি বাঁচব না-রে রাফি...'

জিনার কাণ্ড দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মুসা আর রবিন। কিশোর মৃদু ধমক লাগাল, 'আরে, কি করছ, পাগলের মত! দাঁড়াও না দেখি আগে, তোলার ব্যবস্থা তো করতেই হবে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে রাফিয়ান!'

'হিঁউঁউঁউঁ' করে নাকি গলায় কেঁদে উঠল রাফিয়ান, সে যে বেঁচে আছে সেটা বোঝানোর জন্যেই, অনেক দূর থেকে ভেসে এল শব্দটা, কুয়ার নিচেই আছে।

মুসার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল কিশোর। 'যাও তো, এক দৌড়ে গিয়ে খোন্তা নিয়ে এসো। কুয়ার মুখ আরও বড় করতে হবে। তারপর দড়ি বেঁধে নেমে যাব।'

সহজেই পরিষ্কার করা গেল গর্তের মুখ। ঝোপঝাড়ের শেকড় গর্তের দেয়াল ভেদ করে ঠেলে বেরিয়ে আছে, তার ওপর পাতা, আলগা মাটি জমে ঢেকে গিয়েছিল মুখটা। ওগুলো সরাতেই দেখা গেল বড় একটা পাথর, প্রায় ঢেকে দিয়েছে কুয়ার মুখ, এক ধারে সামান্য ফাঁক, ওই ফাঁক দিয়েই ভেতরে পড়েছে রাফিয়ান।

সবাই মিলে প্রচুর কায়দা-কসরৎ করে পাথরটা সরাল কুয়ার মুখ থেকে। তলায় কাঠের আরেকটা ঢাকনা। বোঝা গেল, টাওয়ার ধসে পড়ার সময় কোনভাবে গড়িয়ে এসে পাথরটা পড়েছিল মুখে, কিন্তু নিচের ঢাকনাটা মাপমত তৈরি করে বসানো হয়েছে, পানিতে যাতে কোন কিছু না পড়তে পারে সে-জন্যে। ভিজে পচে গেছে কাঠ, এত নরম, রাফিয়ানের ভারও সইতে পারেনি, গোলমত

একটা ফোকর হয়ে আছে।

নিচে উঁকি দিল কিশোর, তল দেখা যায় না। অন্ধকার। পাথর ফেলল, কিন্তু ছলাত করে উঠল না, কোন-রকম আওয়াজই শোনা গেল না। তাহলে কি পানি নেই? নাকি পানি এত গভীরে, পাথর পড়ার আওয়াজ মাঝপথেই মিলিয়ে গেছে?

'সাংঘাতিক গভীর মনে হচ্ছে!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'কিন্তু রাফিয়ান···কোথায় ও?'

টর্চের আলো ফেলল ভেতরে। অনেক কাল আগে মস্ত আরেকটা পাথরের চাঙর পড়েছিল ভেতরে, কুয়ার এক জায়গায় দেয়ালের ঘের সরু, ওখানে আটকে আছে। ওখানেই বসে আছে বেচারা রাফিয়ান, জিভ বের করে, বড় বড় চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওপর দিকে। যেন বুঝতেই পারছে না, কি করতে কি ঘটে গেছে, কি হয়েছে ওর।

কুয়ার দেয়ালে আটকানো রয়েছে লোহার মই। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নেমে পড়ল মুসা, লোহার মই বেয়ে নেমে চলল নিচে– ভাবেইনি বোধহয়, পুরানো মই যে কোন মুহূর্তে খসে আসতে পারে দেয়াল থেকে। মই বেয়ে তরতর করে নেমে চলেছে সে। নিরাপদেই কুকুরটার কাছে পৌঁছল, অনেক চেষ্টায় কাঁধে তুলে নিল ভারি-রাফিয়ানকে, ধীরে ধীরে উঠে আসতে শুরু করল।

ওপরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে বন্ধুরা, মুসা কাছাকাছি আসতেই তার কাঁধ থেকে কুকুরটাকে তুলে আনল ওরা, তারপর হাত ধরে মুসাকে উঠতে সাহায্য করল। ধপ করে বসে পড়ে হাঁপাতে শুরু করল মুসা।

'মুসা,' আন্তরিক প্রশংসা করল কিশোর, 'তুমি যে আমার বন্ধু, এজন্যে গর্বে আধ হাত ফুলে যাচ্ছে আমার বুক।'

জিনা কিছু বলতে পারল না, কৃতজ্ঞ জল-টলোমলো চোখে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে।

'সেকেণ্ড, একটা কাজের কাজই করেছ!' রবিন বলল। 'তুমি দুর্দান্ত সাহসী! মই যে কোন সময় খসে যেতে পারত, তারপর কি ঘটত সেটা জেনেও···'

'খাইছেরে! ও-আল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'সেকথা তো ভাবিইনি!' চোখে আতঙ্ক ফুটেছে তার। একেবারে শুয়ে পড়ল। 'বাবাগো, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি!'

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। রাফিয়ানও তার কুকুরে-হাসি হেসে গাল চেটে দিল মুসার।

খেঁকিয়ে উঠল মুসা, 'দুত্তেরি, কুত্তার বাচ্চা! এখন এসেছে সোহাগ করতে! দিয়েছিলি তো আরেকটু হলে!···যা, যা এখান থেকে! ভাগ!'

মুসার এই হঠাৎ পরিবর্তনে ভড়কে গেল রাফিয়ান, এক লাফে পিছিয়ে এসে বোকা বোকা চোখে চেয়ে রইল। বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন, খানিক আগে বাঁচিয়েছে তাকে ওই মারমুখো ছেলেটা।

আবার হেসে উঠল সবাই।

জিনা ডাকল, 'রাফিয়ান, এদিকে আয়! দুষ্টু ছেলে, আর খরগোশ তাড়া করবি?' একটা ডাল ভাঙতে শুরু করল সে।

কি ঘটবে বুঝে গেল রাফিয়ান, দুই লাফে এসে জিনার একেবারে পায়ের

ওপর গড়িয়ে পড়ল। ডাল আর ভাঙা হলো না, হাত তুলল জিনা, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওঠ, এইবার মাপ করে দিলাম। এরপর...' হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে।

আবার ডানজনের প্রবেশপথ খোঁজায় মন দিল ওরা। ঝোপ কেটে সাফ করে খোন্তা দিয়ে খুঁচিয়ে চলল ওগুলোর গোড়ায়। মাঝেমধ্যে ঠনন্ করে পাথরে বাড়ি লাগছে খোন্তা, খুঁড়ে বের করে আনছে ওটা। সাবধানে রয়েছে, রাফিয়ানের মত আলগা মাটির আস্তর ধসে না আবার গর্তে পড়ে। উত্তেজনায় ঘামছে দরদর করে।

হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলল রবিন। নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে। পরিশ্রান্ত হয়ে খানিক জিরিয়ে নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়েছিল সে, শুয়ে শুয়েই মাটি খামচাচ্ছিল। বালির তলায় ঠাণ্ডা কিছু আঙুলে ঠেকল তার। কৌতূহল হলো, উঠে বসে বালি সরাতেই দেখা গেল, লোহার একটা মোটা রিঙ!

'এই, এদিকে এসো তোমরা!' ডাকল সে। 'দেখে যাও!'

রিঙটা কিসে আটকানো, বালি পরিষ্কার করতেই তা বোঝা গেল। চারকোনা একটা পাথরের চাঙড়। নিশ্চয় প্রবেশপথের মুখে ঢাকা দেয়া রয়েছে।

নতুন উদ্যমে ওটাকে সরানোর কাজে লেগে গেল ছেলেরা। বহু টানাটানি করল, কিন্তু এক চুল নড়ল না ভারি পাথর। মুসার প্রচণ্ড শক্তিও বিফল হলো। ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোর পাশার, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে। 'হবে, হবে, দাঁড়াও!' আচমকা ধ্যান ভাঙল তার। দড়ি কয়েক পাক করে পেঁচিয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল রিঙে, শক্ত করে বাঁধল। 'এসো, সবাই ধরো।'

দড়ি ধরল সবাই।

'মারো টান! হেঁইও!...জোরসে মারো! হেঁইওঁ!'

সম্মিলিত শক্তির কাছে হার মানল পাথর। ছিপাত করে বিচিত্র শব্দ তুলে মাটির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হলো ওটা। এর পরের কাজ সোজা। টেনে প্রবেশমুখ থেকে ঢাকনা সরিয়ে ফেলল ওরা।

একই সঙ্গে হুড়াহুড়ি করে এসে গর্তটার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল সবাই, নিচে উঁকি দিল। ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।

'যাক, পাওয়া গেল!' বলল কিশোর। 'চলো এবার, নামি।'

পিচ্ছিল সিঁড়ি, সবার আগে বুঝল সেটা রাফিয়ান। লাফিয়ে নামতে গিয়েই পা পিছলাল, হড়াৎ করে নেমে চলে গেল কয়েক ধাপ, উলটপালট খেয়ে শেষে থামল এক জায়গায়, উঠল কোনমতে। কুঁই কুঁই করছে ভয়ে। আর নামতে সাহস পাচ্ছে না।

সাবধান হয়ে গেল অন্যেরা। ধীরে ধীরে নেমে চলল। দুরুদুরু করছে বুক। ডানজন তো পাওয়া গেল, সোনার বারগুলো পাওয়া যাবে তো! কতগুলো আছে? ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পুরো মেঝেতে?

বাঁক নিল সিঁড়ি। অন্ধকার বাতাসে ভেজা কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। শ্বাস নিতে অসুবিধে হয়।

'ইঁহ! দম আটকে আসে!' জিনা নাক দিয়ে খোঁতখোঁত করল।

'তাও-তো ভালই এখানে বাতাস,' কিশোর বলল, 'আরও নিচে কেমন কে

জানে! কুয়া কিংবা পাতালের বদ্ধ ঘরগুলোতে নানারকম বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকে। ফুসফুসে ঢুকলে মরণ!'

নীরবে নেমে চলল ওরা। যখন ভাবতে শুরু করেছে, এই সিঁড়ির আর শেষ নেই, ঠিক তখনই শেষ হলো সিঁড়ি। চারপাশে আলো ফেলে দেখল কিশোর। রোমাঞ্চকর দৃশ্য! জায়গায় জায়গায় পাথর পড়ে রয়েছে। একটা গুহা, প্রাকৃতিক, না মানুষের খোঁড়া, বোঝা গেল না। রহস্যময় অন্ধকার সবখানেই।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ফাঁপা এক ধরনের আওয়াজ উঠল বদ্ধ জায়গায়, দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল: ল্লা-ল্লা-ল্লা-ল্লা-ল্লা···! জ্যান্ত একটা শব্দের সাপ যেন বিচিত্র শব্দ তুলে পাক খাচ্ছে ওদেরকে ঘিরে, দেখা যায় না, অনুভব করা যায় যেন, হাত বাড়ালেই বুঝি ধরা যাবে! গায়ে গা ঘেঁষে এল ছেলেরা।

'আশ্চর্য!' ভয়ে ভয়ে নিচু গলায় বলল জিনা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল, খুব আস্তে, ফিসফিস করে পাক খেতে শুরু করল যেন এবার শব্দের সাপটা।

কিশোরের হাত খামচে ধরল জিনা। কাঁপছে। রক্ত জমেছে মুখে। এই ধরনের প্রতিধ্বনির সঙ্গে পরিচয় নেই তার, কিন্তু তিন গোয়েন্দার অভিজ্ঞতা আছে। টেরর ক্যাসলের প্রতিধ্বনি এর চেয়েও ভয়াবহ ছিল!

'বারগুলো কোথায়?' নিচু গলায় বলল মুসা, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল: কোথায়! কোথায়! কোথায়!

হেসে উঠল কিশোর, তার হাসিকে লুফে নিয়ে শত-সহস্রভাগ করে বিচিত্র শব্দে যেন আবার তার দিকে ছুঁড়ে দিল রহস্যময় গুহা। চুপ হয়ে গেল সে। আস্তে বলল, 'এসো, আর কোথাও চলে যাই! এ-জায়গাটা ভাল না!'

ভাল না! ভাল না! ভাল না!– প্রতিধ্বনি হলো।

সিঁড়ির কাছ থেকে সরে এল ওরা। দেয়ালে বড় ফোকর, বোধহয় দরজা। একটা ফোকর দিয়ে ঢুকে অন্য পাশে চলে এল ওরা, আরেকটা ঘরে, এটাকেও গুহা বলা যেতে পারে। এগুলো কি কাজে ব্যবহার হত? নিশ্চয় কয়েদী আটকে রাখার জন্যে, অনুমান করল কিশোর। বিড়বিড় করল, 'কিন্তু বারগুলো কোথায়?' পকেট থেকে ম্যাপ বের করে মাটিতে বিছিয়ে তাতে টর্চের আলো ফেলল। বারগুলো কোথায় আছে, স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে বটে ম্যাপে, কিন্তু এই পাতালের ঘরে কোনটা যে কোন দিক, বোঝার উপায় নেই। ইস্, একটা কম্পাস নিয়ে আসা উচিত ছিল, আফসোস করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'মনে হয়···,' চোখ তুলল কিশোর হঠাৎ, 'এ-ঘরের আশেপাশেই কোথাও রয়েছে! ওই যে, আরেকটা দরজা, হয়তো তার ওপারেই···আমি শিওর, ওখানেই আছে!'

তেরো

এক সঙ্গে চারটে টর্চ ঘুরে গেল দরজার দিকে। ভারি কাঠের পাল্লা লাগানো, বড় বড় পেরেক গেঁথে আটকে দেয়া হয়েছে, যাতে সহজে না খোলা যায়। হাসি ফুটল

মুসার মুখে, ছোট্ট একটা কাশির মত শব্দ করেই ছুটে গেল দরজার কাছে। ঠেলা দিয়ে, থাবা মেরে, ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা করল।

কিন্তু বেশ ভাল করেই আটকানো হয়েছে দরজা। নড়লও না। চাবির ফোকর এত বড়, আঙুল ঢুকে যায়, চাবি নিশ্চয় আঙুলের মতই মোটা ছিল। কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে দরজা আর তালার ফোকরের দিকে চেয়ে রইল ছেলেরা। এখন কি করবে? কি করে খুলবে ওই দরজা?

'কুড়াল!' নীরবতা ভাঙল কিশোর। 'কুড়াল আনতে হবে! কুপিয়ে ভেঙে ফেলব তালা!'

'ঠিক বলেছ!' সায় দিল মুসা। 'চলো গিয়ে নিয়ে আসি!' তর সইছে না আর তার।

কিন্তু ফিরতে গিয়ে বুঝল ওরা, পথ হারিয়ে ফেলেছে। বিশাল ঘর, গোল দেয়াল, তাতে বড় বড় অসংখ্য ফোকর, সবগুলোই দেখতে প্রায় এক রকম, কোনটা দিয়ে ঢুকেছিল, বলতে পারবে না। অনুমানে একটা ফোকরে ঢুকে পড়ল। বেরিয়ে এল একটা ঘরে। সিঁড়ি-ঘর নয় এটা। বড় বড় কাঠের পিপে ভেঙে-চুরে পড়ে আছে, কাঠপচা গন্ধ। নানা ধরনের খালি মদের বোতল স্তূপ হয়ে পড়ে আছে ঘরের কোণে। আর কয়েকটা টুকিটাকি ভাঙা জিনিস পড়ে রয়েছে এদিক ওদিক।

'বিচ্ছিরি!' নাক কোঁচকাল কিশোর।

আবার আগের বড় ঘরটায় ফিরে এল ওরা। আরেকটা ফোকর দিয়ে ঢুকল। কিন্তু সিঁড়ি-ঘর পাওয়া গেল না, তার বদলে আরেকটা গোল ঘর। নানা রকম বাতিল জিনিস, আর পচা ভ্যাপসা গন্ধ।

একের পর এক ফোকর দিয়ে ঢুকল ওরা, বোরোল, কিন্তু প্রতিবারেই নতুন আরেকটা ঘরে ঢুকছে। সিঁড়ি-ঘর পাওয়া যাচ্ছে না।

'বাকি জীবন আটকে থাকতে হবে নাকি এখানে!' বিড়বিড় করল মুসা।

জিনা আর রবিন চুপ, তাদের ভয় সংক্রামিত হয়েছে যেন কুকুরটার মাঝেও, সে-ও চুপ।

'এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?' সাহস দিল কিশোর। 'কোন না কোনভাবে বেরিয়ে যাবই। আ-আরে, ওটা কি!'

সবাই তাকাল। ইঁটের তৈরি মস্ত এক চিমনির মত, ছাত থেকে নেমে এসে ঢুকে গেছে মেঝেতে।

আলো ফেলে দেখতে দেখতে বলে উঠল জিনা, 'আমি জানি কি ওটা! কুয়া! ওপর থেকে নেমে এসে মেঝে ভেদ করে চলে গেছে পাতালে!'

ঠিকই বলেছে সে। এগিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে দেখল সবাই। কুয়ার দেয়ালে এক জায়গায় একটা জানালামত, একবারে একজনের বেশি মাথা ঢোকাতে পারল না তাতে। হাত ঢুকিয়ে ওপর-নিচে আলো ফেলে দেখল কিশোর, একেবারে নিচে কি আছে দেখা গেল না। পাথর ফেলে দেখল, কোন আওয়াজ নেই। বড় বেশি গভীর! অনেক ওপরে আবছা আলো, ছোট্ট একটা ফাঁক দিয়ে আসছে। কুয়ার যেখানে চ্যাপটা পাথরটা আটকে আছে, ওই যে, যেটাতে রাফিয়ান পড়েছিল, তারই ফাঁক দিয়ে আসছে আলো, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

'হ্যাঁ,' মাথা বের করে এনে বলল কিশোর, 'কুয়াই। সুবিধে হয়েছে। কুয়াটার কাছাকাছিই কোথাও আছে সিঁড়ি-ঘর।'

এ-ঘরটায় ফোকর বেশি নেই। একটা করে ফোকরে ঢুকে ওপাশ দেখে ফিরে আসতে লাগল কিশোর। তিন নম্বরটায় ঢুকে খানিকটা দেরি করল, ফিরে এল হাসি মুখে। 'পেয়েছি, এসো।'

অন্ধকার পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা ওপরে, বাইরে, খোলা রোদে। মাথায় কাঁধে সূর্যের আলো যেন অমৃতের পরশ বোলাল, ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ বাতাস ঘন ঘন ফুসফুসে টেনে নিল ওরা, অকারণেই খিলখিল করে হাসল জিনা, তার হাসি সংক্রামিত হলো রবিন আর মুসার মাঝেও।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'আরিব্বাপ! সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। তাই তো বলি, পেটে মোচড় দিচ্ছে কেন। চলো চলো, খেয়ে নিই। কি সেকেণ্ড, আজ খিদে কোথায় গেল?'

'আরে মিয়া ক্ষুধা আর টুধা! মরেই তো যাব ভেবেছিলাম!' মুক্তির আনন্দে খাওয়ার কথা ভুলে গেছে মুসা আমান!

আগুন জ্বেলে চায়ের জন্যে কেটলিতে পানি চাপিয়ে খোলা চত্বইরেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। গায়ে লাগছে কুসুম গরম রোদ, আহ্, কি আরাম!

চা, বিস্কুট আর কেক দিয়ে বিকেলের নাশতা সারা হলো, সেই সঙ্গে কিছু রুটি আর পনিরও খেল। সাংঘাতিক পরিশ্রম গেছে। কিছুটা ভারি খাওয়ার দরকার ছিল। রাফিয়ানেরও খাওয়া ভালই হলো। জিনার গা ঘেঁষে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে। চোখ বন্ধ, কান লেপটে রয়েছে মাথার সঙ্গে। সোজা হয়ে মাটিতে বিছিয়ে আছে লম্বা লেজটা। অদ্ভুত প্রতিধ্বনি, তারপর পাতালে পথ হারিয়ে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে-ও। একবার মাত্র গর্জে উঠেছিল প্রতিধ্বনিকে ভয় দেখানোর জন্যে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন শ'খানেক কুকুর এক সঙ্গে গর্জে উঠেছিল, তারপর সেই যে চুপ করেছে রাফিয়ান, একটা গোঙানিও বেরোয়নি ওর গলা দিয়ে, যতক্ষণ পাতালে ছিল।

আটটা পর্যন্ত শুয়ে রইল ওরা। সূর্য ডুবছে। গরম রোদ আর নেই, ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে।

উঠে বসল কিশোর।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'আবার ঢুকছি নাকি আজ?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আজ আর না। কাহিল লাগছে। চলো, ঘরে গিয়ে শুই।'

ঘরে এসে বিছানা পাতল ওরা। রাতের খাওয়ার ঝামেলায় আর গেল না। সটান শুয়ে পড়ল যার যার বিছানায়। শোয়ামাত্রই ঘুম।

ভোরে রাফিয়ানের ঘেউ ঘেউ ডাকে ঘুম ভাঙল ছেলেদের। দরজার কাছে একটা খরগোশ ছিল, ওটাকে দেখেই ধমকে উঠেছে কুকুরটা। তাড়া করতে গেল, ডেকে তাকে ফেরাল জিনা।

ঘুম ভাঙতেই প্রথমে পাতালের বড় কাঠের দরজাটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে ভাঙতে হবে ওটা। কি আছে অন্য পাশে, দেখা

দরকার।

পেট ভরে খেয়ে নিল ওরা। সারাদিন আর খেতে পারবে কিনা, খাওয়ার সময় আর সুযোগ পাবে কিনা, জানে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না। সোনার বারগুলো থেকে থাকলে, ওগুলো খুঁজে বের করবেই।

কুড়াল তুলে নিল কিশোর। আগে আগে চলল। তার পেছনে অন্যরা। সবার পেছনে রয়েছে রাফিয়ান। কোথায় যাচ্ছে, বুঝতে পারছে, সে-জন্যেই মনমরা। আবার গিয়ে পাতালের অন্ধকার গোলকধাঁধায় ঢোকার কোন ইচ্ছেই নেই তার। ভাবছে বোধহয়: কেন বাপু, এই রোদ, এই আলো, এই খরগোশ তাড়া করার দুরন্ত মজা ছেড়ে গিয়ে বিচ্ছিরি একটা অন্ধকার গুহায় ঢোকা! তা-ও আবার যে-সে গুহা নয়, কথা বললেই ধমকে উঠে শতকণ্ঠ! কিন্তু জিনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করার সাহস বা ইচ্ছে কোনটাই নেই তার।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে আবার সিঁড়ি-ঘরে নেমে এল ওরা। বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় সেই ফোকরটা খুঁজে পেল, যেটা দিয়ে কাঠের দরজাওয়ালা ঘরটায় ঢোকা যায়।

'আবার পথ হারাব আজ!' জিনার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'কি-যে অন্ধকার! সব ক'টা ফোকর আর ঘর যেন এক রকম! কোনটা থেকে কোনটা আলাদা, বোঝার জো নেই।'

'কম্পাস আনলেই অনেক সহজ হয়ে যেত!' বলল কিশোর। 'কিন্তু আনিনি যখন, ভেবে আর কি হবে? সাবধান থাকতে হবে, এই আর কি।'

কম্পাস আনেনি বটে, কিন্তু আজ চক নিয়ে এসেছে কিশোর। যে পথেই যাচ্ছে, পাশের দেয়ালে খানিক পর পরই বড় করে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এঁকে এঁকে এগোচ্ছে। কুয়াঘরটা খুঁজে পেয়েছে, ফোকরের পাশের দেয়ালে কয়েকটা আশ্চর্যবোধক এঁকে দিয়েছে। এবার আর পথ হারানোর ভয় নেই, ফিরে এসে এই ঘরটায় ঢুকতে পারলেই আর ভয় নেই, কারণ এর কাছাকাছিই রয়েছে সিঁড়িঘর, পাওয়া যাবেই।

কাঠের দরজা আর তাতে মারা পেরেকগুলো ভালমত পরীক্ষা করল কিশোর। পুরানো আমলের বড়, চ্যাপ্টা মাথাওয়ালা পেরেক, তাতে লাল মিহি মরচে। আঙুল দিয়ে ছুঁলে লাল হয়ে যায় আঙুলের মাথা।

তালার পাশে দরজায় কোপ বসিয়ে দিল সে। ঘ্যাচাৎ! আশা করেছিল ভেঙে যাবে, ভাঙল না। আবার কোপ মারল কিশোর। লোহার পাতে বাড়ি খেয়ে পিছলে কাত হয়ে গেল কুড়ালের ফলা, চড়াৎ করে কাঠের চিলতে উঠে গিয়ে সোজা গাঁথল মুসার গায়ে।

'ও বাবাগো, গেছি, গেছি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। টান দিয়ে খসিয়ে ফেলল কাঠের চিলতে, ক্ষত থেকে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল।

টর্চের আলোয় ক্ষতটা ভাল করে দেখল কিশোর, বলল, 'খুব লাগছে, না? সরি। যাও, ওপরে গিয়ে ভাল করে ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে নাও। রবিন, তুমিও যাও, ওকে সাহায্য করো।'

'আমিও যাই,' উদ্বিগ্ন হয়ে বলল জিনা।

'না, তোমার আসার দরকার নেই,' কাটা জায়গা চেপে ধরে রেখেছে মুসা। 'তুমি এখানেই থাকো, কিশোরকে সাহায্য করতে পারবে।'

'জিনা,' কুড়াল বাড়িয়ে ধরে বলল কিশোর, 'কোপাও। দেখো, কিছু করতে পারো কিনা দরজার। আমি মুসাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

রাফিয়ানের দায়িত্বে জিনাকে রেখে সিঁড়িঘরের দিকে এগোল তিনজনে।

কাঠের দরজাটাকে আক্রমণ করল জিনা, সব দোষ যেন ওটার, তাই শাস্তি দিচ্ছে। একটু পরেই ফিরে এল কিশোর। ইতিমধ্যে তালার চারপাশে মোটামুটি দাগ কেটে ফেলেছে জিনা।

কিশোর কুড়ালটা নিয়ে নিল জিনার হাত থেকে, কোপাতে শুরু করল। বেশিক্ষণ আর টিকল না কাঠ, খটাং করে তালাটা খুলে কাত হয়ে ঝুলে রইল একপাশে। ধাক্কা দিতেই কড়মড় প্রতিবাদ তুলে যেন ঘুম ভাঙল দরজার মরচে ধরা কব্জার। টর্চ হাতে ঢুকে পড়ল দু'জনে।

মাঝারি আকারের একটা গুহা, পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। পুরানো পিপে আর বাক্সের বদলে এখানে অন্য জিনিস রয়েছে। একধারের দেয়াল ঘেঁষে স্তূপ হয়ে রয়েছে হলদে রঙের ছোট ছোট ইঁটের মত কিছু।

একটা ইঁট তুলে নিল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, 'সোনা! খাঁটি সোনার বার! জিনা, অনেক টাকার সোনা এখানে!'

চোদ্দ

জিনার মুখে কথা জোগাল না। চোখ বড় বড় করে সোনার স্তূপের দিকে চেয়ে আছে, বিশ্বাসই করতে পারছে না। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা অস্থির লাফালাফি জুড়েছে। কিশোরেরও প্রায় একই অবস্থা।

রাফিয়ানের উত্তেজিত চিৎকারে চমক ভাঙল ওদের। প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করছে।

'এই রাফি, চুপ চুপ!' ধমক দিল জিনা, কিন্তু কুকুরটার দিকে চেয়ে নিজেই চুপ হয়ে গেল। এমন করছে কেন! 'কি ব্যাপার, মুসা আর রবিন আসছে?'

ফিরেও তাকাল না রাফিয়ান, চিৎকারও থামল না।

দরজার কাছে এসে ডেকে জিজ্ঞেস করল জিনা, 'মুসাআ! রবিইন! তোমরা? জলদি এসো! সোনার বারগুলো খুঁজে পেয়েছি!'

জবাব নেই।

রাফিয়ানের চিৎকার এখন চাপা গর্জনে রূপ নিয়েছে। ভীষণ চোখে তাকিয়ে আছে দরজার ওপাশের অন্ধকারের দিকে। 'কিরে রাফি!...নাহ্, মুসা আর রবিনকে দেখে ওরকম করার কথা না! এই রাফি...' কথা আটকে গেল তার।

অন্ধকার থেকে ভেসে এসেছে একজন মানুষের ভারি কণ্ঠস্বর, গুমগুম করে উঠল যেন বদ্ধ জায়গায়। বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুলল পাথরের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে।

'কে? কে ওখানে?'

ভয়ে কিশোরের হাত খামচে ধরল জিনা। গুঙিয়েই চলেছে রাফিয়ান, ঘাড়ের

রোম খাড়া হয়ে গেছে।

টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে জিনা, ফিসফিস করে বলল, 'চুপ! চুফ রাফি!'

কিন্তু রাফি চুপ করল না।

দরজার ওপাশের ঘরের একটা সুড়ঙ্গ-মুখে জোরাল টর্চের আলো দেখা গেল। দরজা থেকে সরে যাওয়ার সময় পেল না কিশোর আর জিনা, আলো এসে পড়ল হঠাৎ ওদের ওপর, রাফির গোঙানিই এজন্যে দায়ী।

'আরে, আরে!' বলে উঠল ভারি কণ্ঠ, 'দেখেছ কারা। দুটো ছেলেমেয়ে! আমার দুর্গের ডানজনে তোমরা কি করছ?'

'তোমার দুর্গ! মানে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'আমার দুর্গ মানে আমার দুর্গ, এটা না বোঝার কি হলো? আরও খুলে বলছি, এটা আমি কিনছি: কাগজপত্র তৈরি হতে যা দেরি।'

লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল আরেকজন। চুপচাপ এক মুহূর্ত দেখল জিনা আর কিশোরকে। জিজ্ঞেস করল, 'বারগুলো খুঁজে পেয়েছ বলে চেঁচাচ্ছিলে, কিসের বার? কি খুঁজে পেয়েছ?'

'বলো না,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, কিন্তু চাপা রাখা গেল না কথাটা, ফাঁস করে দিল প্রতিধ্বনি। অনেক গুণ জোরাল হয়ে বার বার ঘুরেফিরে বলল: বলো না! বলো না!! বলো না!!!

'বলবে না?' বলতে বলতে এগিয়ে এল ভারি কণ্ঠ।

দাঁত খিঁচিয়ে ধমক লাগাল রাফিয়ান, কিন্তু তাকে কেয়ারই করল না লোকটা। সোজা এগিয়ে আসতে লাগল। দরজার কাছে এসে ভেতরে আলো ফেলেই শিস দিয়ে উঠল বিস্ময়ে। 'জেরি! দেখো এসে!' ডাকল সঙ্গীকে। ঠিকই বলেছিলে, সোনা আছে এখানে! পড়ে আছে, তুলে নিয়ে গেলেই হলো! এমন সুন্দর দৃশ্য জিন্দেগীতে দেখিনি!'

'ওগুলো সব আমার!' রেগে উঠল জিনা। 'এই দ্বীপ আর দুর্গ আমার মায়ের, এখানে যা আছে, সব আমাদেরই। ওই সোনার বার নিয়ে এসে জমা করেছিল আমার নানার-নানার-বাবা, তারপরেই তার জাহাজ ডুবে গেছে। এই সোনা তোমাদের নয়, ছিল না কোনকালে, হবেও না। এখনি গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলব, দ্বীপ আর বিক্রি করবে না, তোমরাও কিনতে পারবে না। খুব তো চালাকি করেছ! বাবাকে ভাল মানুষ পেয়ে ফাঁকি দিয়ে ম্যাপটা নিয়ে গেছ, দ্বীপ কেনার ফন্দি এঁটেছ!'

নীরবে জিনার গরম বক্তৃতা শুনল লোকটা, খুক করে হাসল। 'আমাদেরকে রুখতে পারবে বলে মনে হয় না? দুটো শিশু তোমরা, এত শক্তি আছে? এখন তো আরও ভাল হলো, দ্বীপ কেনার টাকাটাও বাঁচল। বারগুলো নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলব, তারপর জাহাজে করে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাব। এই পচা দ্বীপ আর দুর্গ দিয়ে কি কচুটা করব?' হাসল আবার সে।

'পারবে না!' এগিয়ে এসে দরজা আটকে দাঁড়াল জিনা। 'এখুনি বাড়ি গিয়ে বাবাকে সব খুলে বলছি...'

'মাই ডিয়ার বালিকা, বাড়ি আর যেতে পারছ না,' বলল দ্বিতীয় লোকটা,

জিনার কাঁধে হাত রাখতে গেল, ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিল জিনা। জোর করেই তার কাঁধ ধরে ঠেলে ভেতরে নিয়ে গেল লোকটা। 'তোমার ওই কুত্তাটাকে সরাও! নইলে গুলি করে মারব!'

অবাক হয়ে দেখল জিনা, লোকটার হাতে বেরিয়ে এসেছে চকচকে বড়সড় একটা রিভলভার, রাফিয়ানের দিকে তাক করছে। থাবা দিয়ে তার হাত অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল জিনা, রাফিয়ানের গলায় চামড়ার কলার ধরে টেনে সরিয়ে আনল। 'এই, রাফি, চুপ! চুপ কর বলছি! কিছু হয়নি!'

হয়নি বললেই হলো? রাফিয়ান কি এত বোকা? ঠিকই বুঝেছে সে, ঘাপলা একটা হয়েছে। চুপ তো করলই না, গোঙানি আরও বাড়িয়ে দিল। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা। জিনা ছেড়ে দিলেই গিয়ে এখন লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'গুড,' বলল লোকটা। 'এভাবেই আটকে রাখো, ছাড়লেই মরবে ওটা। তোমাদের ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই আমাদের। কিন্তু একটু এদিক ওদিক করলেই···যা বলি, শোনো, মোটর-বোটে করে এসেছি আমরা, কাজেই বারগুলো এখুনি নিয়ে যেতে পারছি না। একটা জাহাজ আনতে যাচ্ছি, ততক্ষণ তোমরা আটকে থাকবে এখানে।'

'তোমাদের আরও দু'জন সঙ্গী আছে, বুঝতে পেরেছি। চেঁচিয়ে দু'জনের নাম ধরে ডাকছিলে,' বলল অন্য লোকটা। 'কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওদেরও আটকে থাকতে হবে এখানে। ভয় নেই, খাবার আর পানি রেখে যাব, না খেয়ে মরবে না। এক কাজ করো তো,' পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করল সে। ছোট্ট একটা নোট লিখে দাও। লেখো, সোনার বারগুলো পেয়েছ। ওপরে যারা আছে তারা যেন শিগগির চলে আসে। চিঠি নিয়ে যাবে কুত্তাটা। খবরদার, কোনরকম চালাকির চেষ্টা করবে না।'

'করব না।' মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছে জিনা, সেটা ঢেকে রাখতে পারছে না। 'চালাকিও করব না, কিছু লিখবও না। কি ভেবেছ? আমাদেরকে বন্দি করে রাখবে? আবার বারগুলো নিয়ে যাবে? সেটি হচ্ছে দিচ্ছি না কিছুতেই।'

'ভাল চাও তো লেখো,' গর্জে উঠল রিভলভারধারী, 'নইলে প্রথমে গুলি করব কুত্তাটাকে।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল জিনা। শীত শীত করে উঠল গা, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যেন রক্তস্রোত। 'না, না, গুলি কোরো না!' ফিসফিস করে বলল সে।

'বেশ, তাহলে লিখে ফেলো,' কাগজ-কলম বাড়িয়ে ধরল লোকটা।

'আমি পারব না!' ফুঁপিয়ে উঠল জিনা, মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'বেশ, তাহলে মরুক তোমার কুত্তামিয়া,' রিভলভারের মুখ ঘোরাতে শুরু করল সে। শীতল কণ্ঠস্বর।

রাফিয়ানের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনা, জড়িয়ে ধরে আড়াল করে রাখতে চাইল। 'না না, মেরো না, লিখছি! দাও লিখে দিচ্ছি!' কাঁপা হাতে কাগজ আর কলম নিয়ে লোকটার দিকে তাকাল সে, 'কি লিখব?'

'লেখো,' আদেশ দিল ভারি কণ্ঠ, 'রবিন, মুসা, সোনার বারগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা। জলদি এসো। ব্যস, এই তো, আর কি?'

নির্দেশমত লিখল জিনা। নাম সই করতে গিয়ে ভাবল এক মুহূর্ত, তারপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখল: জরজিনা গোবেল। এই ইঙ্গিতটা যদি বুঝতে পারে দুজনে, তাহলে উপায় একটা হলেও হতে পারে, আর কিছুই করার নেই।

লোকটার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে একটানা গোঁ গোঁ করে চলেছে রাফিয়ান, জিনা মানা করছে বলেই, নাহলে কখন আক্রমণ করে বসত! চিঠিটা ভাঁজ করে তার কলারে আটকে দিল জিনা, আরেকবার লোক দুটোর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছুটল।

জিনাকে ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না রাফিয়ানের, কিন্তু মনিবের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা রয়েছে, যাওয়াটাই উচিত বলে ধরে নিয়েছে সে। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরে বেরিয়ে এল। বাতাসে নাক তুলে গন্ধ শুঁকল, রবিন আর মুসার গন্ধ খুঁজছে। কোথায় ওরা?

মাটিতে গন্ধ পাওয়া গেল, যেখান থেকে হেঁটে গেছে মুসা আর রবিন। গন্ধ শুঁকে শুঁকে অনুসরণ করে চলল রাফিয়ান। ছোট পাহাড়টার ধারে ওদের দেখতে পেল সে। ছুটে এসে দাঁড়াল কাছে। মুসা চিত হয়ে শুয়ে আছে, তার গালের ক্ষতটা লাল, তবে রক্ত পড়া থেমে গেছে।

রবিন পেছন করে বসে আছে, মুসাই আগে দেখতে পেল রাফিয়ানকে। 'আরে, রাফি!' তাড়াহুড়ো করে উঠে বসল সে। 'তুই একা। পাতালে অন্ধকারে ভাল্লাগছে না বলে চলে এসেছিস?'

'মুসা,' রাফিয়ানের কলারের দিকে চোখ রবিনের, 'ওটা কি? কাগজ মুচড়ে লাগিয়ে দিয়েছে!...নিশ্চয় নোট-ফোট কিছু! জরুরী কোন খবর...'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা খুলে আনল সে, ভাঁজ খুলে পড়ল মুসাকে শুনিয়ে, 'সোনার বারগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা! জলদি এসো!...জরজিনা গোবেল!...জর-জিনা!'

'পেয়েছে!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'চলো চলো, দেখি? বসে আছ কেন?'

কিন্তু রবিন উঠল না। চিঠিটার দিকে তাকিয়ে আছে, চিন্তিত।

'কি ব্যাপার?' আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তোমার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে, না? শুধু জিনা লিখলেই তো পারত, কিংবা জিনা পারকার! জরজিনা গোবেল লিখতে গেল কেন? ব্যাপারটা কেমন জানি লাগছে আমার! কোন ধরনের ইঙ্গিত? হুঁশিয়ারি?'

'দূর, কি বোকার মত কথা বলছ? হুঁশিয়ার করতে যাবে কেন এভাবে চিঠি লিখে?'

'মুসা, প্রণালীটা দেখে আসি। আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি থাকো এখানে, আসছি এখনি।'

কিন্তু একা একা বসে থাকার ইচ্ছে নেই মুসার, রবিনের পেছনে চলল। বলতে বলতে গেল, অযথাই সন্দেহ করছে রবিন, অহেতুক সময় নষ্ট করছে। কিন্তু কিশোরের কাছে শিক্ষা পেয়েছে রবিন, সন্দেহ হলেই সেটা যাচাই করে দেখে সন্দেহমুক্ত হয়ে নেবে।

প্রণালীর মুখে মোটরবোটটা দেখতে পেল ওরা। ওরা ছাড়াও অন্য কেউ

উঠেছে দ্বীপে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। মুসার দিকে তাকাল রবিন, ফিসফিস করে বলল, 'দেখলে তো! জিনা আমাদেরকে হুঁশিয়ারই করেছে! আমার মনে হয় ওই লোকটা, যে দ্বীপ কিনছে, বাক্সটা চেয়ে নিয়ে গেছে জিনার বাবার কাছ থেকে—নিশ্চয় ব্যাটা গিয়ে ঢুকেছে ডানজনে, জিনা আর কিশোরকে আটকেছে। আমরা গেলে আমাদেরকেও আটকাবে। তারপর সোনা নিয়ে সরে পড়বে। আমাদের সবাইকে মেরে রেখে গেলেও অবাক হব না।...তো, এখন কি করা?'

পনেরো

হঠাৎ সচল হয়ে উঠল মুসা, রবিনের হাত ধরে তাকে টেনে আনল, এত প্রকাশ্য জায়গায় থাকা ঠিক না এখন। শত্রুরা দেখে ফেলতে পারে। প্রায় ছুটে চলে এল পাথরের ছোট ঘরটায়, যেটায় ঠাঁই নিয়েছে ওরা। এক কোণে বসে হাঁপাতে লাগল।

'যে-ই এসেছে,' ফিসফিস করল রবিন, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে, 'কিশোর আর জিনাকে আটকে ফেলেছে! কি ক ! ঠিক বুঝতে পারছি না! এখন ডানজনে যাওয়া উচিত না, বুঝতে পারছি, কিন্তু ওদেরকে উদ্ধারের কি উপায়?...আরে আরে, রাফিয়ান কোথায়!'

ওরা যখন উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করছিল, তখনই এক সময় ফিরে গেছে রাফিয়ান, খেয়াল করেনি দু'জনে। জিনাকে অন্ধকারে শত্রুর হাতে ফেলে এসেছে, রাফিয়ান এখানে স্বস্তি পায় কি করে? তাই ফিরে গেছে। কুকুরটা চলে যাওয়াতে অস্বস্তি আরও বাড়ল রবিন আর মুসার।

কি করবে বুঝতে পারছে না দুজনে, ভাবছে। রবিন বলল, 'নৌকা নিয়ে চলে যেতে পারি আমরা, সাহায্য নিয়ে আসতে পারি।'

'আমিও ভেবেছি কথাটা,' বিষণ্ণ কণ্ঠ গোয়েন্দা-সহকারীর, 'কিন্তু যাই কি করে? যা পথ, নৌকা বেয়ে নিয়ে যাওয়া আমার কম্ম নয়। পাথরে খোঁচা লাগিয়ে মরব।'

মানুষের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল দু'জনেই। ভাবেইনি, রাফিয়ান চলে গেছে, শত্রুরা দেখবে তার কলারে চিঠিটা নেই, তবুও আসছে না কেন ছেলে দুটো, দেখতে আসবেই। তা-ই এসেছে।

গলা শুনেই রবিনের হাত ধরে এক টানে তুলে টেনে নিয়ে দৌড় দিল মুসা। চত্বরে বেরিয়ে থমকে গেল ক্ষণিকের জন্যে, কোথায় যাবে? পরক্ষণেই দৌড় দিল কুয়ার দিকে। লুকানোর ওটাই একমাত্র জায়গা।

কুয়ার পাড়ে এসে রবিনকে ঠেলে দিল মুসা। 'জলদি করো, মই বেয়ে নেমে যাও! কুইক!'

দ্বিধা করছে রবিন, আবার তাড়া দিল তাকে মুসা।

লোকগুলোর হাতে পড়লেও বাঁচবে কিনা জানা নেই, কুয়ায় নামলে আশা অন্তত আছে। আর দেরি করল না রবিন, মই বেয়ে নেমে গেল। তার পেছনেই নামল মুসা।

'তুমি পাথরটায় বসো,' মুসা বলল, 'তোমার ভার সইতে পারবে, কিন্তু আমাকেসহ পারবে না। আমি মই ধরেই ঝুলে থাকছি।'

ওপরে দু'জন মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রবিন আর মুসার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে, কুয়ার একেবারে কাছেই।

'মুসা, রবিন,' ডাকল একটা ভারি কণ্ঠ, 'কোথায় তোমরা? তোমাদের বন্ধুরা ডাকছে। দারুণ খবর আছে। মুসাআআ! রবিইইন!'

'বাহ্, কি মধুর ডাক!' চাপা গলায় বলল মুসা। 'তা বাবা তোমরা এসেছ কেন? জিনা কিংবা কিশোরই তো আসতে পারত...'

'চুপ! শুনতে পাবে!' সাবধান করল রবিন।

আরও কয়েকবার ডাকল লোক দুটো, রেগে যাচ্ছে, ওদের কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায়। 'গেল কোথায়!...নৌকাটাও তো রয়েছে আগের জায়গায়ই। কোথাও লুকিয়ে পড়েছে!...কিন্তু সারা দিন তো ওদের জন্যে বসে থাকা যায় না।'

'চলো, কিছু খাবার আর পানি দিয়ে আসি ছেলেমেয়ে দুটোকে,' বলল অন্য লোকটা। 'পাথরের ঘরটায় অনেক আছে, বোধহয় ছেলেরাই নিয়ে এসেছে। অর্ধেক দিয়ে আসব, অর্ধেক থাকবে। যে দুটো লুকিয়েছে, ওদের জন্যে। কি বলো?'

'যদি পালায়?'

'নৌকাটা নিয়ে যাব, পালাতে পারবে না।'

'তাহলে ঠিক আছে। চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পারি এসে বারগুলো নিয়ে যাওয়া দরকার। কখন আবার কি বিপত্তি ঘটে যায়, কে জানে!'

'ওটা কি?...কোনটা? ও, ওটা...কুয়া।' ধড়াস করে এক লাফ মারল রবিনের হৃৎপিণ্ড, কিন্তু পরের কথাটায়ই আবার স্বস্তি ফিরল। 'কেন, ওই কুয়ায় লুকিয়ে আছে ভেবেছ নাকি? অসম্ভব! যা গভীর হয় এসব কুয়া...চলো, চলো, যাই।'

চলে গেল লোক দুটো। আরও খানিকক্ষণ ওদের কথাবার্তা শোনা গেল দূর থেকে, বোধহয় খাবার নিচ্ছে, কিশোর আর জিনাকে দিয়ে আসার জন্যে। তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল।

এরপরও অনেকক্ষণ বেরোনোর সাহস পেল না দুই গোয়েন্দা। মই ধরে ঝুলে থাকতে থাকতে হাত ব্যথা হয়ে গেল মুসার, শেষে আর না পেরে বলল, 'এবার বোধহয় গেছে! চলো, উঠি। আমি আর ধরে থাকতে পারছি না!'

'চলো।'

কুয়ার মুখে মাথা বের করে উঁকি দিল মুসা, চারপাশে দেখল। নির্জন। উঠে এল সে। তার পেছনে রবিন। মোটর বোটের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। দুর্গের এক ধারে চলে এল দুজনে, দেখল বোটটা চলে যাচ্ছে। তাতে দুজন লোক। কিন্তু নৌকাটা নিল না কেন ওরা? বলল তো নিয়ে যাবে! আগের জায়গায়ই বাঁধা রয়েছে ফগের নৌকা! নিতে পারল না, নাকি কোন কারণে মত বদলাল ব্যাটারা!

'গেছে!' রবিন বলল। 'এবার?'

'গেছে, কিন্তু আবার আসবে,' কিশোরের অনুকরণে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল মুসা– বোধহয় ধারণা হয়েছে, এভাবে চিমটি কাটলে ব্রেনটা ঠিকমত কাজ

করে। 'নৌকাটা নিয়ে যায়নি যখন, পালাতে পারব আমরা। চলো, জিনা আর কিশোরকে মুক্ত করি।'

ছুটে এল ওরা সিঁড়ি-মুখের কাছে। থমকে দাঁড়াল। পাথর ফেলে মুখ রুদ্ধ করে দিয়ে গেছে ব্যাটারা! প্রথমে মস্ত এক পাথরের চাঁই ফেলেছে, তার ওপর রেখেছে বড় বড় পাথর– নিচ থেকে ঠেলে খুলে যাতে কোনমতেই বেরোতে না পারে কিশোর আর জিনা।

'এগুলো সরানো অসম্ভব!' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল মুসা। 'আমিও পারব না! অন্য কোন পথে ঢুকতে হবে। কিন্তু কোথায় পথ?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুলল রবিন। 'টাওয়ারের কাছে আরেকটা মুখ আছে, নকশায় দেখেছি?' চলো, দেখি খুঁজে বের করা যায় কিনা!'

ডান পাশের টাওয়ারের কাছে চলে এল দু'জনে। টাওয়ার বলতে এখন আর কিছু নেই, খালি পাথর ভাঙা স্তূপ। একটু চেষ্টা করেই অসম্ভব চেষ্টা বাদ দিল ওরা, এর মাঝে সিঁড়িমুখ খুঁজে পাওয়ার কোন আশা নেই, সময়ও নেই হাতে।

'হায় হায়! কি করি এখন!' মাথায় হাত দিল মুসা। 'কি করে বের করি ওদের! রবিন, তোমার মাথায় কিছু আসছে না?'

'কিচ্ছু না?'

একটা পাথরের ওপর ধপ করে বসে গালে হাত রাখল রবিন। ভীষণ উদ্বিগ্ন। লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হলো তার চেহারা। 'মুসা, পেয়েছি!' হাতে তুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'এক কাজ করতে পারি না? কুয়া দিয়ে নেমে যেতে পারি না? কুয়াটা সিঁড়িঘরের কাছাকাছিই আরেকটা ঘরের ভেতর দিয়ে গেছে। ফোকরও রয়েছে কুয়ার দেয়ালে। ওখান দিয়ে ঘরে বেরোতে পারি আমরা! পারি না? শুধু পাথরটাই একটা বাধা, ওটা কোনভাবে পেরিয়ে যেতে পারলেই হলো!'

ভেবে দেখল মুসা। তক্ষুণি কোন মন্তব্য না করে রবিনকে নিয়ে চলে এল কুয়ার পাড়ে। ভেতরে উঁকি দিয়ে ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'ঠিক বলেছ। পাথরের ফাঁক দিয়ে গলে নেমে যেতে পারব চেষ্টা করলে।'

'তাহলে আর দেরি কি? চেষ্টা শুরু করে দিই!'

'এখন মইটা ততদূর পর্যন্ত থাকলে হয়, তার আগেই যদি শেষ হয়ে যায় তো আর হলো না!' রবিনের দিকে তাকাল মুসা। 'আমি চেষ্টা করে দেখি। তুমি থাকো এখানে। দু'জনের ভার অনেক বেশি। মই ছিঁড়ে খসে পড়ে মরার ইচ্ছে নেই।' রবিনকে বাধা দেয়ার সময় না দিয়ে মই ধরে নামতে শুরু করল সে।

'সাবধান, মুসা, খুব সাবধান!' চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করল রবিন ওপর থেকে। 'আরে শোনো, শোনো, দড়ি নিয়ে যাও! কাজে লাগতে পারে।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ!' থেমে গেল মুসা, উঠতে শুরু করল আবার। 'দৌড় দাও। নিয়ে এসো।'

দড়ি নিয়ে এল রবিন।

'আমার জন্যে ভেব না,' হাসল মুসা, 'এসব ঝোলাঝুলি আমার অভ্যেস আছে, খুব ভাল করেই জানো। আর যেভাবেই হোক, হাত পিছলে পড়ে মরব না।

শাদা হয়ে গেছে রবিনের মুখ। উত্তেজনা আর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। দাঁড়াতে পারছে না, শেষে বসেই পড়ল একটা পাথরের ওপর।

'রবিন, শুনতে পাচ্ছ?' কুয়ার ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল মুসার। 'আমি ঠিক আছি।'

'হ্যাঁ, মুসা,' জবাব দিল রবিন। 'সাবধানে থেকো, ভাই, খুব সাবধান! তাড়াহুড়ো কোরো না! মই কি আরও নিচে আছে?'

'তাই তো মনে হয়,' অনেক নিচ থেকে এল মুসার জবাব। 'না না, আর নেই, শেষ! ভেঙে খসে গেছে, না এখানেই শেষ, বোঝা যাচ্ছে না। চিন্তা নেই, আমি দড়ি বাঁধছি।'

নীরবতা, দড়ি বাঁধছে বোধহয় মুসা।

হ্যাঁ, তাই করছে গোয়েন্দাসহকারী। দড়ির এক মাথা শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধল মইয়ের একটা ডাণ্ডার সঙ্গে। তারপর ঝুলে পড়ল দড়ি ধরে। চেঁচিয়ে বলল, 'রবিন, দড়ি বেয়ে নামছি! ঠিকই আছি, ভেব না।'

রবিন কিছু একটা বলল, কিন্তু বোঝা গেল না এত নিচ থেকে। নেমে চলল মুসা। নিয়মিত ব্যায়াম করে সে, কাজেই কাজটা সহজই তার জন্যে। অন্তত এখন পর্যন্ত, পরে কি হবে জানা নেই। যা হয় হোকগে, পরের ভাবনা পরে, আগে ফোকরটা খুঁজে বের করা দরকার।

অন্ধকারে কতক্ষণ নামল মুসা, বলতে পারবে না। একটা সময় মনে হলো, আর নামার দরকার নেই, ফোকরের কাছে পৌঁচেছে। এক হাতে দড়ি ধরে ঝুলে থেকে আরেক হাতে টর্চ নিয়ে জ্বালল। আলো ফেলে দেখল কুয়ার দেয়ালে। তার অনুমান ঠিকই। ঠিক মাথার ওপরে রয়েছে ফোকর, ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। টর্চটা জ্বলন্ত অবস্থায়ই দাঁতে কামড়ে ধরে আবার উঠতে শুরু করল সে। ফোকরের কাছে পৌঁছে ধারে পা বাধিয়ে দিল। দোল দিয়ে শরীরটাকে নিয়ে এল কুয়ার দেয়ালের কাছে। দক্ষ দড়াবাজিকরের মত শরীর বাঁকিয়ে-চুকিয়ে ঢুকিয়ে ফেলল ফোকরের ভেতরে। আর বেশি কষ্ট করতে হলো না, নেমে পড়ল ঘরের মেঝেতে। দড়ির মাথাটা মেঝেতে ফেলে তার ওপর একটা পাথর চাপা দিয়ে দিল, যাতে দড়িটা কোনভাবে ফোকর গলে বেরিয়ে ঝুলে না পড়ে কুয়ার ভেতরে।

একটা সুড়ঙ্গ-মুখের পাশের দেয়ালে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে এসে ভেতরে আলো ফেলল মুসা। হ্যাঁ, আছে, সুড়ঙ্গের দেয়ালেও রয়েছে চিহ্ন। ঢুকে পড়ল সে। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরেকটা ঘরে এসে ঢুকল। চেঁচিয়ে ডাকল জিনা আর কিশোরের নাম ধরে।

জবাব নেই।

খুঁজতে খুঁজতে আরেকটা সুড়ঙ্গ-মুখের পাশের দেয়ালে চক দিয়ে আঁকা চিহ্ন চোখে পড়ল। ঢুকে পড়ল মুসা, পেরিয়ে এল এই সুড়ঙ্গটাও। আরেকটা ঘরে ঢুকল। ওপাশের দেয়ালে বিশাল এক দরজা, দেখামাত্র চিনল সে। এটাই কুপিয়েছিল কিশোর, এই দরজার কাঠের চিলতে লেগেই গাল কেটেছে মুসার। দরজা বন্ধ, নিচে আর ওপরে বড় বড় ছিটকিনি, তুলে দেয়া হয়েছে।

দরজার কাছে এসে কিশোরের নাম ধরে ডাকল মুসা।

পরক্ষণেই শোনা গেল জবাব, রাফিয়ানের চাপা উত্তেজিত চিৎকার। তার পর-পরই কিশোরের কথা শোনা গেল। দরজার ওপাশেই রয়েছে ওরা।

ষোলো

ছিটকিনি খুলে দিল মুসা। পাল্লা খুলতেই এক লাফে বেরিয়ে এল রাফিয়ান, তার কাঁধে দু'পা তুলে দিয়ে গাল চেটে দিল।

'উহ্! আরিহ্! আরে, ব্যথা পাচ্ছি!...আমার গাল কাটা!' আর্তনাদ করে উঠল মুসা।

বেরিয়ে এল কিশোর আর জিনা।

হাসল মুসা, টর্চের আলোয় ঝিক করে উঠল তার ঝকঝকে শাদা দাঁত। 'তারপর, জিনা বেগম, মুক্তি পেয়ে কেমন লাগছে?'

'দারুণ!' জবাবটা দিল কিশোর।

পাগল হয়ে উঠেছে রাফিয়ান, মুসাকে ঘিরে নাচছে, আর ঘেউ ঘেউ করছে! প্রতিধ্বনি কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে।

'আরে এই রাফি, থামতো বাপু!' ধমক দিল জিনা। 'তুই একাই বেরিয়েছিস, নাকি আমরাও? থাম, থাম!'

'ঢুকলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

অল্পকথায় সব বলল মুসা।

'কুয়ার ভেতর দিয়ে...দড়ি বেয়ে...নেমেছ!' বিশ্বাস করতে পারছে না জিনা। 'তুমি মুসা আমান...ঘোড়াকে ভয় পাও...অথচ...'

'বিপদে পড়লে ভয়ডর ওর কোথায় চলে যায়!' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'তখন ওর মত দুঃসাহসী হয়ে উঠতে খুব কম লোককেই দেখেছি!' মুসার দিকে ফিরল। 'আসল কথা বলো। ব্যাটারা কোথায়?'

জানাল মুসা।

'পালানো দরকার!' ব্যস্ত হয়ে উঠল কিশোর। 'রিভলভার আছে ব্যাটাদের কাছে। আবার এসে পড়ার আগেই ভাগব। কোন পথে বেরোব?'

'এসো,' ডাকল মুসা। আগে আগে রওনা হলো।

কুয়া-ঘরে চলে এল ওরা। দড়ি দেখিয়ে বলল মুসা, 'ওটা ধরেই বোরোতে হবে আবার।'

'আমি পারব না বাবা!' দুহাত তুলল জিনা। 'তাছাড়া রাফিয়ান...'

'পারতেই হবে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এছাড়া আর কোন পথ নেই যাও, দেরি কোরো না। রাফিয়ান আপাতত এখানেই থাক, পরে সুযোগ করে এসে নিয়ে যাব।'

আরেকবার দ্বিধা করল জিনা, তারপর এগিয়ে গিয়ে দড়ি ধরে মাথা ঢুকিয়ে দিল ফোকরে। তাকে বেরোতে সাহায্য করল কিশোর আর মুসা।

এক সঙ্গে তিনজনে দড়ি ধরে ঝুললে ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় আছে, তাই একজন একজন করেই চলল। জিনা মই ধরে সেকথা চেঁচিয়ে জানাতেই মুসাকে ঠেলে দিল

কিশোর।

রাফিয়ানকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখে সব শেষে বেরোল সে। নিরাপদেই বেরিয়ে এল বাইরে, খোলা আকাশের নিচে।

আনন্দে ধেই ধেই করে নাচছে রবিন, চোখে পানি। মুসা আর কিশোরকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে ফেলল। কোন কিছু না ভেবেই এগিয়ে গেল জিনার দিকে, লাফ দিয়ে সরে গেল জিনা। হা হা করে হেসে উঠল মুসা। 'থামলে কেন, রবিন?'

লাল হয়ে গেল রবিনের গাল, জিনাও লাল, দুজনেই লজ্জা পেয়েছে।

'চলো, জলদি যাই,' হাসিমুখে তাড়া দিল কিশোর। 'ব্যাটারা এসে পড়তে পারে, যে কোনো সময়ে!'

প্রায় ছুটে পাহাড় ডিঙাল ওরা, ছোট্ট বন্দরে নামল। নৌকার কাছে এসেই থমকে গেল, বুঝল, কেন নৌকা ফেলে গেছে শত্রুরা। দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা পোহায়নি, তার চেয়ে আরও অনেক সহজ কাজটা করেছে, দাঁড় দুটো নিয়ে গেছে।

'এবারে কি করি!' চিন্তিত হয়ে পড়ল কিশোর।

মুক্তির আনন্দে উবে গেল, মুখ কালো হয়ে গেল সবারই।

'জাহাজ আনতে গেছে,' জিনা বলল। 'খুব তাড়াতাড়ি করবে ওরা। দাঁড় ছাড়া প্রণালী থেকেই বেরোতে পারব না, জেলেদের যে ডাকব সে উপায়ও নেই। এখান থেকে হাজার চেঁচামেচি করলেও ওদের কানে যাবে না, অনেক দূরে রয়েছে। তারমানে, লোকগুলোকে ঠেকাতে পারছি না আমরা!'

'চুপ!' হাত তুলল কিশোর। ধীরে ধীরে বসে পড়ল একটা পাথরে, 'একটা আইডিয়া আসছে আমার মাথায়, চুপচাপ ভাবতে দাও!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেল তার।

নীরব হয়ে গেল সবাই। উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে, 'কি আইডিয়া আসছে তার মাথায়?'

'মনে হয় কাজ হবে,' হঠাৎ ঘোর ভাঙল যেন কিশোরের। 'শোনো, ওদের ফেরার অপেক্ষায় থাকব আমরা। এসে কি করবে ওরা? সিঁড়িমুখের পাথর সরিয়ে নিচে নামবে। দরজাওয়ালা ঘরটায় যাবে, ভাববে, আমরা ওখানেই রয়েছি, সেজন্যেই যাবে। এখন কথা হলো, তার আগেই যদি কেউ একজন লুকিয়ে থাকি আশেপাশে, যেই ঢুকল ব্যাটারা অমনি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিই? তারপর ওদের মোটরবোট নিয়ে চলে যেতে পারব খুব সহজে। কি মনে হয়?'

আইডিয়াটা চমৎকার মনে হলো মুসার কাছে, কিন্তু জিনা আর রবিনের দ্বিধা রয়েছে।

'আমাদের কাউকে আবার নিচে নামতে হবে,' জিনা বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে তার কাছেপিঠে লুকিয়ে থাকা গেলেই না হয়। কিন্তু দু'জন লোক যে একই সঙ্গে ভেতরে ঢুকবে, তার নিশ্চয়তা কি? আর যদি ঢোকেও, আমাদেরকে না দেখলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে ওরা। তখন ওদেরকে ভেতরে রেখে দরজা আটকানো

খুব কঠিন হবে, চিতার ক্ষিপ্রতা দরকার। পারা যাবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে! যদি না পারল, তখন কি ঘটবে? আরও বিপদে পড়ব না? ওরা তখন উঠে এসে সব্বাইকে খুঁজে বের করবে।'

'তা ঠিক,' চিবুক চুলকাল কিশোর! 'ধরা যাক, মুসা নিচে গেল. দরজা সময়মত আটকাতে পারল না, লোকগুলো উঠে এল আমাদেরকে খুঁজতে···আরেক কাজ করলেই তো পারি। লোকগুলো পাথর সরিয়ে নেমে গেলেই ওপর থেকে সিঁড়িমুখ আটকে দেব আমরা পাথর দিয়ে। মুসা তাদের আটকাতে না পারলেও আমরা পারব।'

'তাহলে মুসারই বা যাওয়ার দরকার কি?' রবিন প্রশ্ন করল।

'তাহলে দরজাটা আবার আটকে আসবে কে? দরজা খোলা দেখলেই ছুটে ওপরে চলে আসবে ওরা. আমরা পাথর রাখারও সময় পাব না। তাছাড়া, এখনুই শিওর হয়ে যাচ্ছি কেন, মুসা ওদেরকে ঘরে বন্দি করতে পারবে না? আর সিঁড়িমুখ আটকানোর কথা বললাম, সেটা তত নিরাপদ নয়। নিচ থেকে ঠেলে দু'জন শক্তিশালী লোক পাথর সরিয়ে ফেলতেও পারে। তারচেয়ে ঝুঁকিটা নেয়াই ভাল নয়?'

'হয়তো!' জিনা বলল। 'কিন্তু মুসা বেরোবে কি করে?'

হাসল কিশোর। 'যে পথে ঢুকে বের করে এনেছে আমাদের। আমিই যেতাম, কিন্তু কাজটা আমার চেয়ে মুসা অনেক ভাল পারবে। যার কাজ তাকেই সাজে, সে-ই যাক। কি মুসা, আপত্তি আছে?'

'আপত্তি?' হাসল মুসা। 'কুয়াটা এখন ডালভাত হয়ে গেছে আমার কাছে। তিনবার নেমেছি আর উঠেছি। আরেকবারে কিছু হবে বলে মনে হয় না।' একটু থেমে বলল, 'আমিই নামব। তুমি ওপরে থাকো। আমি আটকা পড়লে অন্যদেরকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তোমাকে দরকার। তাছাড়া ওপরে আরও অনেক কিছু ঘটতে পারে, সেসব তুমিই সামাল দিতে পারবে, আমি পারব না। বেকায়দায় পড়লে ভেউ ভেউ করে কান্না ছাড়া আর কিছু করতে পারব না আমি···'

'বাহ্, বাহ্, আমাদের মুসা আমান আজকাল বিনয়ের অবতার হয়ে গেছেন!' হেসে টিপ্পনী কাটল রবিন।

সবাই হাসল।

আর খানিক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, মুসাই নামবে।

ঘর থেকে খাবার এনে পাহাড়ের মাথায় বসে খেল ওরা। চোখ সাগরের দিকে।

ঘণ্টা দু'য়েক পর একটা বড় মাছধরা জাহাজ দেখা গেল, দ্বীপের দিকেই আসছে। প্রণালীর মুখের কাছ থেকে দূরে থেমে গেল।

'আসছে!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'মুসা, জলদি, গিয়ে ঢোকো!'

ছুটে চলে গেল মুসা।

অন্যদের দিকে ফিরল কিশোর। 'জোয়ার আসতে দেরি আছে। নিচে, ওই যে ওই পাথরগুলোর আড়ালে লুকানো যাবে এখন।'

লুকিয়ে পড়ল সবাই। কানে আসছে বোটের ইঞ্জিনের ভারি ঝকঝক ঝকঝক! বন্দরে নোঙর করল বোট, লোকের কথা শোনা গেল, দুজন নয়, বেশি। পাহাড় বেয়ে ওদের উঠে যাওয়ার শব্দও কানে এল।

আস্তে করে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল কিশোর। লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় চত্বরে উঠে গেছে। চাপা গলায় সঙ্গীদেরকে ডাকল, 'এই বেরিয়ে এসো!'

পাহাড়ের ওপরে কতগুলো পাথরের স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। এখান থেকে চত্বরের অনেকখানি চোখে পড়ে, সিঁড়িমুখটাও।

কাউকে দেখা গেল না। সিঁড়িমুখের পাথর ইতস্তত ছড়ানো।

'ঢুকে পড়েছে! এসো!' পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে অন্যেরা।

প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়িমুখের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। মস্ত একটা চ্যাপ্টা পাথর পড়ে আছে, ওটা দিয়েই মুখ ঢাকা হয়েছিল। সরানো হয়েছে। ওটাকে আবার সিঁড়িমুখে ফেলতে হবে।

ঠেলতে শুরু করল ওরা। বেজায় ভারি পাথর। তিনটে ছেলেমেয়ের জন্যে বেশিই। গলদঘর্ম হয়ে উঠল, জিভ বেরিয়ে পড়ল, হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে পাথর সরাতে গিয়ে। কিন্তু নড়তে চাইছে না জগদ্দল পাথর, গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

বোঝা গেল, ওটা সরানোর সাধ্য ওদের নেই। শেষে আরেকটু ছোট তিনটে পাথর দিয়ে কোনমতে মুখটা বন্ধ করে এসে কুয়ার পারে বসে হাঁপাতে লাগল।

'কি জানি করছে মুসা নিচে, আল্লাহ মালুম!' কিশোর বিড়বিড় করল।

অনেক কিছুই করেছে মুসা, এখন লুকিয়ে বসে আছে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে। আরেকটা সুড়ঙ্গে কথা বলার আওয়াজ শুনল সে, কান পেতে রইল। একটু পরেই সুড়ঙ্গের মুখে আলো দেখা গেল। কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল তিনজন লোক।

তিনজন! সর্বনাশ হয়েছে! পরিকল্পনা আর কাজে লাগানো যাচ্ছে না!– শঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা।

'ওই যে, ওই দরজাটাই,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল ভারি কণ্ঠ, ওতেই রয়েছে সোনার বারগুলো। ছেলেমেয়ে দুটো, আর কুত্তাটাও।'

'হ্যাঁ, তাই ভাবতে থাকো, ইবলিসের বাচ্চারা!' মনে মনে হাসল মুসা। 'আছে তোমাদের জন্যে বসে, বসে বসে আঙুল চুষছে, দেখো ঢুকে।'

ছিটকিনি খুলল লোকটা। পাল্লা ঠেলে খুলে ঢুকে পড়ল। তার পেছনে ঢুকল আরেকজন। তৃতীয় লোকটা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল ভেতর থেকে, 'জেরি, ওরা নেই!'

লাফ দিয়ে উঠল বাইরে দাঁড়ানো লোকটা, ছুটে ঢুকে পড়ল।

বিদ্যুৎ খেলল মুসার শরীরে, চোখের পলকে ছুটে এসে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। ঠেলেঠুলে লাগিয়ে দিল নিচের ছিটকিনি।

কিন্তু দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচল হয়ে উঠল ভেতরের লোকগুলোও। সব শেষে ঢুকেছে যে লোকটা, জেরি, কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা মারল দরজায়।

মুসা সবে তখন নিচের ছিটকিনিটা লাগিয়েছে। থরথর করে কেঁপে উঠল দরজা। সে ওপরের ছিটকিনিটা লাগানোর আর সময় পেল না, তার আগেই এক যোগে এসে তিনজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল পাল্লায়, সইতে পারল না পুরানো ছিটকিনি, আংটা ছিঁড়ে, ছুটে খুলে গেল ওটা। খুলে গেল দরজা।

ছুট দিল মুসা। ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। পেছনে তাড়া করে এল লোকগুলো।

কুয়াঘরে চলে এল মুসা। সুড়ঙ্গের ভেতরে লোকগুলোর হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে। মুহূর্ত দ্বিধা না করে ফোকরে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে। দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল কুয়ায়। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে, ওই অবস্থায়ই দড়ি বেয়ে উঠে চলল। আশা করছে, ফোকরটা লোকগুলোর চোখে পড়লেও কিছু বুঝতে পারবে না। কারণ ওরা জানে না কুয়াটার অস্তিত্ব।

আটকে থাকা পাথরটার কাছে এসে হাত থেকে মই প্রায় ছুটেই যাচ্ছিল মুসার। ধড়াস করে বোয়াল মাছের মত এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। ঘামে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে হাত। অবশ হয়ে আসছে শরীর, পরিশ্রমে, উত্তেজনায়।

অবশেষে নিরাপদেই বেরিয়ে এল মুসা। উদ্বিগ্ন বন্ধুদেরকে দেখে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'হয়নি! পারলাম না!'

যা বোঝার বুঝে নিল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি, দৌড় দাও নৌকার দিকে! আর কোন উপায় নেই!'

'রাফিয়ান!' জিনার গলা কাঁপছে। 'ও-তো নিচে রয়ে গেছে!'

'ওর জন্যে ভাবনা নেই,' মুসা অভয় দিল। 'ও নিরাপদেই থাকবে। লুকিয়ে রেখে এসেছি। এসো, যাই!'

'তোমরা যাও, আমি আসছি,' বলেই পাথরের ঘরটা, যেটাতে মালপত্র রাখা আছে, সেদিকে দৌড় দিল কিশোর।

'কোথায় গেল!' জিনা অবাক।

'নিশ্চয় কোন কাজ আছে! চলো, চলো!' তাড়া দিল রবিন, দৌড় দিল নৌকার দিকে।

লাফিয়ে নৌকায় উঠল জিনা আর রবিন। মোটরবোটের পাটাতনে দাঁড় দুটো আবিষ্কার করল মুসা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি! দাঁড় পেয়েছি!'

কিশোর এসে পড়েছে, হাতে কুড়াল।

'ওটা দিয়ে কি হবে?' জানতে চাইল জিনা।

জবাব দিল না কিশোর। লাফিয়ে উঠে পড়ল মোটরবোটে। ধাঁই করে কুড়াল বসিয়ে দিল তেলের ট্যাংকে। একের পর এক কোপ মেরে চলল সে, যেন পাগল হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে একেবারে অকেজো করে দিল এঞ্জিন, আর কয়েক কোপে বোটের তলা খসিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল তীরে। ছুটে এসে লাফিয়ে উঠল নৌকায়। 'জলদি নৌকা ছাড়ো, জিনা!'

প্রণালীর মাঝামাঝি চলে এসেছে নৌকা, এই সময় পাহাড়ের মাথায় লোক তিনজনকে দেখা গেল। ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে নিচে নামল ওরা, বোটের কাছে এসে থমকে গেল। মুঠো পাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল জেরি, 'বিচ্ছুর গোষ্ঠী। দাঁড়াও, আগে ধরে নিই, তারপর দেখাব মজা!'

জিনার তামাটে চোখে আলোর ঝিলিক। 'কি করে দেখাবে? আগে আমাদের কাছে আসতে হবে তো?'

তীরে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকল লোকগুলো, মুঠো পাকিয়ে দেখাচ্ছে আর গাল দিচ্ছে। কিন্তু তাতে কি-ই এসে যায় গোয়েন্দাদের!

জিনা অবশ্য আনন্দে পুরোপুরি সামিল হতে পারছে না। রাফিয়ানের জন্যে ভাবছে।

মুসা বলল, 'আরে বাবা, এত ভাবছ কেন?' নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলল, 'এই মুসা আমানের ওপর আরেকটু ভরসা রাখো না। আমি বলছি, আমাদের রাফিয়ান নিরাপদেই আছে। ভরপেট খেয়ে নিশ্চয় এখন সে সুখস্বপ্ন দেখছে!'

সতেরো

খোলা সাগরে বেরিয়ে এল নৌকা। এখান থেকে ছোট বন্দরটা দেখা যায় না, লোক তিনজনকেও চোখে পড়ছে না। মাছধরা জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এক খালাসী। ছেলেদেরকে দেখে ডাকল, 'এইই, তোমরা দ্বীপ থেকে এসেছ?'

'জবাব দিও না,' নিচু গলায় বলল কিশোর।

সবাই চুপ করে রইল।

'এই ছেলেরা,' আবার ডাকল লোকটা, 'তোমরা দ্বীপ থেকে এসেছ? গোবেল দ্বীপ?'

এবারেও সবাই চুপ। তাকালও না মুখ তুলে।

'এই, জবাব দিচ্ছ না কেন?' ধমকে উঠল লোকটা।

তবুও কথা বলল না ছেলেরা, যেন কানেই যাচ্ছে না লোকটার কথা।

লোকটা শিওর হয়ে গেল, ছেলেগুলো দ্বীপ থেকেই এসেছে। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, নিশ্চয় সন্দেহ করেছে, সব কিছু ঠিকঠাক মত ঘটেনি দ্বীপে, কোন গণ্ডগোল হয়েছে। তাড়াতাড়ি ডেক থেকে নিচে নেমে গেল সে।

'যদি আমাদেরকে ধরতে আসে?' মুসার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ।

'আসবে না,' কিশোর বলল। 'নৌকা নামিয়ে প্রথমে দ্বীপে দেখতে যাবে কি হয়েছে। আমি হলে তাই করতাম। তারপর হয়তো আমাদের ধরার চেষ্টা করবে।'

'করলেও আর পেরেছে!' মুখ বাঁকাল জিনা। 'ততক্ষণে আমরা পগার পার।'

'কিন্তু সোনাগুলো তো নিয়ে যেতে পারবে,' রবিন বলল।

'তা-ও পারবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'নৌকা নিয়ে লোকটা দ্বীপে যাবে, বন্দরটা খুঁজে বের করবে, সঙ্গীদের কথা শুনবে, সোনাগুলো বের করে এনে নৌকায় তুলবে, অনেক সময়ের ব্যাপার। এত সময় নেই ওদের হাতে। জানে, যে কোন মুহূর্তে পুলিশের বোট নিয়ে হাজির হয়ে যেতে পারি আমরা।'

জিনার মা-বাবাকে পরিস্থিতি বোঝাতে বিশেষ সময় লাগল না। থানায় ফোন করলেন মিস্টার পারকার। পুলিশের পেট্রল বোটে করে ছেলেদের সঙ্গে তিনিও

চললেন দ্বীপে।

প্রণালীর কাছে মাছধরা জাহাজটা নেই, দিগন্তের কোথাও দেখা গেল না ওটা। লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।

বোট থেকে ডিঙি নামিয়ে প্রণালী দিয়ে ছোট বন্দরে চলে এল ওরা। তেমনিভাবে পড়ে রয়েছে মোটরবোটটা, অর্ধেকের বেশি পানির তলায়।

তবে, সোনার বার সব নেই, বেশ কিছু গায়েব। একেবারে খালি হাতে যায়নি ডাকাতেরা। যা পেরেছে নিয়ে গেছে। এখনও যা রয়েছে, অনেক, কয়েক কোটি টাকার তো হবেই।

কিন্তু ওসবের প্রতি নজর নেই জিনার, মুসাকে নিয়ে আগে রাফিয়ানকে উদ্ধার করতে চলল সে।

একটা ছোট ঘরে এসে ঢুকল মুসা। এক ধারে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে বড় একটা পাথর, সেটাকে ঠেকা দিয়ে জায়গামত রাখার জন্যে আরও পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। পাথরগুলোর ওপর দেয়ালে চক দিয়ে একটা কুকুরের মুখ আঁকা। সেদিকে দেখিয়ে হাসল মুসা। 'চিহ্ন দিয়ে রেখেছি।'

প্রথমে কিছু বুঝল না জিনা, তারপর হেসে ফেলল। 'নাহ্, যতটা ভেবেছিলাম, তত বোকা তুমি নও, মুসা।'

দু'জনে মিলে পাথর সরিয়ে দেয়ালের খোঁড়ল থেকে রাফিয়ানকে বের করল। নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় বিরক্তই হলো রাফিয়ান। কিশোর আর জিনাকে যে খাবারগুলো দিয়ে গিয়েছিল লোকদুটো, ওগুলো সব খেয়ে পেট ভারি হয়ে গেছে তার, আরাম করে শুয়ে খুব একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছে। চুপচাপ থাকতে অনুরোধ করেছিল তাকে মুসা, বোধহয় অনুরোধ রেখেছে, টুঁ শব্দটি করেনি রাফিয়ান, নইলে ডাকাতদের হাতে পড়ত, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হয়তো মেরেই রেখে যেত ওরা।

সিঁড়িমুখের কাছে অপেক্ষা করছেন মিস্টার পারকার। নিচে ডাকাতদেরকে খোঁজাখুঁজি করছে পুলিশ, জানে, পাবে না, তবুও করছে, রুটিন চেক।

'বাবা,' জিনা বলল, 'কিশোরকে কথা দিয়েছিলে তুমি, আমি যা চাই দেবে। দাওনি?'

কাছেই দাঁড়ানো কিশোরের দিকে চট করে তাকিয়ে নিলেন একবার মিস্টার পারকার, রবিনের মুখের দিকেও তাকালেন, দ্বিধা করলেন, অবশেষে মুখ খুললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। কি চাই, দ্বীপটা তো?'

'না,' মাথা নাড়ল জিনা।

'সোনার বারগুলো?'

'তা-ও না।'

'তা-ও না! তাহলে?' ভুরু কুঁচকে গেছে ভদ্রলোকের।

'আগে বলো, দেবে কিনা?' আঙুল নাড়ল জিনা।

'বলে যখন ফেলেছি, দেব। কি আর করা?' অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

সিঁড়ি-মুখে ঝুঁকে বসে ডাকল জিনা, 'রাফি, এই রাফি! উঠে আয়।'

রাফিয়ানের ভোঁতা মুখটা দেখে চমকে উঠলেন মিস্টার পারকার। কোন মতে

হাসি চাপল তিন গোয়েন্দা।

'যা, বাবাকে সালাম কর,' রাফিয়ানকে আদেশ দিল জিনা।

'আরে না, না, দরকার নেই, লাগবে না!' লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ালেন মিস্টার পারকার।

কিন্তু রাফিয়ান কি আর সুযোগ ছাড়ে? তাঁর একেবারে পায়ের কাছে এসে পড়ল, দুই পা তুলে দিল হাঁটুতে, জড়িয়ে তো আর ধরতে পারে না, হাত নেই যে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বোকা হয়ে গেছেন মিস্টার পারকার, ঝুঁকে কুকুরটার মাথায় হাত রেখে কোনমতে বললেন, 'বেঁচে থাকো, বাবা!' গর্জে উঠলেন পরক্ষণেই, 'কিন্তু খবরদার! আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নষ্ট করলে চাবকে পাছার চামড়া তুলে ফেলব!'

আর সামলাতে পারল না মুসা, হো হো করে হেসে উঠল। তাতে যোগ দিল কিশোর আর রবিন। জিনার মুখে হাসি, চোখে পানি।

হাসিটা সংক্রামিত হলো মিস্টার পারকারের মুখেও।

'আরে, এ-কি কাণ্ড!' পেছন থেকে শোনা গেল ভরাট কণ্ঠ, বেরিয়ে এসেছেন শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান, আধা রেডইনডিয়ান আধা স্প্যানিশ রক্ত শরীরে। 'আমাদের জনাথন পারকার ছেলেমেয়েদের সামনে হাসছে! স্বপ্ন দেখছি না তো! আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছে তোমাকে তোমার মেয়ে...'

চোখ কটমট করে বন্ধুর দিকে তাকালেন মিস্টার পারকার। মুখ থমথমে, কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে যেন মিষ্টি রোদ, 'কই, হাসলাম আবার কখন?'

-ঃ শেষ ঃ-